NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

EPS

PAPER II
MODULES 5-8

ELECTIVE POLITICAL SCIENCE
HONOURS

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠ্যক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোন বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে— যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন যখনই কোন শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশকিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

১৬তম পুনর্মুদ্রণ : মে, 2018

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau
of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : ঐচ্ছিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান

সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম ঃ পর্যায়

EPS : 02 : 5

	রচনা	সম্পাদনা
একক 17-18	অধ্যাপক অমিতাভ রায়	ড. রাধারমণ চক্রবর্তী
একক 19	অধ্যাপিকা রেখা সাহা	ঐ
একক 20	অধ্যাপক শান্তনু ঘোষ	ঐ

EPS : 02 : 6

একক 21-24	অধ্যাপিকা দীপিকা মজুমদার	ঐ

EPS : 02 : 7

একক 25-28	অধ্যাপক দীপঙ্কর সিন্‌হা	ঐ

EPS : 02 : 8

একক 29-32	অধ্যাপক প্রাবৃট দাশ মহাপাত্র	ঐ

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনওভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EPS —02

(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায়
5

একক	17	❑	রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব : অর্থ, বিবর্তন ও পরিধি	7-15
একক	18	❑	রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব : ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব	16-25
একক	19	❑	আমলাতন্ত্র : ম্যাক্স হেব্বারের ধারণা	26-41
একক	20	❑	শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সংক্রান্ত তত্ত্ব	42-54

পর্যায়
6

একক	21	❑	রাজনৈতিক সংস্কৃতি	55-69
একক	22	❑	রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ	70-80
একক	23	❑	শিক্ষা ও রাজনীতি	81-89
একক	24	❑	ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি	90-100

পর্যায়
7

একক 25 ❑ রাজনৈতিক যোগাযোগ 101-115
একক 26 ❑ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ 116-130
একক 27 ❑ রাজনৈতিক দল 131-141
একক 28 ❑ রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী গোষ্ঠী 142-147

পর্যায়
8

একক 29 ❑ রাজনৈতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ 148-157
একক 30 ❑ রাজনীতিক পরিবর্তন ও বিপ্লব 158-167
একক 31 ❑ মতাদর্শ ও রাজনীতি 168-175
একক 32 ❑ রাজনীতি ও সামরিক বাহিনী 176-185

একক ১৭ □ রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব : অর্থ, বিবর্তন ও পরিধি

গঠন

১৭.০ উদ্দেশ্য

১৭.১ প্রস্তাবনা

১৭.২ রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের ধারণা

১৭.৩ রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ

১৭.৪ রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের পরিধি

১৭.৫ অনুশীলনী

১৭.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে জানা যাবে—

- রাষ্ট্রচর্চায় সমাজের ভূমিকা কেন আলোচ্য
- রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব বিষয়টির কীভাবে উদ্ভব হল ও তার পরিধির মধ্যে কী কী পড়ে
- এই সমাজতত্ত্ব আলোচনায় বিভিন্ন চিন্তাবিদের অবস্থান ও অবদান
- সেই সঙ্গে রাজনীতিতে সক্রিয় কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানগুলি যেখানে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর যোগাযোগ, রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভিত্তি এবং রাজনৈতিক উন্নয়নেরও দিকে মনোযোগ দেওয়া যাবে।

১৭.১ প্রস্তাবনা

যে কোনও দেশে, যে কোনও সময়ে সমাজবদ্ধ মানুষই রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি। দেশকাল ভেদে রাজনীতিতে সক্রিয় মানুষের আনুপাতিক সংখ্যার তারতম্য ঘটলেও, এই কথা অনস্বীকার্য যে মানুষ সামাজিক জীব হিসাবেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে—অর্থাৎ, মানুষ তার বিশেষ সামাজিক অস্তিত্বকে বহন করে নিয়ে গেছে রাজনীতির অঙ্গনে। অন্যদিকে, রাজনীতির লক্ষ্যবস্তু চিরকালই সমাজ—তা সমাজকে কমবেশি নিয়ন্ত্রণ করা, রক্ষা করা বা পরিবর্তন করা যাই হোক না কেন। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগতভাবে মানুষের সামাজিক অবস্থান, স্বার্থ ও রাজনৈতিক ভূমিকার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বাস্তবে থাকলেও তা আমাদের চেতনায় ও জ্ঞানে স্বীকৃতি পেয়েছে অপেক্ষাকৃতভাবে সাম্প্রতিককালে। মানুষকে কেন্দ্র করে সমাজ ও রাজনীতির এই আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে চর্চা করার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের।

১৭.২ রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের ধারণা

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইতালীয় সমাজবিজ্ঞানী জিওভান্নি সারতোরি (Giovanni Sartori) মন্তব্য করেছেন যে, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে অন্যতম সেতু স্থাপন করেছে। তাঁর মতে, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব নানা বিষয়ের মিশ্রণে উদ্ভূত একটি সঙ্কর যার লক্ষ্য সমাজতাত্ত্বিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য ও তত্ত্বের উপকরণগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। কিন্তু কী উদ্দেশ্যে এই সংযোগস্থাপনের প্রচেষ্টা?

এই প্রচেষ্টার পিছনে অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে দু'টি পরস্পর-বিরোধী ধারণা—এক, সমাজ ও রাজনীতি আমাদের জীবনে পৃথক এলাকা দখল করে আছে, এবং দুই, সমাজ ও রাজনীতির কক্ষপথগুলি প্রায়শই একে অপরকে ছেদ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, জাত-ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজের একটি প্রতিষ্ঠান, ও সেই দিক দিয়ে চরিত্রগতভাবে সামাজিক। অন্যদিকে, সংবিধান ও সংবিধানকে অনুসরণ করে সৃষ্টি হওয়া আইন রাজনীতির এলাকাভুক্ত ও চরিত্রগতভাবে রাজনৈতিক। সুতরাং, চরিত্রগতভাবে জাত-ব্যবস্থা ও সংবিধান, আইন ইত্যাদি আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কহীন। কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্র যখন সাংবিধানিক আদর্শকে মান্য করে নিম্নবর্গের মানুষদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে আইনের মাধ্যমে, তখন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও একটি রাজনৈতিক পদ্ধতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়। সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন করার সময়ে রাষ্ট্রের প্রতিভূ হিসাবে সরকার যেমন বিভিন্ন জাতগোষ্ঠীর চাপ বা প্রভাবের সম্মুখীন হয়েছে, তেমনই আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জাত-ব্যবস্থার কিছু ঐতিহ্যগত অন্যায় দূর করারও চেষ্টা করেছে। এই ধরনের উদাহরণ দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতা থেকে আরও দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সকল অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করবে যে, সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী অনেক ক্ষেত্রেই একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব রাজনীতি ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে সংযোগস্থাপন করে সমাজ ও রাজীনীতির ব্যাখ্যাকে পূর্ণতর ও উন্নততর করার পথের সন্ধান দিয়েছে।

সাধারণভাবে সমাজ ও রাজনীতির আন্তঃসম্পর্কের কথা স্বীকার করে নিয়ে সমাজতাত্ত্বিক টম বটোমোর (Tom Bottomore) মনে করেছেন যে, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের প্রধান আলোচ্যবস্তু হল সমাজের প্রেক্ষাপটে ক্ষমতার সম্বন্ধে আলোচনা ("Political Sociology is concerned with power in its social context")। ক্ষমতা, তাঁর মতে, এক ধরনের সামর্থ্য যার দ্বারা কোনও ব্যক্তি বা সামাজিক গোষ্ঠী অপর ব্যক্তি বা সামাজিক গোষ্ঠীর স্বার্থ ও বাধার বিরুদ্ধে স্বনির্ধারিত পথ গ্রহণ করতে পারে। ক্ষমতার উপস্থিতি বুঝতে পারা যায় ক্ষমতার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যা একমাত্র সম্ভব সমাজের পটভূমিকায়। বটোমোরের মতে, সব বা প্রায় সব সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেই ক্ষমতা একটি উপকরণ, তা পরিবার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক সংগঠন বা ধর্মীয় সম্প্রদায় যাই হোক না কেন। অপরদিকে, রাজনীতি ক্ষমতাকেন্দ্রিক ক্রিয়াকলাপ হওয়ার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান অনুসন্ধানের বিষয়; সামাজিক প্রেক্ষাপটে ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। ক্ষমতার প্রশ্নেই সমাজ ও রাজনীতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয় এবং রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব এই আন্তঃসম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ক্ষমতার উৎস, তার ব্যবস্থার ও ব্যবহারের ফলাফলকে আলোচনা করে।

শুধুমাত্র 'ক্ষমতা'র দিকে দৃষ্টিপাত না করে সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক পরিবর্তন বা বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের ধারণা খানিকটা স্পষ্ট হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পরবর্তী কাল থেকে ইউরোপে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) সময়ে ও অব্যবহিত পরে অ-ইউরোপীয় দুনিয়ায় দ্রুত রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কোথাও গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হয়েছে, কোথাও বা স্বৈরতন্ত্র গণতন্ত্রে; পরাধীন জাতি স্বাধীনতা অর্জন করে নতুন রাষ্ট্র গঠন করেছে; সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন হয়েছে ও অনেকক্ষেত্রে পতনও হয়েছে, ইত্যাদি। এই সব পরিবর্তন রাজনীতির এলাকায় হলেও, সমান্তরালভাবে সামাজিক পরিবর্তনও সূচিত করছে—যেমন, পুরনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির অবক্ষয় বা অবসান ও তার স্থানে নতুন প্রতিষ্ঠানগুলির আবির্ভাব, পুরনো মূল্যবোধের বিকল্প হিসাবে নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি। সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব যেমন গিয়ে পড়েছে রাজনীতির উপর, তেমনই রাজনৈতিক পরিবর্তনও সামাজিক পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করেছে। এই সর্বব্যাপী পরিবর্তনের যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের ধারণাগুলির পরনিষেকের মধ্য দিয়ে জন্ম নেওয়া রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব যেমন রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে, তেমন সমাজকেও। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, কোন্ বা কোন্ কোন্ সামাজিক শক্তির প্রভাবে শ্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর জনতা সরকার নিম্নবর্গের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করেন, আর সেই সুপারিশ অনুযায়ী সৃষ্টি হওয়া সংরক্ষণ-সংক্রান্ত আইন সমাজের প্রতিষ্ঠিত জাত-সমীকরণে কী পার্থক্য নিয়ে আসে—এই উভয় বিষয়ই রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের আলোচ্য।

১৭.৩ রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ

রাজনীতি চর্চা শুরু হয়েছিল সুদূর অতীতে গ্রিক সভ্যতার মধ্যে, আর সমাজকে পৃথকভাবে বোঝা ও ব্যাখ্যা করার জন্য সমাজতত্ত্বের জন্ম হয় ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ নাগাদ। কিন্তু রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের সূত্রপাত কবে আর কেনই বা?

আমরা পূর্বে দেখেছি যে, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব সমাজ ও রাজনীতির মধ্যে যোগসূত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করে, সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সেতুবন্ধন করে। কিন্তু যোগসূত্রের উপস্থিতি বা সেতুবন্ধনের সুযোগ তখনই থাকে যখন দূরত্ব বা পার্থক্য থাকে বা আছে বলে মনে করা হয়। প্রাচীন যুগের রাষ্ট্রদর্শনে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হত না। অ্যারিস্টটল (Aristotle) polis বা রাষ্ট্রকে দেখেছিলেন 'Koinonia' বা সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধ রূপ হিসাবে। এই ধরনের চিন্তার পিছনে প্রধান কারণ ছিল এই যে, গ্রিক নগর-রাষ্ট্রের সময়কার সমাজ গঠিত হত শুধুমাত্র স্বাধীন নাগরিকদের নিয়ে যারা প্রত্যেকেই কোনও-না-কোনওভাবে রাষ্ট্রকার্যের সঙ্গে যুক্ত থাকতো। মধ্যযুগে সমাজের পরিচালক হিসাবে চার্চ ও রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য করা হলেও প্রায় অধিকাংশ সময় জুড়ে রাষ্ট্রকে চার্চের অধীনস্থ বলে গণ্য করা হত। মধ্যযুগের শেষ অংশে, বিশেষ করে ইতালীয় চিন্তাবিদ মার্সিলিও-র (Marsiglio) ধারণায়, চার্চ ও রাষ্ট্র পরস্পরের থেকে স্বাধীন বলে পরিগণিত হলেও উভয়কেই তথাকথিত ঈশ্বর-নির্দেশিত প্রাকৃতিক আইনের পরিমণ্ডলের মধ্যে কাজ করতে হত।

মধ্যযুগের সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক চরিত্রও সমাজ ও রাজনীতির পৃথকীকরণের পথে বাধা হয়েছিল। কৃষি-কেন্দ্রিক, সংকীর্ণ ভৌগোলিক এলাকায় সীমিত ও আপেক্ষিকভাবে অপরিবর্তনীয় জীবনযাত্রায় সাধারণ কৃষক প্রজারা বংশ-পরম্পরায় নির্ভরশীল ছিলেন সামন্ত ভূস্বামীর উপর। একটি বিকেন্দ্রিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায়,

রাজা যেখানে রাজত্ব করতেন কিন্তু শাসন করতেন না, কার্যকরী রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করতেন সামন্ত ভূস্বামীরা। জমির মালিকানা ভোগ করার সুবাদে ভূস্বামীরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে কৃষকদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ও শোষণ করতেন। এই শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখতে ও শোষণের মাত্রাকে বৃদ্ধি করতে ভূস্বামীরা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের ভূমিকাও পালন করতেন। একই ব্যক্তিসমষ্টি একই সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করে থাকার ফলে কোথায় 'সমাজ' শেষ হচ্ছে ও রাজনীতি শুরু হচ্ছে তা বোঝা সম্ভব ছিল না।

সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, সমাজ ও রাজনীতি যে পরস্পরের থেকে পৃথক হতে পারে, তা মানুষ প্রথম উপলব্ধি করে পুঁজিবাদের (বিশেষ করে শিল্পপুঁজির) প্রতিষ্ঠার পর। উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদ তার পূর্বেকার ব্যবস্থা থেকে মৌলিকভাবে পৃথক। সামন্তসমাজের কৃষিকেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল সাধারণভাবে পরিবর্তনহীন। অপরদিকে, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা চরিত্রগতভাবে সতত পরিবর্তনশীল। শুধু তাই নয়, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা তার আবির্ভাবের পর দীর্ঘদিনের অপরিবর্তনীয় সমাজব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। দ্রুত ও সর্বব্যাপী পরিবর্তনের ধাক্কায় টালমাটাল সমাজ ও তার সমস্যাগুলিকে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করার জন্য জন্ম হয় সমাজতত্ত্বের, মোটামুটিভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি।

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের, বা সঠিকভাবে বলতে গেলে, রাজনীতিক সমাজতত্ত্বের জন্ম হয় প্রায় একই সময়ে, অর্থাৎ উনিশ শতকের মাঝামাঝি। ইউরোপীয় পটভূমিকায় এক নতুন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় সামন্ত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে বিরোধের মধ্য দিয়ে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা ও তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা সামাজিক সম্পর্কগুলো মানুষকে এক বিশেষ ধরনের জোটবদ্ধ অস্তিত্বের সন্ধান দেয়। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের জন্ম-ইতিহাস যাঁরা বিশ্লেষণ করেছেন, যেমন W. G. Runciman, Tom Bottomore, তাঁদের মতে, পুঁজিবাদের স্তরে উৎপাদন ব্যবস্থা আপাতদৃষ্টিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা-নির্ভর নয়। সামন্ত অর্থনীতির প্রধান উৎপাদনের উপকরণ কৃষিজমি ছিল উৎপাদন ব্যবস্থা ও রাজশক্তির মধ্যে যোগসূত্র, কারণ বাস্তবে না হলেও, তত্ত্বে রাজাই ছিলেন সমগ্র জমির মালিক। অপরদিকে কৃষিজমির কার্যকরী মালিক হিসাবে ভূস্বামীরা শ্রেণীগত স্বার্থে রাষ্ট্রশক্তির উপরও তাদের নিয়ন্ত্রণকে প্রসারিত করে। ফলস্বরূপ, অর্থনীতির জগৎ ও রাজনীতির এলাকার মধ্যে পৃথকীকরণের কোনও সীমারেখা কার্যত থাকেনি। বিপরীতে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ পুঁজি কোনও প্রাকৃতিক সম্পদ নয়, মানুষের কৃত্রিম সৃষ্টি। রাজশক্তি কোথাও কোথাও পুঁজির প্রাথমিক সৃষ্টিতে কিছু অবদান রাখলেও পুঁজির সৃষ্টি হয়েছিল প্রধানত ব্যক্তিগত উদ্যোগে। পরবর্তীকালে, শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময়ও রাজশক্তির কোনও কার্যকরী ভূমিকা ছিল না। প্রথমদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাষ্ট্রেরও কোন লক্ষণীয় ভূমিকা ছিল না। এককথায়, পুঁজিবাদী উৎপাদনের উন্মেষ রাষ্ট্র বা রাজশক্তির সাহায্য ব্যতিরেকেই গড়ে উঠেছিল।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই আপাত স্বাধীন জগৎকে হেগেল Civil Society বা গণসমাজ বলে অভিহিত করেছেন যা রাজনীতির জগৎ বা রাষ্ট্রের থেকে পৃথক। তাঁর মতে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দ্বন্দ্বগুলি গণসমাজের মধ্যেই সংগঠিত হয়; সেই অর্থে গণসমাজ সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র ও বিরোধী স্বার্থের এলাকা। বিপরীতে রাষ্ট্র সকল স্বার্থদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে থেকে সমাজের সার্বজনীন ও সাধারণ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। এই অর্থে, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য হেগেল প্রথম দেখালেন।

হেগেলের গণসমাজের ধারণা মার্ক্সের চিন্তায় প্রভাব ফেলেছিল। গণসমাজ যে মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সেই ব্যাখ্যায় মার্ক্স হেগেলীয় চিন্তা থেকে বিচ্যুত হননি। যেখানে তিনি হেগেলের সঙ্গে একমত হতে পারেননি তাহল গণসমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে। হেগেলীয় রাষ্ট্র ছিল গণসমাজের দ্বন্দ্বগুলির থেকে নিরপেক্ষ ও সামাজিক স্বার্থবহনকারী। মার্ক্সের মতে, রাষ্ট্র সামাজিক-অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের সমাধানের জন্য সৃষ্টি হয়নি। সামাজিক-অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বই রাষ্ট্রকে সৃষ্টি করেছে ও প্রভাবান্বিত করে। মার্ক্সের ব্যাখ্যায় সামাজিক-অর্থনৈতিক সংগ্রামে রাষ্ট্র কখনই নিরপেক্ষ থাকে না। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার তত্ত্বকে অনুসরণ করে মার্ক্স দেখাতে চেয়েছিলেন যে, একটা সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি সেই সমাজের অবশিষ্ট অংশের (যার মধ্যে রাজনীতিও অন্তর্ভুক্ত) সাধারণ চরিত্রকে অনেকটাই নির্ণয় করে। এইখানেই রাজনীতির সামাজিক ব্যাখ্যার সূত্রপাত, জন্ম রাজনীতি সমাজতত্ত্বের।

শিল্পবিপ্লব ও পুঁজিবাদ যেমন মার্ক্সকে অনুপ্রাণিত করেছিল সমাজ ও রাজনীতির আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে চিন্তা করার জন্য, তেমনই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক বিপ্লবগুলি ফরাসী চিন্তাবিদ আলেক্সিস-দ্য-টক্‌ভিল্ (Alexis De Tocqueville, 1805-1859)-কে চিন্তিত করে। একই বিষয়ে। টক্‌ভিলের মতে, আধুনিক সমতা-ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা মূলত এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবেরই ফলশ্রুতি, শিল্প-বিপ্লবের নয়। কোন্ প্রকৃতির বিপ্লব বেশি প্রভাবশালী সেই বিষয়ে মার্ক্স ও টক্‌ভিলের মধ্যে বিতর্ক থাকলেও, তাঁর বিভিন্ন লেখা থেকে এই বিষয়ই স্পষ্ট হয় যে, রাজনৈতিক জগতের মৌল পরিবর্তন সামগ্রিক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। টক্‌ভিলের মতে, ফরাসী বিপ্লব শুধুমাত্র ফরাসী সমাজব্যবস্থাতেই পরিবর্তন নিয়ে আসেনি। সমগ্র মানবজাতির পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিল। একই সঙ্গে টক্‌ভিল অবশ্য বিশ্বাস করতেন যে, রাজনৈতিক জগতের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সমাজজীবনে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন তখনই আনতে পারবে যখন মানুষের জীবনধারণের মানে ও জীবনযাত্রার প্রণালীতে পরিবর্তনকে গ্রহণ করবার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তার অর্থ এই যে, সমাজ শুধু একটি রাজনীতি-নির্দেশিত জড়পদার্থ নয়, রাজনীতি-সমাজ আন্তঃক্রিয়ায় সমাজ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেই রাজনৈতিক রূপান্তর সমাজে তার প্রভাব বিস্তার করতে পারবে, না হলে প্রাচীন বা মধ্যযুগের যে কোনও রাজনৈতিক বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের মতো মৌল সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসতে সক্ষম হত।

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশে জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স হেবারের (Max Weber) অবদানও অনস্বীকার্য। এই কথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, মার্ক্সের সঙ্গে সঙ্গে হেবারও রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের অন্যতম স্রষ্টা। অবশ্য হেবারের সঙ্গে মার্ক্সের সমাজ ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে চিন্তার মৌল পার্থক্য ছিল। তাঁর The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalian (1904) নামক গ্রন্থে হেবার সমাজ ও অর্থনীতির চরিত্র নির্ধারণে অর্থনৈতিক নয় এমন উপাদানগুলির সমাজতাত্ত্বিক ভূমিকার উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি সামাজিক স্তরবিন্যাসের ভিত্তি হিসাবে শুধুমাত্র ব্যক্তির শ্রেণীগত অবস্থানকে দায়ী করেননি। হেবারের মতে, ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান বা ক্ষমতার সামাজিক কাঠামোতে তার স্থান অনেক ক্ষেত্রেই সমাজকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করে। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের উদ্ভবের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হেবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল 'ক্ষমতা'-র ধারণার স্পষ্টীকরণ। সামাজিক সম্পর্কের একটি দিক হিসাবে ক্ষমতা বলতে হেবার বুঝিয়েছেন অন্যের আচরণের উপর নিজের ইচ্ছাকে আরোপ করার সম্ভাবনাকে। এই অর্থে সমাজের

সকল ক্ষেত্রেই ক্ষমতা ও ক্ষমতার প্রয়োগকে লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু ক্ষমতার প্রয়োগ ও প্রয়োগের সম্ভাবনা একমাত্র সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেই বিদ্যমান, সেই কারণেই ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কর্তৃত্বের সম্পর্ক সমাজের সকল স্তরেই বর্তমান। কিন্তু ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে রাষ্ট্রই একমাত্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার সামগ্রিকভাবে সমাজের উপর ক্ষমতা প্রয়োগের একচেটিয়া কর্তৃত্ব আছে। সমাজ ও রাজনীতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী 'ক্ষমতা'-ই রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে গত শতকের শুরুর দিকের 'এলিট' তত্ত্বের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ক্ষমতাকে সমাজ ও রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছিলেন হ্বেবার। তাঁর পূর্বে মার্কস ক্ষমতার চিন্তাকে সংযুক্ত করেছিলেন ব্যক্তিগত সম্পদ-ভিত্তিক সমাজের শ্রেণী-বিভক্তির সঙ্গে ও ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজে শ্রেণীব্যবস্থার অবসান ঘটলে মানুষের উপর মানুষের ক্ষমতার প্রয়োগ অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে। এলিট তাত্ত্বিকেরা, যথা ভিলফ্রেডো প্যারেটো (Vilfredo Pareto), গেইটানো মস্কা (Gaetano Mosca), রবার্ট মিশেল্‌স (Robert Michels) কিন্তু ক্ষমতাকে সকল সমাজের কেন্দ্রীয় বাস্তব বলে মন্তব্য করেছিলেন। তাঁদের মতে, সকল প্রকার সমাজেই (এবং Michels-এর মতে সকল বৃহৎ সংগঠনেই) ক্ষমতা কেন্দ্রীয়ভাবে থাকে ও থাকবে যা এক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীগুলির উপর প্রয়োগ করবে। এলিট বলতে তাঁরা বুঝিয়েছিলেন সেই সংখ্যালঘু সামাজিক গোষ্ঠীকে যা নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য, বা বিশেষ কোনও গুণাবলী বা বিশেষ কোনও সামাজিক অবস্থানের সুবাদে ক্ষমতার অধিকারী হয়। গণতন্ত্র সম্বন্ধে ধ্রুপদী ধারণা ("Government by the people") বা মার্ক্সের সাম্যবাদী সমাজ সম্বন্ধে বিশ্বাস ("Administration of men will be replaced by the administration of things") উভয়েরই বিরোধিতা করেছিল এলিট তত্ত্ব।

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ও বিবর্তনের প্রথম যুগে মুখ্য বিতর্ক ছিল সামাজিক শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতির আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য আছে কি নেই সেই বিষয়ে। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তাগুলি দু'টি মেরুতে স্থান দেওয়া হত, যার একপ্রান্তে রয়েছে রাজনীতি সম্পূর্ণভাবেই সামাজিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—এই ধারণা ও অপরপ্রান্তে রাজনীতির আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের উপর বিশ্বাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের বিবর্তনের পরবর্তী স্তরেও আলোচনার কেন্দ্রে ছিল এই দু'টি পরস্পর-বিরোধী চিন্তা।

১৭.৪ রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের পরিধি

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের আলোচনার পরিধি সম্বন্ধে অনেকটাই স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিকদের বিচার্য্য বিষয়গুলি থেকে। রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিকদের দু'টি গোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাজনীতি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

গ্রিন (Green) ও অরলিয়েন্স (Orleans)-এর মতে, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য রাষ্ট্র নামক একটি বিশেষ সামাজিক কাঠামোকে ব্যাখ্যা করা। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয় :

১) রাষ্ট্রের কাঠামো;

২) বৈধতার চরিত্র ও শর্তাবলী;

৩) একচেটিয়া শক্তির প্রকৃতি ও রাষ্ট্র-কর্তৃক তার ব্যবহার;

৪) রাষ্ট্রের চেয়ে ক্ষুদ্রতর সংগঠনগুলির চরিত্র ও রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক।

গ্রিন ও অরলিয়েন্স-এর মতে, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের তত্ত্ব ও গবেষণাগুলির দৃষ্টি দেওয়া উচিত এই সমস্ত বিষয়গুলির উপর যেমন, ঐকমত্য ও বৈধতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক।

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের অপর আর এক বিশেষজ্ঞ অ্যান্ড্রু এফরাট (Andrew Effrait) অবশ্য এই বিষয়টির সম্বন্ধে একটি ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেছেন। তাঁর বিচারে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব সকল সামাজিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পদ্ধতি ও বণ্টনের কারণ ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা করে। সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন পরিবার, শিক্ষা সংক্রান্ত ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং অন্যদিকে সরকারি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি।

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক সেইমুর মার্টিন লিপসেট (Saymoor Martin Lipset) মন্তব্য করেছিলেন যে, যদি সমাজের স্থায়িত্ব সাধারণভাবে সমাজতত্ত্বের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়, তা হলে বিশেষ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই লিপসেট ও আর. বেনেডিক্ট (S. Lipset ও R. Bendict). সুপারিশ করেছিলেন যে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের আলোচনার মধ্যে স্থান পাওয়া উচিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির :

১) নির্বাচনী আচরণ;

২) অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৩) স্বার্থগোষ্ঠী ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ভাবাদর্শ;

৪) রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সংগঠন;

৫) আমলাতন্ত্র ও তার সমস্যা।

আলি আশরফ (Ali Ashraf) ও এল. এন. শর্মা (L. N. Sarma)-র মতে, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের দৃষ্টি চারটি এলাকায় নিবদ্ধ থাকা উচিত, যথা, (ক) রাজনৈতিক কাঠামোগুলি (যেমন সামাজিক শ্রেণী বা

জাতপাত, এলিট গোষ্ঠী, স্বার্থ গোষ্ঠী, আমলাতন্ত্র, রাজনৈতিক দল ও উপদল); (খ) রাজনৈতিক জীবন (অর্থাৎ, নির্বাচন পদ্ধতি, রাজনৈতিক সংযোগ, মতামত গঠন ইত্যাদি); (গ) রাজনৈতিক নেতৃত্ব (তার ভিত্তি ও গোষ্ঠীগত ক্ষমতা কাঠামোর শ্রেণীবিভাগ ও কার্যপদ্ধতি; (ঘ) রাজনৈতিক উন্নয়ন (ধারণা ও পরিমাপের সূচকগুলি, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং সমাজ পরিবর্তন ও আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক)।

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব রাষ্ট্রের ক্ষমতা-কাঠামো, কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ, অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করেছে। কিন্তু এই সমস্ত ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে যথেষ্ট সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতাবাদী গবেষণা হওয়া সত্ত্বেও খুব একটা স্পষ্ট কোনও তাত্ত্বিক কাঠামোর সৃষ্টি হয়নি। অন্যদিকে, রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিকেরা সাধারণভাবে আইনগত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি, গোষ্ঠীস্তরে সিদ্ধান্তগ্রহণ পদ্ধতি, ও ব্যক্তির স্তরে পছন্দ-অপছন্দ নির্ধারণের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়কে উপেক্ষা করেছেন। এলিট তাত্ত্বিকেরা ব্যতীত অন্য রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিকেরা আদর্শবাদী রাজনৈতিক তত্ত্ব সৃষ্টির থেকে বিরত ছিলেন।

১৭.৫ অনুশীলনী

ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক :

১। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব পাঠের পক্ষে কী যুক্তি আছে?

২। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব এই ধারণাটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

৩। ক্ষমতাকে টম বটোমোর একটি উপকরণ মনে করেন কেন?

৪। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার আবির্ভাবে সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটে কী কারণে?

৫। আলেক্সি দ্য টক্‌ভিল কে ছিলেন? কী তাঁর বক্তব্য?

৬। 'এলিট' তত্ত্বের প্রবক্তা কারা?

৭। সেমুর মার্টিন লিপসেটের মতে কোন্ কোন্ বিষয় রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত?

খ) রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। সমাজতাত্ত্বিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে তথ্যের-আদান প্রদান ও তত্ত্বের সংযোগের পিছনে অনুপ্রেরণা আসে কী কী কারণে?

২। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের উদ্ভব কীভাবে হল তার একটি আনুপূর্বিক বিবরণ দিন।

৩। হেগেলের গণসমাজের ধারণা ও সে সম্পর্কে কার্ল মার্ক্স-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা করুন।

৪। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণে ম্যাক্স ওয়েবারের অবদান কী আলোচনা করুন।

৫। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের পরিধির মধ্যে মূলত কী কী বিষয় ধরা হয়ে থাকে?

১৭.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। S. M. Lipset : Politics and the Social Sciences. (Chapter - 4)

২। Michael Rush : Politics and Society.

৩। Tom Bottomore : Political Sociology.

৪। W. G. Runciman : Social Science and Political Theory. (Ch. II)

৫। Ali Ashraf and L. N. Sharma : Political Sociology.

একক ১৮ □ রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব : ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব

গঠন

১৮.০ উদ্দেশ্য

১৮.১ প্রস্তাবনা

১৮.২ ক্ষমতা বলতে কী বোঝায়

১৮.২.১. ক্ষমতার সামাজিক সংগঠন

১৮.৩ ক্ষমতার উপাদান

১৮.৪ ক্ষমতার সম্পর্ক

১৮.৫ ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও বৈধতা

১৮.৬ বৈধতার উৎস ও প্রকারভেদ

১৮.৬.১ কর্তৃত্বের আদর্শ বা বিশুদ্ধ প্রকারভেদ

১৮.৬.২ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সম্পর্ক

১৮.৭ অনুশীলনী

১৮.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে বুঝতে সুবিধে হবে—

- রাজনৈতিক সামাজিক অর্থে ক্ষমতার স্বরূপ কী
- ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে কীভাবে নানাবিধ ক্ষমতার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়
- ক্ষমতার অবিরত প্রয়োগের স্বার্থে তাকে বৈধতা প্রদান করা হয় কোন্ কোন্ উপায়ে
- ক্ষমতা প্রয়োগকারী কর্তৃত্ব কী কী রূপ পরিগ্রহ করে এবং
- এর থেকে কর্তৃত্বের কোনও বিশুদ্ধ রূপ নির্দেশ করা যায় কিনা

১৮.১ প্রস্তাবনা

আগের এককটি পড়বার সময় আমরা লক্ষ্য করেছি, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হল ক্ষমতা। রাজনৈতিক স্তরে এই ক্ষমতার ব্যবহার-সমাজে কর্তৃত্বের বণ্টন ঘটায় এবং তার থেকে উদ্ভূত হয় সমাজ সম্পর্কের বৈচিত্র্য। নানা উপাদানের সংমিশ্রণে ক্ষমতার এক এক ধরনের কাঠামো গড়ে ওঠে।

এর জটিলতাও কম নয়। সুতরাং, বিষয়টি আরও গভীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। আমাদের দেখতে হবে রাজনৈতিক-সামাজিক অর্থে ক্ষমতার স্বরূপটি কীরকম এবং মানুষের সমাজ-সম্পর্ক রচনায় কি তার প্রভাব। ক্ষমতার অর্থই হ'ল কোনও না কোনও স্তরের বিন্যাস রচনা, যার মধ্যে কর্তৃত্ব আছে, অধীনতাও আছে। এছাড়া ক্ষমতা হাতে থাকাই যথেষ্ট নয়। এর প্রয়োগ যাতে সহজ ও সুগম হয় সেটাও নিশ্চিত করা দরকার। অর্থাৎ, কর্তৃত্ব বলতে শুধু জোর-জুলুম নয় তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া দরকার—স্বাভাবিক আনুগত্যের। সেই আনুগত্য অর্জনেরই অন্য নাম বৈধতা। এ জন্য যেসব কৌশল অবলম্বন করা হয় এবং কর্তৃপক্ষ যে সব রূপ ধারণ করে থাকে তার সম্যক ধারণা ছাড়া সমাজকে সম্পূর্ণ বোঝা যায় না।

১৮.২ ক্ষমতা বলতে কী বোঝায়

ব্যাপক অর্থে কোনও ব্যক্তির ক্ষমতা আছে বলতে বোঝায় যে, সেই ব্যক্তির সামর্থ্য আছে তার পারিপার্শ্বিকের উপর আকাঙ্ক্ষিত বা ঈপ্সিত প্রভাব বিস্তার করার এবং তার মধ্য দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবায়িত করার। এই প্রকার সাধারণ অর্থে ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার কতকগুলি পূর্বশর্ত আছে, যেমন শারীরিক শক্তি, জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হওয়া, পার্থিব সম্পদের মালিকানা ভোগ করা এবং অন্যের নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীনতা ভোগ করা। এইগুলির মধ্যে সম্পদ ও স্বাধীনতার অধিকারী হওয়া অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, কারণ স্বাধীনতা ছাড়া শক্তি বা সম্পদ কোনও ক্ষমতা সৃষ্টি করে না ও বিপরীতে সম্পদ ছাড়া স্বাধীনতাও ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে তাৎপর্যহীন। যেহেতু ক্ষমতার এই পূর্বশর্ত বা উৎসগুলি মানবসমাজে অসমভাবে বণ্টিত সেই কারণে সমাজে ক্ষমতার বণ্টনও অসম।

একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও ক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ক্ষমতা বলতে বোঝায় কোনও ব্যক্তির দ্বারা অপরের ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবান্বিত বা নিয়ন্ত্রণ করা, নিজের ইচ্ছানুযায়ী ও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যকে কোনও কাজ করতে বাধ্য করার সামর্থ্যকে। এই অর্থে ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই সম্পর্ক-ভিত্তিক এবং সম্পদ ও সামর্থ্যের আপেক্ষিক তারতম্যের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিগত সামর্থ্যের পরিমাণে অসাম্য না থাকলে ক্ষমতার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় না কারণ ক্ষমতাও জলের স্রোতের মতো উঁচু থেকে নিচুতে গতি লাভ করে। তাই আমরা দেখি যে, সমাজে জমিদার কৃষকের উপর, উচ্চবর্গের মানুষ নিম্নবর্গের উপর, অধিকতর শিক্ষিত ব্যক্তি অল্প-শিক্ষিত বা নিরক্ষরের উপর, বা পুরুষেরা মহিলাদের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়। বাস্তবে যে কোনও সমাজেই একটা ক্ষমতার স্তরবিন্যাস যার মধ্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তর নিম্নস্তরগুলির উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে। আলোচনার পরবর্তী অংশে ক্ষমতার সামাজিক চরিত্র বা ভিত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা দেখব যে, কোনও ব্যক্তির নিজের ক্ষমতার প্রয়োগ তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর যতটা না নির্ভর করে তার চেয়ে বেশি নির্ভর করে ক্ষমতার সামাজিক স্তরবিন্যাসে সেই ব্যক্তির অবস্থানের উপর।

১৮.২.১ ক্ষমতার সামাজিক সংগঠন

ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ক্ষমতার পার্থক্য যতটা না ব্যক্তি-নির্ভর তার চেয়ে বেশি সমাজ-নির্ভর। প্রত্যেক সমাজেই একটি ক্ষমতার কাঠামো দেখতে পাওয়া যায় যেখানে বিভিন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-গোষ্ঠী বিভিন্ন অবস্থানে থাকে। সমাজে ক্ষমতার স্তরবিন্যাস একটি স্থায়ী রূপ নেয় ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে এবং এর ফলে এক

ধরনের "আধিপত্য-বশ্যতা" (domination-subordination)-র সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়। ক্ষমতার সামাজিক সংগঠন ব্যাখ্যা করতে গেলে দু'টি প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, কোন্ কোন্ ধরনের ক্ষমতার উপাদান ব্যবহার করে এক সামাজিক গোষ্ঠী অপর এক বা একাধিক গোষ্ঠীর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে? দ্বিতীয়ত, প্রাথমিকভাবে কোন্ কোন্ সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে এই ক্ষমতা-কেন্দ্রিক আধিপত্য-বশ্যতার সম্পর্ক ইতিহাসগতভাবে অধিকাংশ সমাজে দেখা গেছে?

১৮.৩ ক্ষমতার উপাদান

সমাজে ক্ষমতার উপাদানগুলি ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের হলেও অধিকাংশ সময়ে ও ক্ষেত্রে একজোট হয়ে কাজ করে। তবু তাদের চরিত্র ব্যাখ্যা করার জন্য পৃথকভাবে আলোচনা করাই সুবিধাজনক।

প্রথম উপাদান হিসাবে উল্লেখ করা যায় পার্থিব সম্পদের মালিকানাকে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত উৎপাদন ও জীবনধারণের উপাদান ও দৈহিক শক্তিপ্রয়োগের সামর্থ্য। এই প্রকারের সম্পদ শক্তির সন্ধান তখনই দিতে পারে যখন কিছু মানুষকে এর মালিকানা ভোগ করা থেকে বঞ্চিত করে রাখা যায়, কারণ সকলেই যদি এই উপাদানের উপর অধিকার ভোগ করত, তাহলে ক্ষমতা প্রয়োগের কোন বিশেষ সুযোগ কারও থাকত না। উৎপাদন ও জীবনধারণের উপাদানের মালিকানার যোগ্যতা বা শর্তাবলী যে কোনও সমাজে নির্ধারণ করে সম্পত্তির নিয়মগুলি (rules of property)। সম্পত্তির নিয়মগুলি অবশ্য চিরন্তন বা চিরস্থায়ী নয়। একই সমাজে ভিন্ন সময়ে বা ভিন্ন সমাজে একই সময়ে নিয়মগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

দৈহিক শক্তির প্রয়োগ বা প্রয়োগের হুমকি ক্ষমতার স্পষ্ট, নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। অর্থনৈতিক শক্তির প্রয়োগ তুলনামূলকভাবে প্রচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট, কারণ অর্থনৈতিক সম্পদের (যেমন, জমি, পুঁজি, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি) উপর যার দখল নেই, সে তার জীবনধারণের জন্য নির্ভরশীল থাকে সম্পদের অধিকারীদের নিকট। শ্রমের পরিবর্তে মজুরি—তা দ্রব্যেই হোক বা অর্থে—এক প্রকারের সামাজিক বিনিময়ের সম্পর্ক গড়ে তোলে।

ক্ষমতার দ্বিতীয় ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রয়োজনীয় কাজগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ ও তার জন্য আবশ্যক দক্ষতা ও জ্ঞানের মালিকানার উপর। এই ক্ষেত্রেও ক্ষমতার সৃষ্টি হয় সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাজের এলাকায় প্রবেশ ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের অধিকার-অনধিকারের উপর। সমাজিক শ্রমবিভাগ ব্যবস্থা এই অধিকার-অনধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। আপাতদৃষ্টিতে শ্রমবিভাগ এক ধরনের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও, বাস্তবে এই ব্যবস্থা একটি ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের সন্ধান দেয়। সমাজে কিছু কাজ অধিকতর সামাজিক গুরুত্ব বহন করে এবং সাধারণভাবে দেখা যায় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সেই ধরনের কাজের দায়িত্ব লাভ করে না বা তার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়। প্রাক্-আধুনিক সমাজে পুরোহিত শ্রেণী বা প্রাক্-গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে মুষ্টিমেয় শাসকবর্গের গুরুত্ব ও ক্ষমতা এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল।

ক্ষমতার তৃতীয় উপাদান হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, কতকগুলি পদে আসীন থাকার মধ্য দিয়ে কিছু ব্যক্তি অপরকে আদেশ করার অবস্থানে থাকে। এই ধরনের আইনানুগ বা আইনসঙ্গত ক্ষমতার অধিকার কর্তৃত্ব হিসাবে চিহ্নিত হয়। সমাজতত্ত্বের চিন্তায় কর্তৃত্ব হল বৈধ ক্ষমতা; কিন্তু পূর্বের আলোচনা থেকে বোঝা

যায় যে, সব সামাজিক ক্ষমতারই প্রাথমিক বৈধতা আছে, কেননা সব ক্ষেত্রেই কোনও-না-কোনও সামাজিক আইন ঐ ক্ষমতাগুলিকে সমর্থন করছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কর্তৃত্ব যেমন এক বিশেষ ধরনের ক্ষমতা, তেমনই ক্ষমতার একপ্রকারের উৎসও বটে। অর্থাৎ, কর্তৃত্ব হল আদেশ জারি করার ক্ষমতা। কর্তৃত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হলেও এখন শুধু এই কথাটিই বলা যায় যে, কর্তৃত্ব যে কোনও সমাজের 'উর্ধ্বতন-নিম্নতন' বা 'আধিপত্য-বশ্যতা'-র সম্পর্কগুলিকে একপ্রকারের আইনী মোড়কে ঢেকে রাখে বা রাখবার চেষ্টা করে।

১৮.৪ ক্ষমতার সম্পর্ক :

ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হওয়া 'উর্ধ্বতন-নিম্নতন'-র সম্পর্ক বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করলেও, সাধারণভাবে তিন ধরনের সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। এইগুলি যথাক্রমে শ্রেণী, লিঙ্গ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা-ভিত্তিক। এই তিন প্রকারের ক্ষমতার সম্পর্কের ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তির কারণ এইগুলি তিনটি মৌল সামাজিক ক্রিয়াকলাপকে কেন্দ্র করে, যথা—উৎপাদন, বংশ-বৃদ্ধি এবং দৈহিক সুরক্ষা ও আইন-প্রণয়নকে ঘিরে আবর্তিত হয়।

উৎপাদন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সমাজে শ্রেণী-ভিত্তিক আধিপত্য সৃষ্টি হয়। শ্রেণী-ক্ষমতার প্রাথমিক ভিত্তি উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থায়, যার জন্য মালিকানা থেকে বঞ্চিত মানুষেরা নিছক জীবনধারণের জন্য বিত্তবানদের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। উপরন্তু, শ্রেণী-ভিত্তিক ক্ষমতা ব্যবস্থাকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য বিত্তবানেরা সম্পত্তির সপক্ষে আইন সৃষ্টি করে; উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা থেকে বিত্তহীনদের বঞ্চিত করেই সে আইন সৃষ্ট হয়। এইভাবে উৎপাদনকে কেন্দ্র করে সমাজে একটি ক্ষমতার ব্যবস্থা দেখা দেয়।

সমাজে দ্বিতীয় প্রকার ক্ষমতার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে নারী-পুরুষের লিঙ্গ বিভাগকে কেন্দ্র করে। সব সমাজেই কোনও-না-কোনও প্রকার লিঙ্গ-ভিত্তিক শ্রমবিভাগ কার্যকরী থেকেছে ও এখনও থাকে। এই শ্রমবিভাগ শুধুমাত্র স্ত্রী-পুরুষের শারীরবৃত্তীয় পার্থক্য থেকে সৃষ্টি হয়নি। শিশুপালন ও অন্যান্য গৃহস্থালির দায়িত্ব একচেটিয়াভাবে মহিলাদের উপর ন্যস্ত হওয়ার ফলে গৃহসীমার বাইরের কাজগুলি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই পুরুষদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম থাকলেও, সাধারণত শারীরবৃত্তীয় পার্থক্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই প্রকারের সামাজিক শ্রমবিভাগ অধিকাংশ সমাজে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সামাজিক শ্রমবিভাগের মধ্যেই পুরুষের সঙ্গে নারীর অধীনতার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়, কারণ জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনে (যেমন কৃষি বা শিল্প) সমান ভূমিকা পালন করার সুযোগ বা সময় নারীদের থাকে না। এই অধীনতার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে মহিলাদের উপর পুরুষদের ক্ষমতা

সমাজে 'আধিপত্য-বশ্যতা'র তৃতীয় মাত্রার, বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় রাজনীতির এলাকায়। এক্ষেত্রে সংগঠিত হয় দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সামাজিক ক্রিয়াকলাপ একে অপরের পরিপূরক দু'টি ক্ষমতার উপায়কে কেন্দ্র করে। প্রথম ক্রিয়াকলাপটি শারীরিক নিরাপত্তার প্রয়োজন ও নিরাপত্তা দেওয়ার উপযোগী ক্ষমতাকে

কেন্দ্র করে। সাধারণভাবে সমাজের ইতিহাসে দেখা গেছে যে, সুরক্ষার প্রয়োজন সার্বজনীন হলেও সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা—যা অনেকটাই শারীরিক শক্তিনির্ভর—সীমিত থাকে স্বল্পসংখ্যক, নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির মধ্যে। এই পটভূমিকায় যেসব মুষ্টিমেয় মানুষ নিজেদের ও অপরের নিরাপত্তা বিধান করে নিজস্ব শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে, তারাই অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানুষদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। এই ধরনের আধিপত্যের স্থানে যারা থাকে, তারা তাদের বিশেষ সামর্থ্যকে ব্যবহার করে সমাজে ক্ষমতার নিয়মগুলি সৃষ্টি করে। ক্ষমতার নিয়মগুলি দু'টি বিষয়কে সুনিশ্চিত করে—সমাজে দৈহিক শক্তি প্রয়োগের বিভিন্ন পথ ও পদ্ধতির ঐ নিয়ম-স্রষ্টাদের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখা এবং ঐ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এই সামর্থ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে অপরাপর গোষ্ঠীকে বাধা দেওয়া। দৈহিক শক্তির উপর একচেটিয়া দখলকে ব্যবহার করা হয় শুধুমাত্র ক্ষমতা-সংক্রান্ত নিয়মগুলির জন্য নয়, সামগ্রিক সমাজকে পরিচালনা করার আইনগুলিকেও সৃষ্টি করার জন্যও। অর্থাৎ, রাজনৈতিক কর্তৃত্বের আসনটি অধিকার করার জন্য।

১৮.৫ ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও বৈধতা

সমাজে বিভিন্ন প্রকার শক্তি বা সামর্থ্য-কেন্দ্রিক অসাম্যের পরিস্থিতি থেকে সৃষ্টি হওয়া 'আধিপত্য- বশ্যতা'-র সম্পর্ক নিয়ে আলোচনায় দেখা যায় যে, আধিপত্যর রাজনৈতিক দিকটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক আধিপত্য সামগ্রিক সমাজের উপর প্রসারিত বলে আর সকলপ্রকার আধিপত্যকে (যেমন অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি) সুনিশ্চিত করতে পারে বা কোনও বিশেষ ধরনের, আধিপত্যের ভিত্তিকে ধ্বংস করে নতুন ধরনের আধিপত্যের পটভূমি সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজনৈতিক আধিপত্য, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্য দিয়ে কার্যকরী রূপ গ্রহণ করে, শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ শক্তি প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল থাকতে পারে না। নিরবচ্ছিন্ন, প্রত্যক্ষ শক্তিপ্রয়োগ সহজেই প্রতিবাদ-প্রতিরোধের জন্ম দিতে পারে। সেইজন্য দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক আধিপত্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন ক্ষমতার প্রয়োগকে পরোক্ষ, প্রচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট করে তোলা। উপরন্তু, তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন ক্ষমতার প্রয়োগকে বৈধতার মোড়কে ঢেকে দেওয়া যাতে ক্ষমতার লক্ষ্যবস্তু যেসব মানুষ, তারা আধিপত্যের ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক বা তাদের স্বার্থবহ বলে মনে করে। যখন ক্ষমতার সঙ্গে বৈধতা যুক্ত হয় তখনই তা দীর্ঘমেয়াদী হয় এবং কর্তৃত্ব নামে পরিচিত হয়।

কিন্তু বৈধত্য বলকে কী বোঝায় না জানলে কর্তৃত্বের সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্ক বোঝা যায় না। ব্যুৎপত্তিগতভাবে 'বৈধতা' শব্দটি আসছে 'বিধি' থেকে, যার অর্থ নিয়ম। সেই দিক দিয়ে শব্দকোষগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বৈধ বলতে বোঝায় নিয়মানুগ বা নিয়ামানুবর্তী। সমাজতত্ত্বের ভাষায় 'বৈধতা'র ধারণাটি নিছক নিয়মের সীমারেখা ছাড়িয়েও প্রসারিত। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনও আদেশের বৈধতা যতটা না নির্ভর করে নিয়ম বা আইনের উপর, তার চেয়ে বেশি নির্ভর করে তার ন্যায়সঙ্গতা সম্বন্ধে মানুষের স্বীকৃতির উপর। সাধারণভাবে বলতে গেলে—কোনও আদেশের বৈধতা নির্ভর করে সেই আদেশের উৎসের বৈধতার উপর; আদেশের সম্ভাব্য ফলাফলের উপর নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে দু'টি বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। প্রথমত, কোনও ব্যবস্থাতেই আদেশ বা আইনগুলির এককভাবে বৈধতা বিচার করা সম্ভব নয়। কারণ সেক্ষেত্রে সামগ্রিক আদেশ বা আইনী ব্যবস্থা স্থিতিশীলতা লাভ করবে না। দ্বিতীয়ত, সমাজে কোন্ ক্ষমতার উৎস বৈধ আর

কোন্‌টি নয়, সেই সম্বন্ধে যে কোনও সমাজে একটি মূল্যবোধ-ভিত্তিক ঐকমত্য দেখতে পাওয়া যায়। সমালোচকরা অবশ্য বলেন যে, ক্ষমতার অধিকারীরা তাঁদের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে নিজস্বার্থের ভিত্তিতে সমাজে একটি আপাত ঐকমত্য সৃষ্টি করেন এবং নিজেদের ক্ষমতাকে সুরক্ষিত করেন।

১৮.৬ বৈধতার উৎস ও প্রকারভেদ

বৈধতার উৎস ও প্রকারভেদ সম্পর্কে জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স হেবারের (১৮৬৪-১৯২০) অবদান অনস্বীকার্য। হেবার বৈধতার তিনটি উৎস ও তার থেকে সৃষ্টি হওয়া বৈধতার তিনটি প্রকার বা রূপের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর মতে, বৈধতার তিনটি উৎস হল পরম্পরা (Tradition); বিশেষ ব্যক্তিগত গুণাবলী বা গণসম্মোহনী (Charisma) ক্ষমতা এবং আইন ও যুক্তিবাদিতা (Legal- rationality)। এই তিনটি উৎসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্তৃপক্ষের তিনটি রূপ, যথা—পরম্পরা-ভিত্তিক বা সাবেকী (Traditional), গণ-সম্মোহনী (Charismatic) এবং আইন ও যুক্তিবাদ-ভিত্তিক (Legal-rational)।

(ক) পরম্পরা-ভিত্তিক বা সাবেকী কর্তৃত্ব :

প্রথা-প্রচলন নির্ভর ঐতিহ্যগত কার্যপ্রণালী সাবেকী কর্তৃত্বের বৈধতার উৎস। কোনও সমাজে কোনও বিশেষ ক্ষমতার দীর্ঘ, পরিবর্তনশীল অস্তিত্ব সেই ক্ষমতাকে বৈধতা প্রদান করে। হেবার এই ধরনের কর্তৃত্বকে বলেছেন, "The authority of the 'eternal yesterday' ", যার ভাষান্তর করা যায় "চিরন্তন অতীতের" কর্তৃত্ব। প্রাচীনযুগে গোষ্ঠীপতিদের কর্তৃত্ব বা রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজা বা রানীর কর্তৃত্ব এই ধরনের উৎস থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। কোনও এক সময়ে, কোনও এক বিশেষ পরিস্থিতিতে সৃষ্টি হওয়া 'আধিপত্য-বশ্যতা'র (domination-subordination) ক্ষমতার সম্পর্ক দীর্ঘ সময় ধরে কার্যকরী থাকার ফলে উভয় পক্ষের কাছে অভ্যাসগত হয়ে যায়। প্রচ্ছন্ন বা প্রত্যক্ষ সামাজিকীকরণ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এই ধরনের ক্ষমতার সম্পর্কের স্বাভাবিকতার ধারণা সমাজে সঞ্চালিত হয়। এইরূপ কর্তৃত্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধারণত সম্ভব হয় একমাত্র কোনও মৌল সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, যেমন ফ্রান্সে হয়েছিল ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের ফলে। একইভাবে রাশিয়ার জার-তন্ত্রের কর্তৃত্ব ধ্বংস হয় রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। অপরদিকে এই ধরনের কোনও মৌল ও আকস্মিক পরিবর্তন ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক সমাজে না আসার ফলেই বোধহয় আধুনিক, গণতান্ত্রিক রাজনীতির যুগেও সেদেশে সাবেকী কর্তৃপক্ষের উদাহরণ হিসাবে রাজতন্ত্র এখনও তার সাবেকী কর্তৃত্ব নিয়েই আছে।

সাধারণভাবে, সাবেকী কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া গিয়েছিল প্রাক্-শিল্প সভ্যতার সমাজগুলিতে। এইসব সমাজে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সামাজিক প্রথা ও ঐতিহ্যগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা হত। 'রাজনৈতিক শাসন ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক, যেখানে শাসকের ক্ষমতার উৎস সাংবিধানিক বা অন্য কোনও আইন নয়, বংশ-পরম্পরায় ভোগ করা প্রথাগত বিশেষাধিকার। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে দেখা গেছে, যে সমাজ যত আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হয়েছে, সাবেকী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ততই কমেছে। আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সাবেকী কর্তৃপক্ষের স্থানে আইন-নির্ভর, প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক কর্তৃপক্ষের সৃষ্টি হয়েছে। তবে সাবেকী কর্তৃপক্ষের দিন ফুরালেও, রাজনীতিতে সাবেকী উপাদানগুলি অল্পবিস্তর সব রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই বর্তমান।

(খ) গণসম্মোহনী কর্তৃপক্ষ :

Charisma বা গণসম্মোহনী ক্ষমতা তাঁরই থাকে যিনি বিশেষ কোনও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সুবাদে বহু মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন। ইতিহাসের পাতায় এইরকম অনেক সাধু-সন্ত বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে আমরা খুঁজে পাই। যেমন—যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, কবির, নানক, লেনিন, গান্ধীজি, মাও সে তুং। গণসম্মোহনী ক্ষমতার ভিত্তিতে রয়েছে ঐসব প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিদের প্রতি ভক্ত ও সমর্থকদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এই ভক্তি বা শ্রদ্ধা শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিদের প্রতিই থাকে না, তাঁদের আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার প্রতিও থাকে।

সাধারণভাবে, কর্তৃত্বের অন্য দু'টি উৎস যেখানে দুর্বল বা অনুপস্থিত, সেখানেই গণসম্মোহনী কর্তৃপক্ষের আবির্ভাব হতে পারে। গণসম্মোহনী কর্তৃপক্ষের কার্যপদ্ধতি কোনও প্রতিষ্ঠানিক বা আইনগত পথ অনুসরণ করে না, কিন্তু কর্তৃত্ব রক্ষা বা শক্তিশালী করতে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনে ব্যবহার করে, যেমন হিটলার সৈন্যবাহিনী ও প্রচারমাধ্যমগুলিকে করেছিলেন।

ব্যক্তিগত গুণাবলী-নির্ভর হওয়ার ফলে সম্মোহনী কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রধান সমস্যা ক্ষমতার উত্তরাধিকারের। সম্মোহনী ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি যখন রাজনীতির দৃশ্যপটে থাকেন না, তখন ক্ষমতার উত্তরাধিকারীরা চেষ্টা করেন তাঁর ভাবমূর্তিকে ব্যবহার করার এবং সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকারের সাংগঠনিক বা প্রাতিষ্ঠানিক পথ-পদ্ধতির সাহায্য নেন। হ্বেবার এই পদ্ধতিগুলিকেই "routinisation charisma" বলে অভিহিত করেছেন।

সম্মোহনী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হিসাবে যদি তাঁর কোনও সন্তান বা পরিবারের অন্য কোনও সদস্য কার্যভার গ্রহণ করেন সেক্ষেত্রে সাবেকী কর্তৃপক্ষে রূপান্তর ঘটে। অপরদিকে যদি সম্মোহনী কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে বা তাঁর ধ্যান-ধারণা ও বক্তব্যগুলিকে বা তাঁর ভাবমূর্তিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্থায়িত্ব দিয়ে তাঁর ক্ষমতা থেকে অনুপস্থিতির সময় ব্যবহার করা হয়, তাহলে আইনভিত্তিক ও যুক্তিনির্ভর কর্তৃপক্ষের সৃষ্টি হয়। সেইজন্য সম্মোহনী কর্তৃপক্ষকে অস্থিতিশীল ও অস্থায়ী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

(গ) আইনগত ও যুক্তি-ভিত্তিক কর্তৃপক্ষ :

এই প্রকারের কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার উৎস আইন। এর বৈধতার উৎস হল কর্তৃত্বের আইনসঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত চরিত্র। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার পর রাজনীতিতে যে আধুনিকতা আসে, তারই ফলশ্রুতি আইনগত ও যুক্তিভিত্তিক কর্তৃপক্ষ। সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়। বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিবর্তনশীল সীমারেখার রাজত্বগুলি পরিণত হতে থাকে স্থায়ী জাতীয়-রাষ্ট্রের। ইউরোপের প্রেক্ষাপটে চর্তুদশ-পঞ্চদশ শতক থেকে এই পদ্ধতি দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। রাষ্ট্রব্যবস্থায় আধুনিক জাতীয়-রাষ্ট্র যেসব চরিত্রগত ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন নিয়ে আসে, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান দিকটি ছিল ব্যক্তির ইচ্ছা-নির্ভর শাসনের স্থানে আইনের নৈর্ব্যক্তিক শাসন। ম্যাক্স হ্বেবার যখন কর্তৃপক্ষের প্রকারভেদ করতে গিয়ে আইনী কর্তৃপক্ষের কথা বলেছিলেন তখন তিনি পরিবর্তিত বাস্তবকেই প্রতিফলিত করছিলেন।

অন্যদিকে, কর্তৃপক্ষের যুক্তিভিত্তিক চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা হ্বেবারের সামাজিক প্রগতির চিন্তারই একটি অংশ। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সমাজ প্রগতির পথে অগ্রসর হয়—হ্বেবারের এই চিন্তায় প্রগতির সূচক ছিল ক্রমবর্ধমান যুক্তিবাদিতা। পুঁজিবাদী মূল্যবোধ মানুষের মনে অন্ধবিশ্বাসের স্থানে যুক্তিনির্ভর প্রশ্ন করার মানসিকতা সৃষ্টি করে—মানুষ ক্রমেই তার পারিপার্শ্বিককে যুক্তি-বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই করতে শেখে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অন্ধ আনুগত্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকা সাবেকী কর্তৃপক্ষের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায় এবং নতুন ধরনের কর্তৃপক্ষের পক্ষে জনগণের আনুগত্য লাভের একমাত্র ভিত্তি থাকে তার কর্তৃত্বের যুক্তিবাদী চরিত্র। আইনগত ও যুক্তিভিত্তিক কর্তৃপক্ষের ধারণাটি একটি উদাহরণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা যেতে পারে। আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিকেরা রাষ্ট্রীয় কর-আদায়কারী সংস্থাকে স্বেচ্ছায় তাঁদের দেয় কর প্রদান করেন প্রধানত দু'টি কারণে—(এক) কর-আদায়কারী সংস্থা রাষ্ট্রীয় আইনের সৃষ্টি ও আইন-নির্দেশিত পথে কাজ করছেন এবং (দুই) কর সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে রাজস্ব সৃষ্টির একটি অন্যতম পথ।

১৮.৬.১ কর্তৃত্বের আদর্শ বা বিশুদ্ধ প্রকারভেদ :

কর্তৃপক্ষের তিনটি প্রকার অবশ্য হ্বেবারের ভাষায় 'Ideal types', অর্থাৎ আদর্শ বা বিশুদ্ধ প্রকারভেদ যার বাস্তবে সচরাচর উপস্থিতি থাকে না। বাস্তব রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমরা সাধারণত মিশ্র প্রকারগুলিকে দেখতে পাই। ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে, সাবেকী কর্তৃপক্ষ অনেক সময়ই নিজের কর্তৃত্ব রক্ষা করার জন্য সম্মোহনী ক্ষমতা অর্জন ও ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন অথবা তাঁর উপর সম্মোহনী ক্ষমতা সমাজ বা সমাজের কোনও অংশ আরোপ করার চেষ্টা করেছে। রাজার চারিত্রিক গুণাবলী, যেমন শৌর্য্য, প্রজ্ঞা বা প্রজা-বাৎসল্য প্রচারিত হয়েছে জনমানসে তাঁর একটি বিশেষ স্থান সৃষ্টি করার জন্য। গণসম্মোহনী কর্তৃপক্ষ যে প্রয়োজনে আইনী বা প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিকে ব্যবহার করে তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। আধুনিক আইনগত ও যুক্তিভিত্তিক কর্তৃপক্ষও অনেক ক্ষেত্রেই কর্তৃত্ব রক্ষা বা শক্তিশালী করার জন্য সাবেকী প্রথাকে ব্যবহার করে, যার উদাহরণ ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় অসংখ্য খুঁজে পাওয়া যায় যেখানে অলিখিত রীতি- নীতিগুলি ও রাজকীয় জাঁকজমক কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। অপরদিকে, আধুনিক শাসনব্যবস্থাতেও আনুগত্যের প্রয়োজনে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানকে তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী, কর্মপদ্ধতি ও অর্জিত সাফল্যের ভিত্তিতে জনমানসে একটি উচ্চতর স্থান সৃষ্টি করে দেওয়ার চেষ্টা হয়, যেমন ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতীয় রাষ্ট্রের সাহায্যকারী ভূমিকার প্রধান কৃতিত্ব দেওয়া হয় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে 'এশিয়ার মুক্তিসূর্য' বলে অভিহিত করে।

১৮.৬.২ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সম্পর্ক

ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে আমরা একটি সমস্যার সম্মুখীন হই। ক্ষমতার ধারণার মধ্যে সম্ভাব্য শক্তিপ্রয়োগ ও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সম্ভাবনা অন্তর্নিহিত থাকে। ক্ষমতার মাধ্যমে যদি অপরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাহলে যার ক্ষমতা প্রযুক্ত হচ্ছে তার কোনও-না-কোনওভাবে প্রতিরোধ করাই স্বাভাবিক। অপরদিকে কর্তৃত্বের চিন্তার মধ্যে ক্ষমতা ও তার প্রয়োগকে মেনে নেওয়ার ধারণাটি

বর্তমান। তাহলে প্রশ্ন : কর্তৃত্ব যখন বৈধ ক্ষমতা, সেক্ষেত্রে বৈধতা কি প্রতিরোধের সম্ভাবনাকে দূর করে দেয়?

এই তাত্ত্বিক সমস্যার জন্য মূলত দায়ী ভাষা। হ্বেবার কর্তৃত্বের চরিত্র বিশ্লেষণে যে জার্মান শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন (Herrschaft) তার ইংরাজী প্রতিশব্দ দু'টি—কর্তৃত্ব (authority) বা আধিপত্য (dominance)। যদি ওই শব্দটিকে আমরা 'কর্তৃত্বের' অর্থে ব্যবহার করি, যেমন সমাজতাত্ত্বিক ট্যালকট পার্সন্‌স (Talcott Parsons) করেছিলেন, তাহলে এই ধারণাকে গ্রহণ করতে পারি যে কর্তৃপক্ষ হিসাবে শাসকেরা শাসিতের স্বেচ্ছায় দেওয়া বৈধতা অর্জন করে। বিপরীতে শব্দটি যদি আমরা 'আধিপত্যের' অর্থে ব্যবহার করি, তাহলে বিশ্বাস করতে পারি যে, শাসকেরা বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন করে শাসিতের কাছ থেকে বৈধতা আদায় করে। বাস্তবে ক্ষমতার প্রতিভূ হিসাবে শাসকেরা শাসিতের বৈধতার উপর নির্ভর না করে, বা তার জন্য অপেক্ষা না করে, বৈধতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হয়। হ্বেবারও তাই বিশ্বাস করতেন।

১৮.৭ অনুশীলনী

ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১) 'ক্ষমতা' এই ধারণাটির সঙ্গে সমাজে স্তরবিন্যাস কীভাবে যুক্ত?

২) 'আধিপত্য-বশ্যতা'র সম্পর্ক বলতে কী বোঝায়?

৩) সামাজিক শ্রমবিভাগ অধিকার অনধিকারকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে?

৪) 'বৈধ ক্ষমতা' কথাটির অর্থ কী?

৫) পুরুষের সঙ্গে নারীর অধীনতার সম্পর্ক কীভাবে তৈরি হয়?

৬) ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব-র মধ্যে কী পার্থক্য আছে?

৭) সমাজে কোন্ ক্ষমতা বৈধ এবং কোন্‌টি বৈধ নয় তা কীভাবে বিচার করা হয়?

৮) গণসম্মোহনী (charismatic) কর্তৃত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে মন্তব্য করুন।

৯) কর্তৃত্বের যুক্তিভিত্তিক চরিত্র সম্বন্ধে হ্বেবারের বক্তব্য সংক্ষেপে লিখুন।

খ) রচনাত্মক প্রশ্ন :

১) ক্ষমতার উপাদানগুলি উল্লেখ করুন ও প্রত্যেকটির পরিচয় দিন।

২) কোন্ কোন্ ভিত্তিতে ক্ষমতার ঊর্ধ্বতন-নিম্নতন সম্পর্ক নির্ধারিত হয়?

৩) রাজনীতির এলাকায় ক্ষমতার সম্পর্ক কীভাবে কাজ করে বর্ণনা দিন।

৪) বৈধতা বলতে কী বোঝায়? এর উৎসগুলি কী কী?

৫) সাবেকী কর্তৃত্ব সম্বন্ধে একটি বিশদ আলোচনা করুন।

৬) কর্তৃত্বের কোনও আদর্শ প্রতিরূপ হতে পারে কি? এ বিষয়ে উদাহরণসহ বক্তব্য রাখুন।

১৮.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Alan R. Ball : Politics and the Government.

২। David Bethan : The lazitimation of power. (Ch. II)

৩। Dennis Wrong : Power—Its forms, bases and uses. (Ch. I)

৪। Ali Ashraf and L. N. Sharma : Political Sociology.

একক ১৯ □ আমলাতন্ত্র (Bureaucracy)

গঠন

১৯.০ উদ্দেশ্য

১৯.১ প্রস্তাবনা

১৯.২ আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞা

১৯.২.১. আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব, উদ্ভব ও বিকাশ

১৯.২.২. আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

১৯.২.৩. আমলাতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ

১৯.২.৪. আমলাতন্ত্রের কার্যাবলী

১৯.২.৫. আমলাতন্ত্রের ত্রুটি

১৯.২.৬. আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ

১৯.২.৭. আমলাতন্ত্রের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

১৯.৩ ম্যাক্স হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের ধারণা

১৯.৩.১. ম্যাক্স হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের প্রকৃতি

১৯.৩.২. ম্যাক্স হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

১৯.৩.৩. হ্বেবারের আমলাতন্ত্র তত্ত্বের ত্রুটি

১৯.৪ কার্ল মার্ক্স-এর আমলাতন্ত্রের ধারণা

১৯.৫ সারাংশ

১৯.৬ অনুশীলনী

১৮.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১৯.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন—

- আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য
- আমলাতন্ত্রের কার্যাবলী, ত্রুটি ও নিয়ন্ত্রণ
- ম্যাক্স হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের ধারণা

- হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের ধারণার ত্রুটিগুলি কী কী
- কার্ল মার্ক্স-এর আমলাতন্ত্রের ধারণার মূল বক্তব্য

১৯.১ প্রস্তাবনা

এই এককে আলোচনা করা হয়েছে আমলাতন্ত্র। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্থায়ী কর্মচারীদের ভূমিকা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সকল স্থায়ী কর্মচারীরা আমলা হিসেবে পরিচিত। এদের দ্বারা পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা "আমলাতন্ত্র" (Bureaucracy) নামে সুপরিচিত। এই এককের প্রথম অংশে আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞা, উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে আলোচনা করা হয়েছে আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন কার্যাবলী ও ত্রুটি। কারণ আমলাতন্ত্র একটি বিশ্বব্যাপী ঘটনা। শুধু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই নয়, পৃথিবীর সকল শ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রে এদের অস্তিত্ব ও কার্যাবলী পরিলক্ষণীয়। এককের তৃতীয় অংশে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ম্যাক্স হ্বেবারের আমলাতন্ত্র তত্ত্ব। ম্যাক্স হ্বেবারের তত্ত্ব আলোচনা না করলে আমলাতন্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পরিশেষে ম্যাক্স হ্বেবারের আমলাতন্ত্র সম্পর্কে ধারণার সমকালীন কার্ল মার্ক্সের ধারণার কিছু আলোকপাত করা হল।

১৯.২ আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞা

ব্যুৎপত্তিগত দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে "ব্যুরোক্র্যাসী" (Bureaucracy) শব্দের উৎপত্তি ফরাসী শব্দ 'ব্যুরো' (Bureau) এবং গ্রিক শব্দ "ক্র্যাটিন" (Kratin) থেকে। ফরাসী ভাষায় "Bureau" শব্দের অর্থ হল লেখার টেবিল বা ডেস্ক (Writing table or Deask), গ্রিকভাষায় "Kratin" শব্দের অর্থ হল শাসন (Government)। সুতরাং, ফরাসী শব্দ 'ব্যুরো' এবং গ্রিক শব্দ 'ক্র্যাটিন' একত্র করে ইংরাজীতে "Bureaucracy" শব্দের উদ্ভব ঘটেছে। শব্দগত অর্থে ব্যুরোক্র্যাসী শব্দের অর্থ হল "টেবিল থেকে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা"। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আমলারা সরকারের অ-রাজনৈতিক অংশ হিসেবে চিহ্নিত। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্য অনেকাংশে স্থায়ী কর্মচারীদের কর্মকুশলতার উপর নির্ভর করে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে আমলাদের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতার বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই।

আমলাতন্ত্রের কোনও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। রাষ্ট্র ও বিজ্ঞানীরা আমলাতন্ত্র শব্দটিকে নিন্দাসূচক এবং মূল্য-নিরপেক্ষ উভয় অর্থেই ব্যবহার করে থাকেন। নিন্দাসূচক অর্থে আমলাতন্ত্র শব্দটি দ্বারা সরকারি প্রশাসন ও সরকারি কর্মীবৃন্দের দীর্ঘসূত্রতা, নিরর্থক নিয়মকানুন ও ফাইলপত্রের মধ্যে আবদ্ধতা ও সৌজন্যবোধের অভাব ইত্যাদি বোঝায়।

'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' গ্রন্থে আমলাতন্ত্রকে নিন্দাসূচক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, আমলাতন্ত্র বলতে বিভিন্ন দপ্তর বা ব্যুরোর হস্তে সরকারি ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত রাখা এবং স্থায়ী সরকারি কর্মীবৃন্দের অত্যধিক ও অনাবশ্যক হস্তক্ষেপকে বোঝানো হয়েছে। The term "signifies the concentration of

administrative power in bureaus or departments, and the undue interference by officials in matters outside the scope of state interference".

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গার্নার ও অস্টিন আমলাতন্ত্রকে মূল্য-নিরপেক্ষ অর্থেও ব্যবহার করে থাকেন। সাধারণত দক্ষ, অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ এবং স্থায়ী সরকারী কর্মচারীবৃন্দ কর্তৃক পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকেই আমলাতন্ত্র বলা হয়। অভিজ্ঞতা (experience), knowledge (জ্ঞান) এবং দায়িত্বশীলতা (responsibility) সম্বলিত স্থায়ী সরকারী কর্মচারীবৃন্দকে আমলা অ্যাখ্যা দেওয়া হয়।

আবার প্রশাসন বিজ্ঞানীরা ব্যাপক ও সংকীর্ণ অর্থে আমলাতন্ত্রকে ব্যবহার করে থাকেন। 'Willoughby'-এর মতে, ব্যাপক অর্থে আমলাতন্ত্র হল এমন এককর্মীবৃন্দ সংস্থা বা পদ্ধতি যেখানে কর্মীবৃন্দ ব্যুরো, বিভাগ, দপ্তর, শাখা ইত্যাদি নানা স্তরবিন্যাসে গঠিত প্রশাসনিক পদ্ধতি বা ব্যবস্থার দ্বারা বিভাজিত। 'Any personnel system where the employees are classified in a system of administration composed of a hierarchy of sections, divisions, bureaus, departments and the like'. অধ্যাপক গ্ল্যাডেন ও অধ্যাপক ফিফ্নার আমলাতন্ত্রকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেন। অধ্যাপক গ্ল্যাডেন বলেন যে, "আমলাতন্ত্র হল একটি নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা যা বিভিন্ন দপ্তরের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক দ্বারা সংগঠিত। অধ্যাপক ফিফনার-এর মতে, আমলাতন্ত্র হল বিভিন্ন ধাঁচে সাজানো ব্যক্তি ও কর্মসূচীর সুব্যবস্থিত বা রীতিসঙ্গত সংগঠন, যা যৌথ প্রচেষ্টায় অত্যন্ত কার্যকরীভাবে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, আমলাতন্ত্র বলতে বোঝায় একটা সংগঠিত ব্যবস্থা যার দ্বারা সরকারি প্রশাসন পরিচালিত হয়। বর্তমানে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ দুটি ভাবে বিভক্ত—রাজনৈতিক প্রশাসক (Political Executive) এবং অ-রাজনৈতিক প্রশাসক (Non-political Executive) । এই অ-রাজনৈতিক প্রশাসকদের আমলা বলে। অ্যালমন্ড ও পাওয়েল এবং ম্যাক্স হেবার-এর মতো বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নানাভাবে আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক ফাইনার (Finer)-এর মতে, আমলাতন্ত্র বলতে স্থায়ী, অভিজ্ঞ ও বেতনভুক্ত কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়। ম্যাক্স হেবারের (Max Weber) মতে, বিধিবদ্ধ আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্ব বা আধিপত্যই আমলাতন্ত্র।

১৯.২.১ আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব, উদ্ভব ও বিকাশ

আধুনিক শাসনব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল আমলাতন্ত্রের উদ্ভব। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে আমলাতন্ত্র রাজনৈতিক সংস্থা হিসেবে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে। অধ্যাপক বার্কার যথার্থই বলেছিলেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে আইনসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, বিংশ শতাব্দীতে তেমনি প্রশাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। গণতান্ত্রিক অ-গণতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট, অ-কমিউনিস্ট এমনকি ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রগুলিতেও আমলাতন্ত্রের অস্তিত্ব বিরাজমান। আমলাতন্ত্র আজ প্রায় সকল শাসনব্যবস্থার অংশ। লা পালোম্বারা (La Palombara) আমলাতন্ত্রের বিকাশের কতকগুলি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। প্রথম পর্যায় হল ক্যাথলিক গির্জার সম্প্রসারণ। ক্যাথলিক গির্জাগুলি সারা ইউরোপে সম্প্রসারিত হওয়ার দরুন পূর্বতন শাসনব্যবস্থার পদ্ধতিগুলোর পরিবর্তনের

প্রয়োজন দেখা দেয়। দ্বিতীয় পর্যায় হল সামরিক বাহিনীর উন্নতি। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে সামরিক বাহিনীতে উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিদ্যার ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এটা করতে গিয়ে সামরিক বাহিনী দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশাসকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং জন্ম নেয় আমলাতন্ত্র। তৃতীয় পর্যায়ে দেখা যায় যে, জাতীয় রাষ্ট্রের কর্মপরিধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে রাজ্য বা শাসকের পক্ষে কেবল পরামর্শদাতাদের সহায়তায় প্রশাসন পরিচালনায় যথেষ্ট নয়। দক্ষ প্রশাসকের প্রয়োজনও অনুভব করা হয়।

আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধির বা উদ্ভবের বা বিকাশের কতকগুলি কারণ আছে। এই কারণগুলি ম্যাক্স হেবারের মতে, যথাক্রমে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। সামাজিক কারণ হল, ঊনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্র ছিল পুলিশী রাষ্ট্র (Police state)। এই রাষ্ট্রের কার্যাবলী বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা এবং আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাষ্ট্রের কার্যাবলী নেতিবাচক ছিল। কিছু কিছু লেখক, সমাজ সংস্কারক, ধর্মীয় নেতা ও চিন্তাবিদরা নতুন নতুন চিন্তা ও ধারণার জন্ম দিয়ে থাকেন। ফলে সমাজে নানারকম সামাজিক ও রাজনৈতিক জাগরণ সৃষ্টি হয়। জনগণের মনে নানারকম দাবিদাওয়া ও আকাঙ্ক্ষার ধারণা তৈরি হয়। এই দাবিদাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের রাষ্ট্রের কাছে নানারকম অধিকার প্রাপ্তির জন্য আবেদন আসতে থাকে। যে রাষ্ট্রের কার্যাবলী ছিল নেতিবাচক, সেই রাষ্ট্রের কার্যাবলী ইতিবাচকে পরিণত হয়। রাষ্ট্রকে নানারকম সামাজিক সমস্যার সমাধানে লিপ্ত থাকতে হয়। ফলে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধির সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পুলিশী রাষ্ট্র এই শতাব্দীতে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কারণেও আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। সমাজ- কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনগণের মঙ্গলসাধন ও অবস্থার উন্নতিকল্পে নানাবিধ সমাজকল্যাণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করে। ফলে সরকারকে নীতি গ্রহণ ও কার্য রূপায়ণ করার জন্য আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার নানাবিধ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর দ্রুত রূপায়ণে আমলাতন্ত্রের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। আমলাদের কর্মনিপুণতা, দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তার উপর সরকারের কার্যাবলীর বাস্তবায়নের কাজ সহজ হয় এবং সে কারণে আমলাতন্ত্রে গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে ধীরে ধীরে।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের কর্মপরিধি বিস্তৃতি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সংসদের কার্যাবলী অত্যন্ত ব্যাপক হয়ে পড়েছে। সরকার নানাবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জনকল্যাণকামী কর্মসূচী গ্রহণ করায়, বিশেষ করে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা, দুর্দশাগত ব্যক্তিদের সাহায্য, বেকার সমস্যা, শিল্পায়ন, মজুরী কাঠামো, বৈদেশিক নীতি, আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে সরকার নানারকমের আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়। আইন প্রণয়ন কিংবা সরকারি নীতি নির্ধারণের জন্য যে পরিমাণ কলাকৌশলগত জ্ঞান ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন তা আইনসভার সদস্যদের অথবা সকল মন্ত্রীদের থাকে না। তাই তাঁরা সরকারের সাধারণ নীতি কিংবা আইনের মৌলনীতিগুলি নির্ধারণ করে সেগুলিকে পরিপূর্ণতা দানের জন্য স্থায়ী, অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ আমলাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। ফলে আমলাদের গুরুত্ব অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে প্রশাসনিক কাজে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখেন সরকারের স্থায়ী কর্মচারীরাই। আমলাদের উৎসাহ, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার উপর সরকারি পরিকল্পনাসমূহের সাফল্য নির্ভর করে। বিশেষ করে,

বিকাশশীল দেশগুলিতে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা অতিশয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতায় রাজনৈতিক কাঠামোর স্থায়িত্ব রক্ষার গুরুদায়িত্ব পালন করে আমলাতন্ত্র।

১৯.২.২ আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

আমলাতন্ত্র গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কাঠামোগত দিক থেকে আমলাতন্ত্র হল মানব সম্পর্কের সংগঠিত রূপ। শ্রমবিভাগ ও ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস এই রূপকে প্রতিফলিত করে। আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নানাভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন।

ম্যাক্স হেবারের মতে, আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি হল (১) নির্দিষ্ট ও স্থায়ী অধিক্ষেত্রের অবস্থিতি; (২) কর্তৃত্বের ধাপ ও ক্রমপর্যায়ী নীতি; (৩) কার্য ও দায়িত্বের রীতিসম্মত নিয়ম ও পদ্ধতির অনুসরণ; (৪) স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুন; (৫) আধুনিক পরিচালন নীতি ও দক্ষ প্রশিক্ষণ প্রণালী; (৬) লিখিত আইনকানুন ও দলিল দ্বারা কর্মসম্পাদনের নীতি এবং (৭) মেধা, অভিজ্ঞতা, কর্তব্য ও বিশ্বাসযোগ্যতার দ্বারা পরিচালনা।

অ্যালান বলের মতে, পেশাদারি প্রশাসক বা আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি হল স্থায়িত্ব, দক্ষতা দায়িত্বের বিশেষীকরণ, প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, গোষ্ঠীস্বাতন্ত্র্য ও ঐক্যবোধ, ক্রমস্তর-বিন্যস্ত সংগঠন। উপরোক্ত দুই বিখ্যাত লেখকের বক্তব্য পর্যালোচনা করলে আমলাতন্ত্রের কতকগুলি সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। আমলাতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল স্থায়িত্ব। নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা পর্যন্ত তাঁরা নিজেদের পদে আসীন থাকেন। তাঁদের কার্যকাল ও স্থায়িত্ব রাজনৈতিক ঘটনাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হয় না। দুর্নীতি, অযোগ্যতা বা চাকরির শর্তাবলী ভঙ্গের প্রমাণিত অভিযোগ ছাড়া তাঁদের পদচ্যুত করা যায় না।

নিরপেক্ষতা আমলাতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করতে পারে, কিন্তু রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে সরকারি নীতিসমূহকে বাস্তবায়িত করা আমলাদের কর্তব্য। Neutrality is the hall mark of bureaucracy. সরকারি কাজে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সু- প্রশাসনের পক্ষে ক্ষতিকর। সরকারি আমলারা হল রাজকীয় ভৃত্য, ফলে যে সরকারই ক্ষমতাসীন হোক না কেন, নিরপেক্ষভাবে সরকারি কাজ পরিচালনা করতে বাধ্য। ইভা এটজিয়নি হালেভি - (Eva Etgioni Halevy) Bureaucracy and Democracy গ্রন্থে বলেছেন, "Civil servants usually have their own views on matters of policy but are not free to indulge in their partisan sympathies freely. Their allegience to one party or another is subordinated to the requirements of their profession". সুতরাং নিরপেক্ষতার ধারণা অনুসারে আমলাতন্ত্র বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণের পটভূমিতে নিরপেক্ষতার নীতিকে স্বীকার এবং প্রয়োগ করে ও সরকারের স্থায়ী হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে।

আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষতা বিষয়ে মার্ক্সবাদীরা অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, আমলারা কখনই রাজনীতি নিরপেক্ষ হতে পারেন না। নিরপেক্ষতা তাঁদের একটা মুখোশ মাত্র। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় কিংবা যে কোনও শোষণমূলক ব্যবস্থায় আমলারা কায়েমী স্বার্থের রক্ষাকর্তা হিসেবে কাজ করে।

নমনীয়তা (flexibility) আমলাদের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সরকারি কর্মচারীদের মানসিকতাকে নমনীয় রাখতে হয়। কোনও বিশেষ নীতি বা তত্ত্বের প্রতি আনুগত্য আমলাদের ক্ষেত্রে কাম্য নয়। একদিকে তাঁদের দলনিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হয়, আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষমতাসীন দলের নানারকম কর্মপরিকল্পনার সাথে নিজেদের যুক্ত করতে হয়।

কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং জনকল্যাণ সাধনের আদর্শে ব্রতী বা অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া আমলাদের অপর একটি বৈশিষ্ট্য। বিপুল পরিমাণ প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পাদন ও বিভিন্ন দপ্তরের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রয়োজন নিয়মানুবর্তিতা।

অজ্ঞাতনামা (anonymity) এবং দায়বদ্ধহীনতা (accountability) আমলাতন্ত্রে অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অজ্ঞাতনামা থেকে আমলাদের কাজ করতে হয় বলে সম্পাদিত কাজের জন্য তাঁদের জনগণ কিংবা আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতে হয় না।

আমলাদের মধ্যে স্তরভেদের জন্য আমলাতান্ত্রিক কাঠামো পিরামিডের মতো। কোন্ শ্রেণীর আমলা কী কী কাজ করবেন তা সুনির্দিষ্ট থাকে। নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই আমলাদের নির্দিষ্ট কাজ করতে হয়। তাই আমলাতন্ত্রের সঙ্গে স্তর ব্যবস্থা (rank system) ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে অধ্যাপক কার্ল ফ্রেডরিকের (Carl Fredrich) নাম উল্লেখযোগ্য। কার্ল ফ্রেডরিক আমলাতন্ত্র বিচার-বিশ্লেষণ করে ছয়টি প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেন। সেগুলি হল (১) কার্যাবলীর পৃথকীকরণ; (২) কার্যালয়ের বা দপ্তরের জন্য গুণাবলী বা যোগ্যতাবলী; (৩) স্তরবিন্যস্ত সংগঠন এবং শৃঙ্খলা; (৪) উদ্দেশ্যমূলক পদ্ধতি; (৫) আইনের যথার্থতা, সামঞ্জস্যতা, স্থিরতা এবং ধারাবাহিকতা এবং (৬) নিয়মকানুনের প্রতি অনুরক্তি।

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের ভিত্তিতে আমলাদের সরকারি পদে নিযুক্ত করা হয়। ফলে মেধা (Merit)-র ভিত্তিতে নিয়োগ, উন্নতি ইত্যাদি নির্ধারিত হয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার পরিবর্তে শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিশেষ প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আমলাদের বেতন, ভাতা ও চাকরির অন্যান্য শর্তাদি চুক্তির মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়।

১৯.২.৩ আমলাতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ

আমলাতন্ত্র নানারকম হয়ে থাকে। আমরা আগেই জেনেছি যে, আমলাতন্ত্র পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের শাসনব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ধনতন্ত্র-ভিত্তিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র একটু অন্য ধরনের। মার্কিন প্রশাসন দ্বিধাবিভক্ত এবং ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গ্রহণ করার দরুন আইন বিভাগ ও শাসনবিভাগ সম্পূর্ণ আলাদা। আইন বিভাগ নিজের কর্মসূচী তৈরি করে, তার সঙ্গে শাসনবিভাগের কোনও সম্পর্ক নেই। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমলাতন্ত্র ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত নয়। অপরদিকে ফরাসী ও ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র হল ঐক্যবদ্ধ আমলাতন্ত্র। দুটি দেশের শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ার দরুন আমলাতন্ত্রটি একটি সূত্রে বাঁধা।

মার্লি ফেইনসড (M. Fainsod) রাজনীতিক সংস্থাসমূহের আমলাতন্ত্রের সম্পর্কের ভিত্তিতে আমলাতন্ত্রের একটি শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। তিনি আমলাতন্ত্রকে মূলত পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন—(১) প্রতিনিধিমূলক আমলাতন্ত্র (Representative bureaucracies); (২) দল-রাষ্ট্র আমলাতন্ত্র (Party-state bureaucracies); (৩) সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র (Military dominated bureaucracies); (৪) শাসক-নিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র (Ruler dominated bureaucracies); (৫) শাসক আমলাতন্ত্র (Ruling bureaucracies)। প্রতিনিধিমূলক আমলাতন্ত্রের উদাহরণ হল ভারতবর্ষ। দ্বিতীয় ধরনের আমলাতন্ত্রের তদানীন্তন সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনে সন্ধান পাওয়া যায়। সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্রের অস্তিত্ব পাকিস্তান, চিলি ও ইন্দোনেশিয়ার সামরিক শাসনে খুঁজে পাওয়া যায়। শাসক-নিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র দেখতে পাওয়া যায় একনায়কতন্ত্রে। সাদ্দাম হোসেন-এর নেতৃত্বে ইরাক-সহ অন্যান্য দেশগুলিতে এই ধরনের আমলাতন্ত্র দেখতে পাওয়া যায়। পরিশেষে, শাসক আমলাতন্ত্রের অস্তিত্ব ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায়। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে এইরূপ আমলাতন্ত্রের অস্তিত্ব বিরাজমান ছিল।

সাম্প্রতিকালে মরসটিন মার্কসের আমলাতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তিনি আমলাতন্ত্রকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, যেমন—(১) **অভিভাবক আমলাতন্ত্র (Guardian bureaucracy) :** অভিভাবক আমলাতন্ত্রের ধারণাটি মার্কস প্লেটোর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি রিপাবলিক'-এ বর্ণিত অভিভাবক শ্রেণীর সূত্র থেকে গ্রহণ করেছেন। মার্কস এই শ্রেণীর আমলাতন্ত্রের দু'টি উদাহরণ দিয়েছেন।

প্রথমটি হল, প্রাচীন চীনের প্রশাসনিক কর্মচারীবৃন্দ যারা কনফুসিয়াসের শিক্ষার প্রভাবাধীনে কাজ করত। দ্বিতীয়ত হল ১৬৪০ এবং ১৭৪০ সালের মধ্যবর্তীকালের প্রুশিয়ার জনপালন কৃত্যক। (২) **জাতি বা বর্ণগত আমলাতন্ত্র (Caste bureaucracy) :** মার্কসের মতে, এই আমলাতন্ত্রটি সম্পূর্ণভাবে শ্রেণীভিত্তিক ছিল। উদাহরণস্বরূপ, প্রাচীন ভারতে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রাই সরকারি উচ্চপদে নিযুক্ত হতে পারতেন। ব্রিটিশ শাসকরা পরাধীন ভারতবর্ষে জনপালন কৃত্যকে এই ধরনের শ্রেণীচরিত্র চালু করে গিয়েছিলেন। (৩) **আনুকূল্য বা পৃষ্ঠপোষকতামূলক আমলাতন্ত্র (Patronage bureaucracy) :** এটি আবার অন্য নামেও পরিচিত যথা রাজনৈতিক পারিতোষিক ব্যবস্থা (The spoils system)। এই শ্রেণীর আমলাতন্ত্র বলতে বোঝায়, যেখানে কোনও সরকারি নিয়োগ ব্যক্তিগত আনুকূল্যে বা পছন্দে অথবা রাজনৈতিক পুরস্কার হিসাবে প্রাপ্ত হয়। এই শ্রেণীর আমলাতন্ত্রের পীঠস্থান হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং (৪) **যোগ্যতাভিত্তিক আমলাতন্ত্র (Merit Bureaucracy) :** যোগ্যতামূলক আমলাতন্ত্র বলতে সেই ব্যবস্থা বোঝায় যেখানে কর্মীবৃন্দ মেধা বা নির্দিষ্ট যোগ্যতার সাহায্যে নিযুক্ত হবেন। প্রতিযোগিতামূলক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষাই হবে যোগ্যতা বিচারের মাপকাঠি। পৃষ্ঠপোষকতা বা আনুগত্যকে আমল দেওয়া হয় না। ১৮৮৩ সালে সংস্কার আন্দোলনের পরে এই আমলাতন্ত্রের উৎপত্তি এবং বর্তমানকালে পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যদেশেই এই যোগ্যতাভিত্তিক আমলাতন্ত্র ব্যবস্থাটি প্রচলিত আছে।

১৯.২.৪ আমলাতন্ত্রের কার্যাবলী

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকারের কার্যের পরিধি বিস্তার লাভ করার সাথে সাথে আমলাতন্ত্রের কার্যাবলী বৃদ্ধি পায়। অ্যালেন বলের মতে, তেমন কোনও সীমারেখা নেই। আধুনিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনের

জন্য সরকারকে আমলাতন্ত্রের উপর বেশি করে নির্ভর করতে হচ্ছে। সম্ভবত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্রমবর্ধমান দাবি থেকেই সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশাসক ও কর্মচারী নিয়োগ এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়।

ম্যাক্স হেবার-এর মতে, আমলাতন্ত্র তিনটি কাজ করে থাকে—অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক। অ্যালমন্ড ও পাওয়েল আমলাতন্ত্রের চারটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা বলেছেন। প্রথমত, আইন বাস্তবায়নের কাজে আমলাতন্ত্র প্রায় সমস্ত দায়িত্ব পালন করে। দ্বিতীয়ত, আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে আমলাতন্ত্র। তৃতীয়ত, স্বার্থের গ্রন্থীকরণ ও সমন্বয়েও আমলাতন্ত্র বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। চতুর্থত, আমলাতন্ত্র যোগাযোগের সহায়ক বা মাধ্যম হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অ্যালন বল আমলাতন্ত্রের ছটি প্রধান কাজের কথা উল্লেখ করেছেন—(১) নীতি নির্ধারণ; (২) নীতি বলবৎকরণ; (৩) স্বার্থগোষ্ঠীর সঙ্গে দর কষাকষি; (৪) স্থায়িত্বের শক্তি হিসেবে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা; (৫) দলের এবং সরকারি নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং (৬) আভ্যন্তরীণ কাজকর্ম পরিচালনা।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমলাদের কার্যাবলী হল বহুমুখী। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রশাসনিক কাঠামো গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দলীয় প্রাধান্য সর্বব্যাপী হওয়ার দরুন আমলাতন্ত্রের কার্যাবলী অনেক সীমিত।

১৯.২.৫ আমলাতন্ত্রের ত্রুটি ও নিয়ন্ত্রণ

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমলাতন্ত্রের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলেছে। ফলে, দিমক, রামস্যে ম্যুয়র, হিউয়াট জোনস্ প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আমলাতন্ত্রকে নানাভাবে সমালোচনা করেন। এই সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা প্রায় সকলেই একমত যে, আমলারা সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকার দরুন নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং নিজস্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহী থাকে। জনগণের অধিকারগুলি তাদের হস্তে সুরক্ষিত থাকে না। এই প্রসঙ্গে দিমক মন্তব্য করেন যে, "A system of Government the control of which is so completely in the hands of the officials that their power jeopardizes the liberties of the ordinary citezens".

লর্ড হিউয়ার্ট (Lord Hewart) তাঁর New Despotism গ্রন্থে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা অধিকার রক্ষা করতে পারে না কারণ আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল—(ক) প্রশাসকরাই প্রশাসন পরিচালনা করবে, (খ) কেবলমাত্র যোগ্য ব্যক্তিরাই প্রশাসন পরিচালনা করবে, (গ) একমাত্র আমলারাই হল প্রশাসনে যোগ্য ব্যক্তি এবং (ঘ) আমলারা যেমন মনে করবেন সেইভাবে শাসন পরিচালনা করেন।

লর্ড হিউয়ার্ট-এর পর আমলাতন্ত্রের অন্যতম সমালোচক হলেন রামসে ম্যুয়র (Ramsay Muir)। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ How Britain is Governed-এ আমলাতন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি মনে

করেন যে, সরকারি ব্যবস্থায় কি প্রশাসনে কি আইন প্রণয়নে, কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে—সর্বত্রই আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বিশাল ও শক্তিশালী। গণতন্ত্রের আবরণে ছদ্মবেশে যে আমলাতন্ত্রের বৃদ্ধি ও উন্নতি ঘটেছে, সেই একদিন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের দানবের মতো সৃষ্টিকর্তাকে গ্রাস করে সরকারি ব্যবস্থায় নিজেকে অধিকতর শক্তিশালী ও প্রধান উপাদানে পরিণত করছে। যদিও আইনের চোখে আমলাতন্ত্র কদাচিৎ কোন, আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেছে।

উক্ত সমালোচকদের সমালোচনা থেকে আমরা আমলাতন্ত্রের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে জানতে পারি। অধ্যাপক রবসন বলেন যে, 'Bureaucracy is liable to suffer from certain persistent maladies'। অধ্যাপক রবসনের মতো হ্যারল্ড ল্যাস্কি, স্ট্রম (E. Strama) এবং এফ. এইচ. হেওয়ার্ড ও আমলাতন্ত্রের ব্যাধিগুলির উল্লেখ করেছেন। ল্যাস্কির মতে, আমলাতন্ত্র এক অনমনীয়, যান্ত্রিক, কাষ্ঠপ্রায়, অমানবিক, অনুষ্ঠান-সর্বস্ব ও প্রাণহীন জটিল দৃষ্টিভঙ্গি। "Bureaucracy is identified with a rigid, mechanical, wooden, inhuman, formal and soulless approach."

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের আলোচনা থেকে আমরা আমলাতন্ত্রের নানা ব্যাধিগুলো জানতে পারি। ব্যাধিগুলি যথাক্রমে—(ক) **উদাসীনতা** : অনুত্তরদায়ী (unresponsiveness) আমলারা প্রশাসনকে নিজেদের ইচ্ছানুসারে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়। সমাজের অন্যান্য অংশ থেকে তাঁরা নিজেদের স্বতন্ত্র বলে মনে করেন এবং তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ এলিট চেতনার সৃষ্টি হয়, নিজেদের বৈষয়িক উন্নতি ও মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারেই আত্মনিয়োগ করে, তার ফলে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হয়। (খ) **ঐতিহ্যপ্রিয়তা ও রক্ষণশীলতা** : আমলাতন্ত্রকে রক্ষণশীলতার ধারক ও বাহক হিসেবে সমালোচনা করা হয়। আমলাদের মধ্যে প্রথা ও ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়। প্রচলিত রীতি-নীতি ও পন্থা-পদ্ধতির প্রতি আমলাদের নিষ্ঠা লক্ষণীয়। এই পরিবর্তন-বিমুখ মনোভাব আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর একটি বড় ত্রুটি। বারট্রান্ড রাসেল (Bertrand Russell) তাই বলেছেন যে, আমলাদের মধ্যে একটি নেতিবাচক মানসিকতা কাজ করে। (গ) **অনুষ্ঠানসর্বস্বতা ও দীর্ঘসূত্রতার মনোভাব** : আমলারা রুটিনমাফিক কাজ করে। রুটিনের বাইরে কাজ করে কোনও সমস্যার সমাধান করা আমলাদের প্রকৃতি বিরোধী। যান্ত্রিক মনোভাব আমলাদের কাজকর্মকে নিষ্প্রাণ করে তোলে। আমলাদের দীর্ঘসূত্রতার মনোভাব। প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। 'লাল ফিতের বাঁধন' থেকে কাগজপত্রের মুক্তি পেতে বহু সময় লাগে। (ঘ) **ক্ষমতাবৃদ্ধি ও ক্ষমতা লাভ** : Bureaucrats have an inherent lust for power. সরকারি প্রশাসনে আমলাদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের জন্য তারা নিজেদের রাজনৈতিক প্রশাসকদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গণ্য করে। আমলাতন্ত্র ক্ষমতার বিস্তার গণতন্ত্রকে আমলাতন্ত্রে পরিণত করে। অ্যালান বলের মতে, উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সরকার ক্রমশ মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির শাসনে পর্যবসিত হতে পারে। (ঙ) **বিভাগীয় মনোভাব (departmentalism)** : স্ট্রস (strauss)-এর মতে, বিভাগীয় মনোভাব আমলাতন্ত্রের অন্যতম প্রধান ত্রুটি। বিভাগীয় মনোভাব ও সাময়িকভাবে সরকারের নীতি ও লক্ষ্য বিবেচনায় অক্ষমতা আমলাতন্ত্রের কাজকে দেশের মূল কর্মধারার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ করে তোলে। (চ) **আত্মবিচারস্থায়ীকরণ (self-pirpetuating)** : আমলাতন্ত্র নিজেকে চিরস্থায়ী করার জন্য প্রশাসনিক বিভাগে অত্যধিক পরিমাণ আমলা নিয়োগ করে, ফলে আমলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই প্রসঙ্গে পারকিন্সনের নীতিটি উল্লেখযোগ্য। এই নীতি অনুসারে প্রশাসনিক কর্মীবৃন্দ একে অপরের

জন্য কাজ করে থাকে। সুতরাং, বিকাশশীল দেশে এই সকল ব্যাধিসহ আমলাতন্ত্র একটা বিশেষ সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে। আপন ক্ষমতার বৃদ্ধি ও বিস্তারের জন্য ক্ষমতালিপ্সু আমলারা জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়নমূলক কাজে অনাবশ্যক বাধার সৃষ্টি করেন।

১৯.২.৬ আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ

আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা স্মরণ রেখে প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই এর নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করা হয়। সাধারণত উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের কথা বলা হয়। রবসন মনে করেন, আমলাতন্ত্র যাতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশের সাহায্য করে, সেই জন্যই এর নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। জনগণের অধিকার রক্ষা, প্রশাসনিক উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্যও আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ দরকার। ১৯৫০ সালে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সংস্থা প্রশাসনকে জনমুখী করে তোলা, জনগণের অধীনে আনা এবং জনগণের প্রতি অনুগত করে তোলার প্রয়োজনে আমলাতন্ত্রের সংস্কার ও নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করেছিল। চার্লস হাইনেম্যান, রেমন্ড অ্যাঁরো, জন প্রাইস সকলেই প্রশাসনে গণতান্ত্রিকতার প্রয়োজনেই আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন। রবসনের ভাষায়, আমলাতন্ত্র আগুনের মতো, অনিয়ন্ত্রিত হলে সব কিছু ধ্বংস করে দেবে, কিন্তু অনুগত হলে এর মতো প্রয়োজনীয় আর কিছু নেই।

অ্যালান বল বলেছেন—The need for controlling bureaucratic discretion and power is apparent in every political system. তাঁর মতে, আমলাতন্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে জনকল্যাণের ধারণাকে গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে। এই ধারণার অভাবই বিকাশশীল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করে। তিনি মনে করেন, আমলাতন্ত্রকে তিনটি উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় : আভ্যন্তরীণ, রাজনৈতিক ও আইনগত।

আমলাতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ আমলাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং সামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। প্রশাসনের অভ্যন্তরে কতকগুলো প্রথা বা পদ্ধতি থাকে যার দ্বারা আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অর্থাৎ, বিভাগীয় প্রশাসন ব্যবস্থা এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যার ফলে আমলারা ইচ্ছামতো বা বেপরোয়াভাবে কাজ করতে পারে না। আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে থাকে আভ্যন্তরীণ সমন্বয়সাধন, স্ব-শৃঙ্খলা ও সোপান কাঠামো ও (hierachy)-কে স্বীকৃতি দান।

সমস্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীদের সংখ্যা, পদোন্নতি, বেতন, ভাতা ইত্যাদি অর্থ বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ভারত, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের মতো উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়। তাছাড়াও স্বীয় কর্মে অবহেলা, জনস্বার্থবিরোধী কাজ প্রভৃতির জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

আমলাতন্ত্রকে রাজনৈতিক দিক থেকেও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আমলাদের উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় রাজনীতিক স্তরে এবং রাজনীতিক সংস্থা বা সংগঠনগুলির মাধ্যমে যে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকে। রাজনৈতিক সংগঠনগুলি হল রাজনৈতিক দল, আইনসভা, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ইত্যাদি। আমলাদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা আইন বিভাগের হাতে ন্যস্ত থাকে। তবে আইনসভার হাতে আমলাদের

নিয়োগ অনুযোজনের ক্ষমতা থাকলে নিয়ন্ত্রণ কার্য সহজ হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস আমলাদের নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। কিন্তু ভারত ও ব্রিটেনে আইন বিভাগ আমলাদের নিয়োগ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করতে পারলেও নিয়োগ বা নিয়োগের অনুমোদনের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। তবুও আইনবিভাগ সাধারণত সিলেক্ট কমিটি (Select Committee), সরকারি হিসাব রক্ষক কমিটি (Public Account Committee) প্রভৃতির মাধ্যমে আমলাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে তাদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

আইনগত নিয়ন্ত্রণ হল আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার অন্যতম উপায়। কর্তব্যে অবহেলা, ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতির বিচার সাধারণ আইনের সাহায্যে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের মাধ্যমে সম্পাদিত হলে আমলাদের সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে সাধারণ আদালতের মাধ্যমে রাষ্ট্রকৃত্যকদের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। আদালত প্রশাসনিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু প্রশাসনিক অযোগ্যতাকে প্রতিরোধ করার কোনও ক্ষমতা আদালতের নেই। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উচ্চপদস্থ আমলাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি বিচারের জন্য প্রশাসনিক আদালত, সংসদীয় কমিশনার, অম্বুডসম্যান (Ombudsman) ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। এঁদের ক্ষমতা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। এ বিষয়ে ভারতীয় সংগঠন হল লোকপাল (Lok Pal) ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমলাদের দুর্নীতিপরায়ণ হবার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কেননা, তাঁরা রাষ্ট্রের প্রাধান্য বিস্তারকারী গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ করে। অপরদিকে, সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে সমাজ গঠনে এবং জনগণের স্বার্থসাধনে আমলাতন্ত্রকে দায়বদ্ধ থাকতে হয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণই তাদের নিয়ন্ত্রণ করে।

১৯.২.৭ আমলাতন্ত্রে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

বর্তমান সমাজকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভর করে উচ্চপদস্থ আমলাদের নিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর। আবার এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষণশীল হবে, না প্রগতিশীল হবে, তা নির্ভর করে মূলত কোন্ আর্থ-সামাজিক কাঠামো থেকে এঁরা আসছেন তার উপর। এই কারণে অ্যালান বল আমলাদের সামাজিক পটভূমি পর্যালোচনার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি তিনটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা ও মর্যাদার ক্ষেত্রে ভারসাম্যের নির্দেশক হিসেবে সমাজের বাছাই করা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা এলিট (Elites) এবং প্রশাসক এলিট (administrator elites)-দের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা জরুরি। দ্বিতীয়ত, উচ্চপদস্থ আমলাদের গঠন-বিন্যাস সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শক্তিসমূহকে প্রতিফলিত করে। তৃতীয়ত, উচ্চপদস্থ প্রশাসকদের মূল্যবোধ ও মনোভাবের অস্তিত্ব সমাজের প্রশাসন ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে। পদস্থ আমলাদের অধিকাংশই সমাজের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই আসেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে এই শ্রেণীগত মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে।

এই প্রসঙ্গে আমলাদের নিয়োগ-পদ্ধতির বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে অধিকাংশ দেশেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই আমলাদের নিয়োগ করা হয়। ফ্রান্সে উচ্চপদস্থ আমলাদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে 'The French National School of administration'-এর উপর। মোট পদের দুই-তৃতীয়াংশ পূরণের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এই

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসার জন্য প্রার্থীদের অন্তত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ডিগ্রি (Second University Degree)-র পর্যায়ভুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা দরকার। নিযুক্ত প্রার্থীদের ১৮ মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়।

গ্রেট ব্রিটেনেও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে অ-রাজনৈতিক প্রশাসকদের নিযুক্ত করা হয়। এই নিয়োগ ব্যবস্থার জন্য সংস্থাটি হল 'Civil Service Commission'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও একই ব্যবস্থার মাধ্যমে অ-রাজনৈতিক সরকারি কর্মচারী বা রাষ্ট্রকৃত্যকদের নিয়োগ করা হয়। এখানে প্রশাসনিক কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা (merit)-র উপর বেশি জোর দেওয়া হয় এবং প্রশাসনিক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সের কোনও সীমা উল্লেখ করা হয়নি। ভারতবর্ষে অ-রাজনৈতিক কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্র স্তরে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন (Union Public Service Commission) এবং রাজ্য স্তরে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন (Public Service Commission) আছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা, লিখিত ও সাক্ষাৎকারমূলক মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রার্থীদের বাছাই করা এবং নিয়োগ করা হয়। সফল প্রার্থীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়। অ-রাজনৈতিক সরকারি কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

১৯.৩ ম্যাক্স হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের ধারণা

ম্যাক্স হ্বেবারকে আমলাতন্ত্রের ধারণার পথিকৃৎ বলা যায়। তাঁর আলোচনায় সর্বপ্রথম আমলাতন্ত্র সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর চিন্তাধারা ও মতামত পরবর্তীকালের লেখকদের আলোচনায় প্রভাব ফেলে থাকে। যদিও আমলাতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারণা সমাজবিজ্ঞান ভিত্তিক, তথাপিও তাঁর ধারণা রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়। ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের তত্ত্বটি বৈজ্ঞানিক পরিচালন তত্ত্বের সমসাময়িক বলা যেতে পারে। পুঁজিবাদ, শিল্পবিপ্লব এবং সাংগঠনিক কাঠামোর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে ম্যাক্স হ্বেবারের আমলাতন্ত্র-তত্ত্ব বিশেষ সহায়ক। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর তত্ত্বটি তাঁরই ইতিহাস ও সামাজিক তত্ত্বের ব্যাপ্ত জ্ঞানের অন্তর্নিহিত অংশ।

১৯.৩.১ ম্যাক্স হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের প্রকৃতি

ম্যাক্স হ্বেবার আমলাতন্ত্রকে ক্ষমতা (power) ও আধিপত্যের (dominace) বিশেষ রূপ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, আধুনিক কালে আইন-নির্ভর ও যুক্তিসিদ্ধ কর্তৃত্বের প্রাধান্য আমলাতন্ত্রের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। তিনি কর্তৃত্ব ও আধিপত্যর গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য জার্মান শব্দ 'Herrchaft' ব্যবহার করেন। পরবর্তী কালের সমাজবিজ্ঞানীরা এই Herrchaft শব্দটিকে নানাভাবে তর্জমা করেন। কেউ বলেন 'কর্তৃত্ব' আবার কেউ 'আধিপত্য' শব্দটি ব্যবহার করেন। সাধারণ অর্থে Herrchaft কথাটির অর্থ হল এমন এক পরিবেশ যেখানে Herr মানে প্রভু অন্যান্যদের আনুগত্য আদায় করে থাকেন। রেমন্ড অ্যারোঁ Herrchaft-এর অর্থে বলেন যে, প্রভুর নিম্নস্তরের লোকেদের আনুগত্য আদায় করার দক্ষতা।

ম্যাক্স হ্বেবারের মতে আধিপত্য তিন ধরনের : (১) সনাতন বা চিরাচরিত আধিপত্য (Traditional authority); (২) বিশেষ গুণাবলীসম্পন্ন হওয়ায় আধিপত্য বিস্তার (Charismatic authority); (৩) আইনগত ও বাস্তবসম্মতভাবে আধিপত্য অর্জন করা (Legal rational authority)। আমলাতন্ত্র এই তৃতীয় ধরনের আধিপত্য বা কর্তৃত্বের পর্যায়ে পড়ে। ম্যাক্স হ্বেবারের মতে, আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা হল আইনসংগত ও বাস্তব যা বিধিবদ্ধ আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তিগতভাবে এঁরা, অর্থাৎ আমলারা কারোর প্রতি অনুগত নন, বিধিবদ্ধ আইনকানুন ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন। সামগ্রিকভাবে আমলাতন্ত্র বাস্তব সংগঠনের চিত্রকে প্রতিফলিত করে।

ম্যাক্স হ্বেবারের আমলাতন্ত্র আদর্শ বা বিশুদ্ধ রূপ (Ideal or pure type) প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন। হ্বেবারের ধারণা অনুসারে আমলাতন্ত্র বাস্তবসম্মতভাবে কার্য পরিচালনার এক সমষ্টিগত প্রয়াস। বৃহদায়তন, জটিল প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে এর চেয়ে যোগ্য ও দক্ষ সংগঠন আর নেই।

১৯.৩.২ ম্যাক্স হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

ম্যাক্স হ্বেবারের মতে, কাঠামোগত ও আচরণগত দিক থেকে আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় শ্রমবিভাগ (division of Labour) এবং স্তরবিন্যাস এর কাঠামোগত রূপকে প্রতিফলিত করে। আমলাতন্ত্রের আচরণগত বৈশিষ্ট্যসমূহ হল উদ্দেশ্যমূলক (objectivity), পরিণামদর্শিতা (discretionary), যথার্থতা (precision) এবং স্থিরতা (consistency)।

ম্যাক্স হ্বেবারের মতে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভবের সাথে সাথে আমলাতন্ত্রের উদ্ভব হয়। তিনি লিখেছেন যে, আজকের দুনিয়ায় ধনতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি (Capitalist market economy) দাবি করে যে, প্রশাসনের ব্যবসায়িক কাজকর্ম পালিত হোক যতটা সম্ভব যথার্থ স্বচ্ছ, বিরতিহীন এবং ক্ষিপ্রভাবে। সুতরাং, তাঁর মতে, আমলাতন্ত্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্টগুলি হল : (১) আইনানুসারে সংগঠিত নির্দিষ্ট ও স্থায়ী অধিক্ষেত্রের অবস্থিতি; (২) কার্যগত স্তরবিন্যাস এবং কর্তৃত্বের ধাপ বা ক্রমপর্যায়ের নীতি, অর্থাৎ এর দ্বারা বোঝায় যে, প্রাধান্য ও বশ্যতার নীতি এবং তদারকি ও দায়িত্বশীলতার নীতির দ্বারা আমলাতন্ত্র পরিচালিত হয়; (৩) প্রশাসন পরিচালনার ও কার্য সম্পাদনের নীতি ও লক্ষ্যগুলি লিখিত আইনকানুন ও দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে; (৪) আমলাতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত সংস্থাগুলির কাজকর্ম সম্পাদন হয়ে থাকে আধুনিক পরিচালন নীতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ প্রশাসক দ্বারা; (৫) কার্য বা দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে রীতিসিদ্ধ বা আচারনিষ্ঠ নিয়মকানুন পদ্ধতির গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আমলারা কর্তব্য পালনে যথাসম্ভব সচেতন থাকেন, প্রয়োজনে সময়সীমার পরেও কাজ করে থাকেন।

১৯.৩.৩ ম্যাক্স হ্বেবারের আমলাতন্ত্র তত্ত্বের ত্রুটি

ম্যাক্স হ্বেবারের আমলাতন্ত্র তত্ত্বটির নানাভাবে সমালোচনা করা হয়। প্রথমত, সমালোচকরা সাধারণভাবে তত্ত্বটিকে "যান্ত্রিক তত্ত্ব" (machine theory) বলে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা ও যান্ত্রিক প্রণালীর

দাস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে হ্বেবারের আমলাতান্ত্রিক সংগঠনকে অমানবিক, পরিবেশের সঙ্গে অসংগতিসূচক করে তুলেছেন। দ্বিতীয়ত, সমালোচকদের মতে, আমলাতন্ত্রের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যগুলি এমন হওয়া উচিত যাতে কোনও সংগঠনের কাজগুলো বিচার করার সঙ্গে সঙ্গে সেই সংগঠনের অ-কাজ বা নেতিবাচক কাজগুলিকে বিচার করা যায়। পিটার ব্লাউ (Peter Blau) মনে করেন, আমলাতন্ত্রের নেতিবাচক কাজগুলিকে বিচার না করেই আমলাতন্ত্রকে অন্যান্য সংগঠনের তুলনায় উৎকৃষ্ট বা সুবিধাজনক বলা চলে না। তৃতীয়ত, হ্বেবারের আমলাতান্ত্রিক মডেলটিকে আদর্শ রূপ (ideal type construct) হিসাবে চিহ্নিত করে কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন বাস্তবে আমলাতান্ত্রিক কাঠামো বুঝতে এই তত্ত্ব সাহায্য করে না। সমালোচকরা এই আদর্শ রূপ ধারণাটি দুটি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করেন। প্রথমত, একটি আদর্শ ধারণা হিসাবে উপস্থিত করছেন বলেই যা কিছু প্রশাসনের আদর্শ আচরণ বা কার্যকলাপ, তাই গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যতিক্রমগুলো গুরুত্বহীন। দ্বিতীয়ত, হ্বেবার মনে করেন, সংগঠনের আনুষ্ঠানিক কাঠামো ও রীতিনীতির ব্যতিক্রমগুলি প্রশাসনিক উৎকর্ষের পরিপন্থী। হ্বেবারের তত্ত্বের অন্যতম সমালোচক পিটার ব্লাউ বিশ্বাস করেন যে, আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে অনুষ্ঠান বহির্ভূত আচার-ব্যবহারের গুরুত্ব আছে এবং সংগঠনে প্রশাসনিক উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে এদের অবদান কিছু কম নয়। রবার্ট মার্টন হ্বেবারের আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের জটিল ও মাত্রাতিরিক্ত শৃঙ্খলার সমালোচনা করেন। আলভিন গোল্ডনার মনে করেন, আমলাতান্ত্রিক প্রবণতার মধ্যে রয়েছে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া। আমলাতন্ত্র এই ধরনের আশা ও প্রত্যাশার উপর নির্ভর করে আছে। এই প্রত্যাশা যখন পরিপূর্ণ হয় না তখনই দেখা দেয় এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া। প্রতিক্রিয়াটি পরিচালক ও পরিচালিত উভয়ের দিক থেকেই হতে পারে। রবার্ট প্রেসসুস আমলাতন্ত্রকে A product of alien culture বলে অভিহিত করেছেন। সকল দেশের প্রশাসনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আধা উন্নত বা উন্নতিশীল দেশের প্রশাসনের পক্ষে এই তত্ত্বটি কার্যকরী নয় বলে অনেকে মনে করেন। এটজিমনি হ্বেবারের আমলাতান্ত্রিক মডেলের প্রয়োগ-যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি আরও মনে করেন যে, আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর স্থির ও অচঞ্চল গতি কোনমতেই প্রশাসনিক উৎকর্ষতা বাড়াতে পারে না।

সমালোচকরা ম্যাক্স হ্বেবারের আমলাতন্ত্র তত্ত্বটির যতই সমালোচনা করুন না কেন, আমলাতন্ত্র আলোচনায় হ্বেবার একজন দিকপাল—এ কথা সকলেই বিশ্বাস করে থাকেন। হ্বেবারের আগে সংগঠন সম্পর্কে এতটা ব্যাপক ও অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি কখনও পাওয়া যায়নি। ওয়ারেন বেনিসের ভাষায়, হ্বেবার আমলাতন্ত্র সম্পর্কে একটা উন্নত ও পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। এইটি বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব বলেও অনেকে মনে করেন।

১৯.৪ কার্ল মার্ক্স-এর আমলাতন্ত্রের ধারণা

আমলাতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না যদি আমরা কার্ল মার্ক্স-এর আমলাতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা জানতে না পারি। কার্ল মার্ক্স আমলাতন্ত্র সম্পর্কে কোনও সম্পূর্ণ তত্ত্ব লেখেননি। তবে ধনতান্ত্রিক সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সেই সমাজের সংগঠনের দিকে বিশেষ আলোকপাত করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় দেশগুলির ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সমালোচনামূলক তত্ত্ব তৈরি করার সময় মার্ক্স

জনপ্রশাসনমূলক সংগঠনগুলির পরিচালনা সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সংগঠনের কার্যাবলী নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন। কিন্তু কোনও সংগঠিত তত্ত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। পরবর্তীকালে তাঁর অনুগামীরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখাগুলো একত্রিত করে মার্ক্স-এর আমলাতন্ত্র-এর মনোভাব হিসাবে (views) প্রকাশ করেন।

মার্ক্স আমলাতন্ত্রকে কোন সার্থক ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা বলে মনে করেননি। বরং রাষ্ট্র শ্রেণীশোষণের যন্ত্র এবং শোষণের হাতিয়ার হল আমলারা। তিনি আমলাদের দমনমূলক চরিত্রটি আমাদের সামনে তুলে ধরেন। তাঁর মতে, আমলাদের কাজ হল কোনও বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করার জন্য সচেষ্ট থাকা। আমলারা দরিদ্র ও সাধারণ জনতার স্বার্থরক্ষায় আগ্রহ দেখান না। ধনীর স্বার্থরক্ষাই এদের জীবনমন্ত্র।

হেগেলের Philosophy of Right-এর সমালোচনায় মার্ক্স বলেন যে, আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আধিপত্য-পরম্পরা ব্যবস্থা চালু থাকার জন্য আমলারা যোগ্যতাহীন হয়। যিনি ক্ষমতার উচ্চাসনে বসে আছেন তিনি জানেন না কোনও বিষয়ের খুঁটিনাটি। অন্যদিকে অধস্তন জানেন না বিষয়টিতে প্রয়োগ করা যায় নিয়মকানুন। ফলে আমলাতন্ত্র বিষয়টি সামগ্রিকভাবে বিচার না করে আংশিক বিচার করে থাকে। উপরন্তু বিষয়টির গুরুত্ব বিচারে এরা শ্রেণীস্বার্থের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে।

মার্ক্স-এর আমলাতন্ত্র-মনোভাবের অপর সংযোজন হল, আমলারা প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করার সময় জ্ঞানকে গোপনীয় এবং দক্ষতাকে রহস্যময় করে তোলেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অধস্তনের কাছে তাদের কাজের গোপনীয়তা রক্ষা করে থাকেন। ফলে আমলাতন্ত্রের একটা বন্ধচরিত্র (closed chapter) গড়ে ওঠে।

আমলাতন্ত্র সম্পর্কে মার্ক্স-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হল "The 18th Brumasre of Louis Bonaparte"। ফরাসী বিপ্লবের আগে এবং পরে আমলাতন্ত্র কিভাবে শ্রেণীচরিত্র অর্জন করে এই প্রবন্ধে মার্ক্স তা তুলে ধরেন। মার্ক্স-এর মতে, আমলাতন্ত্র হল পরাশ্রয়ী সংস্থা যা ফরাসী সমাজের শ্রীবৃদ্ধির সকল পথ বুজিয়ে দেয়। আমলাতন্ত্রের আবির্ভাব চরম রাজতন্ত্রের যুগ থেকে। পরবর্তীকালে তাঁর ক্যাপিটাল গ্রন্থে ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের সম্পর্কে টুকরো টুকরো লেখার মধ্য দিয়ে আমলাতন্ত্রকে আলোচনা করেন। তবে একথা সত্য যে, মার্ক্স আমলাতন্ত্র অথবা রাষ্ট্র প্রশাসন আলোচনা করেননি। বরং তিনি ধনতান্ত্রিক সমাজে ধনিকশ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধের সূচনার আলোকপাত করেন। তাঁর মতে, বুর্জোয়া ও শ্রমিকের লড়াইয়ে আমলারা স্বাভাবিকভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষ নেয় এবং নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে। মার্ক্স বলেন "Where bourgeois' life and activity begin, the power of the state bureaucracy ends".

১৯.৫ সারাংশ

ম্যাক্স হ্বেবারের আমলাতন্ত্র তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা। তিনি আমলাতন্ত্রকে "ক্ষমতা" ও "আধিপত্যে"-এর বিশেষ রূপ হিসাবে দেখেছেন। তিনি আধিপত্যকে তিন রকমভাবে ভাগ করলেও আমলাতন্ত্রকে আইনগত ও বাস্তবসম্মত মনে করেন। হ্বেবারের আমলাতন্ত্র তাঁর আদর্শ বা বিশুদ্ধ রূপেরই অঙ্গ। হ্বেবারের আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রপরিচালনায় বিজ্ঞানসম্মত মনে করা হলেও সমালোচকরা নানাভাবে সমালোচনা করেন। তত্ত্বটি বড় বেশি যান্ত্রিক অ্যাখ্যা দেওয়া হয়। রাষ্ট্র পরিচালনায় পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব অনস্বীকার্য—এ সত্য হ্বেবারের আলোচনায় অনুপস্থিত। কার্ল মার্ক্সও আমলাতন্ত্র সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা না করলেও রাষ্ট্র শোষণ কাজে আমলাদের ব্যবহার করে থাকে—এ কথা বারবার বলেছেন।

১৯.৬ অনুশীলনী

১। ম্যাক্স হ্বেবারের আমতন্ত্র তত্ত্বটি কী? এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করুন।

২। ম্যাক্স হ্বেবারের আমলাতন্ত্রের সমালোচনামূলক আলোচনা করুন।

৩। কার্ল মার্ক্স-এর আমলাতন্ত্র ধারণাটির টীকা লিখুন।

১৯.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। Aron, Raymond : Main Currents in Sociological Thought ; V.2, Penguin Books, England and U.S.A., 1967.

২। Bhattachariya, Mohit : New Horizons of Public Administration, Jawahar Publishers, 1998, New Delhi.

৩। দেবাশীষ ভট্টাচার্য : গণ প্রশাসন পরিচালন ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা, সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স, ১৯৮৮।

একক ২০ □ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সংক্রান্ত তত্ত্ব

গঠন

২০.০ উদ্দেশ্য

২০.১ প্রস্তাবনা

২০.২ প্যারেটোর তত্ত্ব

২০.৩ মসকার তত্ত্ব

২০.৪ মিশেল্‌সের তত্ত্ব

২০.৫ অনুশীলনী

২০.৬ গ্রন্থপঞ্জী

২০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি প্যারেটো, মসকা ও মিশেল্‌সের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ (Elite) সংক্রান্ত তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে পরিচিতি লাভ করবেন। বিশেষত, এই অধ্যয়নের ফলে—

- শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ কাদের বলে তা জানতে পারবেন
- বিভিন্ন ধরনের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ কীভাবে ক্ষমতায় আসীন হয় এবং ক্ষমতাচ্যুত হয় সে সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করবেন
- সংখ্যালঘু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ যেভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের উপর শাসন কায়েম করে সেই ব্যাপারটি বুঝতে পারবেন এবং
- রাজনৈতিক দলগুলির পরিচালনার ক্ষেত্রে কীভাবে দলীয় নেতাদের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর অনমনীয় কর্তৃত্ব কায়েম হয় তা জানতে পারবেন।

২০.১ প্রস্তাবনা

সকল সমাজেই একটি সংখ্যালঘু মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় যারা উৎকর্ষে উচ্চতর। এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করে। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ কিছু বংশানুক্রমিক ও ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং বিশেষ কিছু সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এই শাসনের অধিকার অর্জন করে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গই হলেন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য তিনজন ইতালীয় সমাজবিজ্ঞানী—প্যারেটো, মসকা এবং মিশেল্‌স্। এঁরা তিনজনই ম্যাকিয়াভেলির আধুনিক অনুগামী রূপে পরিচিত। এঁরা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে অবিশ্বাসী। এঁরা মার্ক্সবাদেরও বিরোধী ছিলেন। ব্যক্তিগত মালিকানাবিহীন সমাজে শ্রেণী বিলোপের মার্ক্সীয় তত্ত্বে আপত্তি জানিয়ে এঁরা বলেছেন যে, সকল সমাজেই শাসক ও শাসিত এই দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে। এঁদের মতে, শাসন করার প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও ক্ষমতা মুষ্টিমেয় মানুষেরই থাকে যারা প্রশাসনিক যোগ্যতা ও বিচক্ষণতা সম্পন্ন। এঁদেরই শাসন করা উচিত এবং বাস্তবে এই মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গই শাসনকার্য পরিচালনা করে এসেছে ও ভবিষ্যতেও করবে। এটা শুধু বাস্তব নয়, বাঞ্ছনীয়ও বটে।

বর্তমান এককের পরবর্তী অংশে প্যারেটো, মসকা ও মিশেল্‌সের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সংক্রান্ত তত্ত্বসমূহ বিশদে আলোচিত হল।

২০.২ প্যারেটোর তত্ত্ব

প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ ভিলফ্রেডো প্যারেটোর (Vilfredo Pareto) মতে, মানুষ যেমন শারীরিকভাবে, তেমনি মানসিক ও বুদ্ধিগত সামর্থ্যের দিক দিয়েও অসমান। যে কোনও গোষ্ঠীতে যারা সর্বাপেক্ষা সমর্থ তাদেরই প্যারেটো 'শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ('elites') বলে আখ্যা দিয়েছেন। শ্রেষ্ঠত্বের ধারণায় তিনি কোনও নৈতিক গুণমান ও সম্মানসূচক তাৎপর্য আরোপ করেননি। এই শব্দটির দ্বারা তিনি শুধুমাত্র সেইসব ব্যক্তিদের বুঝিয়েছেন যে, কোনও কর্মগত ক্ষেত্রে যারা সর্বাধিক সাফল্যের সূচকের অধিকারী—সফল ব্যবসায়ী, সফল লেখক, সফল উকিল, সফল শিল্পী—এর সকলেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। তবে প্যারেটোর মতে, একমাত্র পূর্ণমাত্রায় উন্মুক্ত সমাজে—কেবলমাত্র তাত্ত্বিক স্তরেই যার অস্তিত্ব—শ্রেষ্ঠত্বের অভিধার সাথে সর্বাধিক দক্ষতার পূর্ণ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। বাস্তব জগতে পারিবারিক যোগাযোগ বা পরিচিতি, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ মর্যাদা অর্জনের পথে কিছুটা হেরফের ঘটায়। এর ফলে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন ও সর্বাধিক দক্ষতার প্রকাশের মধ্যে কিছুটা গরমিল দেখা দেয়।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে প্যারেটো আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন—শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ এবং অশাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ (ruling and non-ruling elites)। দেশের শাসনকার্যে শাসক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে শৃগালের মতো প্রতারণার দ্বারা অথবা সিংহের মতো বলপ্রয়োগের দ্বারা এরা জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করে। ম্যাকিয়াভেলির পরিভাষা অনুসরণ করে প্যারেটো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে 'শৃগাল' ও 'সিংহ'—এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন। শৃগালগণ নমনীয়ভাবে পরিবেশ বা পরিস্থিতিগত প্রয়োজনের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে সচেষ্ট হয়। এরা আদর্শবাদী (ideology) উদ্দেশ্যের তুলনায় বস্তুবাদী উদ্দেশ্যকে বেশি প্রাধান্য দেয় এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নীতি বিসর্জন দিতে দ্বিধা করে না। প্রচার ও প্রতারণার দ্বারা এরা ক্ষমতা অর্জন ও রক্ষা করে। কূটনৈতিক রফার মাধ্যমে এরা রাজনৈতিক শক্তিগুলির পুনর্বিন্যাস করে। কিন্তু সিংহগণ হল অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল। পরিবার, গোষ্ঠী, অঞ্চল ও দেশের প্রতি এরা প্রবল আনুগত্য দেখায়। এদের

মধ্যে আদর্শ ও বিশ্বাসের প্রাধান্য দেখা যায়। এরা শ্রেণীভিত্তিক একতাবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং ধর্মীয় আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। প্রয়োজন দেখা দিলে বলপ্রয়োগে এরা ভয় পায় না বা দ্বিধা করে না। এরা বলপ্রয়োগের দ্বারাই ক্ষমতা অর্জন ও রক্ষা করে।

প্যারেটোর মতে, আদর্শ শাসককুল একই সাথে সিংহোপম ব্যক্তিবর্গ—যারা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে এবং কার্যসম্পাদন করতে সক্ষম এবং শৃগালোপম ব্যক্তিবর্গ—যারা কল্পনাপ্রবণ, উদ্ভাবনক্ষম এবং বিবেকহীন—উভয়কে নিয়ে গর্বিত হবে। শাসককুলের মধ্যে যখন এই বিপরীতধর্মী গুণাবলীর সুষ্ঠু মিশ্রণ বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন শাসনক্ষমতা অনমনীয় আমলাতন্ত্রের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, যারা নবীকরণ ও পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলতে অক্ষম নয়, সেইসব কলহপ্রবণ আইনজ্ঞ ও বাগাড়ম্বরকারীদের উপর শাসনক্ষমতা ন্যস্ত হয়, যারা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তগ্রহণ ও কার্যসম্পাদনে অপারগ। এরকম ক্ষেত্রে শাসিত জনগণ শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করে এবং নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ শাসকশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ তখন একটি আরও কার্যকরী শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলে।

প্রত্যেক সমাজেই সম্ভাব্য এবং অসন্তুষ্ট নেতারা থাকে। এদের হয় শাসককুলের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে অথবা অপসারিত করতে হবে। যখন কোনও শাসকশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ দীর্ঘদিন ক্ষমতায় আসীন থাকে, তখন তারা বলপ্রয়োগ করতে অনিচ্ছুক হতে পারে। তারা বুদ্ধিবৃত্তি ও শিল্পকলার চর্চায় মেতে থাকতে পারে। তারা অত্যন্ত সহনশীল ও সংযত হয়ে পড়তে পারে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগ করার প্রবণতা হারিয়ে ফেলতে পারে। এসময়ে সিংহোপম নেতৃবর্গ (যারা শাসককুলের অন্তর্ভুক্ত নয়) জনসাধারণকে শৃগালোপম শাসকবর্গের বিরুদ্ধে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে পারে। এভাবেই শাসকশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ গড়ে ওঠে, শাসন করে, অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয় এবং পরিশেষে নতুন শাসককুল দ্বারা অপসারিত হয়। প্যারেটো মন্তব্য করেছেন, "অভিজাততন্ত্রসমূহ স্থায়ী হয় না।...ইতিহাস অভিজাততন্ত্রসমূহের কবরখানা।...বিদ্যমান ভারসাম্য বিচলিত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ হল নিম্নশ্রেণীর মধ্যে উচ্চতম গুণাবলী জড়ো হওয়া এবং, উল্টোদিকে, উচ্চশ্রেণীর মধ্যে নিম্নতম গুণাবলী জড়ো হওয়া।" ("Aristocracies do not last...History is a graveyard of aristocracies...Potent cause of disturbance in the equilibrium is the accumulation of superior elements in the lower classes and, conversely, of inferior elements in the higher classes.")

শাসকশ্রেণী দীর্ঘদিন ক্ষমতায় আসীন থাকলে আরও একটা সম্ভাবনা দেখা দেয়। তারা নিম্নশ্রেণীর থেকে উদ্ভূত নতুন সমর্থ ব্যক্তিবর্গকে, অর্থাৎ সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে, নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে অপারগ ও অনিচ্ছুক হয়ে পড়তে পারে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের আবর্তন এইভাবে বাধাপ্রাপ্ত হলে সামাজিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য বিচলিত হয় এবং সামাজিক শৃঙ্খলা অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়। যদি শাসকশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ শাসিতশ্রেণীর সম্মুখে অবস্থানকারী অসাধারণ ব্যক্তিদের নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা না করতে পারে, তবে আকস্মিক সামাজিক পরিবর্তন বা রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন ও শাসনে সক্ষম শাসকশ্রেণী পুরাতন শাসকশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

প্যারেটোর মতে, তাঁর সমসাময়িক ইউরোপে, বিশেষত ফ্রান্স ও ইতালিতে, শৃগালদের উত্থান ঘটেছিল। রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল রাজনীতির কারবারীরা, নীতিহীন আইনজীবীরা, কুতার্কিক বুদ্ধিজীবীরা, ফাটকাবাজরা ও কৌশলপূর্বক নিজ-উদ্দেশ্যসাধনকারীরা। কিন্তু তিনি পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত

লাভ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, অতীতের মতো এখনও রক্ষণশীল, ধৈর্যশীল ও বলপ্রয়োগে সক্ষম সিংহদের উত্থান ঘটবে এবং তারা বলপ্রয়োগে অক্ষম ও প্রতারণাশীল শৃগালদের অপসারণপূর্বক শাসনক্ষমতা দখল করে নেবে। দেশাত্মবোধ, বিশ্বাস, জাতীয় মর্যাদাবোধ সকলের আনুগত্য আদায় করে নেবে। কিন্তু পরবর্তীকালে নিজেদের বুদ্ধিবলে শৃগালরা আবার ক্ষমতা দখল করবে। শাসকবর্গের চক্রবৎ আবর্তন এইভাবে চলতেই থাকবে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শৃগাল ও সিংহের উপস্থিতির মতো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও 'ফাটকা কারবারী'—যারা শৃগালসদৃশ এবং 'নির্দিষ্ট উপার্জনভোগী'—যারা সিংহসদৃশ—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি প্যারেটোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এদের স্বার্থ যে শুধু ভিন্ন তাই নয়; এদের মানসিকতাও আলাদা। এই দুটি গোষ্ঠী সমাজে ভিন্ন ভিন্ন উপযোগিতাপূর্ণ কার্য সাধন করে। ফাটকা কারবারীদের গোষ্ঠী মূলত পরিবর্তন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি আনয়নে সহায়তা করে। অন্যদিকে নির্দিষ্ট উপার্জনভোগীদের গোষ্ঠী স্থায়িত্ব রক্ষায় সাহায্য করে এবং অনেক ক্ষেত্রে ফাটকা কারবারীদের ঝুঁকিবহুল আচরণ থেকে উদ্ভূত বিপদ-আপদ নিবারণ করে। যে সমাজে নির্দিষ্ট উপার্জনভোগীরা প্রায় একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে তা নিশ্চল এবং যেন প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। যে সমাজে ফাটকা কারবারীদের প্রাধান্য তা স্থায়িত্বের অভাবে ভোগে, এক দুর্বল ভারসাম্যগত অবস্থায় বিরাজ করে যা ভেতরের এবং বাইরের সামান্য দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পরে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শৃগাল ও সিংহদের সুষ্ঠু সমন্বয়ের মতো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফাটকা কারবারী ও নির্দিষ্ট উপার্জনভোগীদের সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থানই প্রয়োজনীয় সমতা ও নিয়ন্ত্রণ যুগিয়ে সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে।

বিবর্তন ও প্রগতির ধারণাকে প্যারেটো অর্থহীন মনে করতেন। তাঁর মতে, শৃগালতুল্য ব্যক্তি ও সিংহতুল্য ব্যক্তিদের সমাজে আধিপত্য চক্রাকারে আবর্তন করেই চলবে। এই প্রক্রিয়ায় ভারসাম্যের ভরকেন্দ্র পাল্টালেও ভারসাম্য বিরাজ করবেই। প্যারেটোর মতে, ইতিহাসের পথ বেয়ে নতুন কিছু সংঘটিত হয় না। ইতিহাস মানবীয় নির্বুদ্ধিতার বিবরণ ছাড়া আর কিছু নয়। স্বর্গরাজ্য কোথাও নেই।

প্যারেটোর তত্ত্বের বেশ কিছু বক্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে; যেমন, প্যারেটোর মতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের আবর্তনকে অর্গলবদ্ধ করলে সামাজিক ভারসাম্যর হানি হবে। এই অবস্থায় ক্ষমতাসীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ক্ষমতা থেকে অপসারিত হবে এবং নতুন একটি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের গোষ্ঠী ক্ষমতা অধিকার করবে। অর্থাৎ, কোনও আবদ্ধ গোষ্ঠীর অস্তিত্ব অব্যাহত থাকতে পারে না, সেই গোষ্ঠীর অবসান অনিবার্য। বটোমোর (Tom Bottomore) কিন্তু প্যারেটোর এই বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেছেন যে, আবদ্ধ গোষ্ঠী মাত্রেরই অবসান অনিবার্য একথা বলা চলে না। যেমন, ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় প্রাচীন কাল থেকে ব্রাহ্মণরা আবদ্ধ গোষ্ঠী হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অন্য কোনও নিম্নবর্গের মানুষের এই গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কোনও সুযোগ নেই। অথচ, আবহমানকাল ধরে ব্রাহ্মণরা তাদের এই আবদ্ধ গোষ্ঠীগত অস্তিত্বকে অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। প্যারেটোর তত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ সর্বক্ষেত্রে ঐতিহাসিকভাবে সমর্থিত নয়। এ কারণে অনেকে প্যারেটোর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সংক্রান্ত তত্ত্বটিকে অনৈতিহাসিক বলে অভিযুক্ত করেন। তবে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই তত্ত্বটি রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ভারতের সামাজিক বাস্তবতাও এই তত্ত্বকে

অনেকাংশেই সমর্থন করে। জাতপাতের পুরনো বিধান সত্ত্বেও বর্তমান রাজনৈতিক, এমনকি সামাজিক স্তরেও ব্রাহ্মণগণ যে আগের মতো নিরঙ্কুশ আধিপত্য ভোগ করেন না তার অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে। ক্ষমতার শীর্ষে কিংবা মুখ্য উপদেষ্টার ভূমিকায় অথবা প্রশাসনে অব্রাহ্মণদের (এমনকি কিছু পরিমাণে নিম্নবর্গেরও) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ওপরে উঠে আসা এখন অতি পরিচিত ঘটনা। ব্রাহ্মণ বংশজাত মানুষের এখন যেটুকু কর্তৃত্বের অধিকারী সেটা সম্ভব হয়েছে কৌলীন্যের আবদ্ধ অস্তিত্বের জন্য নয়; বরং সামাজিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন শিক্ষাদীক্ষায় পটুত্ব ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের উপযুক্ত মনোভাবের ফলে।

২০.৩ মসকার তত্ত্ব

মসকা (Gaetano Mosca) কার্ল মার্ক্সের বিপরীত অভিমুখে গিয়ে এই ধারণা অপনোদন করার চেষ্টা করেছেন যে, শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাঁর 'The Ruling Class' শীর্ষক গ্রন্থে তিনি একথাই বলেছেন যে, সমাজে সবসময়েই একটি শাসকশ্রেণী থাকবে।

মসকার মতে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ গঠিত হয় সেই সকল সংখ্যালঘু ব্যক্তিদের নিয়ে সমাজে যাদের ক্ষমতা থাকে। সংগঠন ও কাঠামোর জোরে এই ব্যক্তিবর্গ সমাজে আধিপত্য কায়েম করে বাস্তবে একটি সামাজিক শ্রেণীতে পরিণত হয়। এই আধিপত্যশীল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের যোগসূত্র থাকে—আত্মীয়তার যোগসূত্র, স্বার্থের যোগসূত্র, সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ইত্যাদি। এইসব যোগসূত্রের ফলে এদের মধ্যে একটি চিন্তাগত সাযুজ্য ও গোষ্ঠীগত একতা গড়ে ওঠে, যেগুলি সামাজিক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত হয়। অসংগঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের উপর এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ—যারা অর্থনৈতিক দিক দিয়েও বলীয়ান—তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করে।

কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সমরূপ নয়, বরং তারা স্তরবিন্যস্ত। এদের মধ্যে খুবই স্বল্পসংখ্যক কিছু ব্যক্তি বা পরিবারের অস্তিত্ব থাকে যারা অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের তুলনায় অধিক ক্ষমতাবান এবং তাদের পরিচালনা করে। এই স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি বা পরিবার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্ব দান করে যার ফলে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ আরও বলিয়ান হয়ে ওঠে। মসকার মতে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত নেতাদের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলেই ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব।

মসকা তাঁর 'The Ruling Class' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "সমস্ত সমাজে—যেসব সমাজ খুব অল্পই উন্নত এবং কোনমতে সভ্যতার রূপ পরিগ্রহ করেছে, যেগুলি থেকে শুরু করে সবথেকে অগ্রসর ও ক্ষমতাসম্পন্ন সমাজগুলি অবধি—দুই শ্রেণীর ব্যক্তির দেখা মিলেছে—একটি শ্রেণী শাসন করে এবং একটি শ্রেণী শাসিত হয়। সবসময়েই স্বল্পসংখ্যাবিশিষ্ট প্রথম শ্রেণীটি রাজনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদন করে; একচেটিয়াভাবে ক্ষমতা অধিকার করে এবং ক্ষমতা যে সুবিধাগুলি আনয়ন করে সেগুলি ভোগ করে, যেখানে অধিক সংখ্যাবিশিষ্ট দ্বিতীয় শ্রেণীটি প্রথমটির দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত এমনভাবে যা কখনও কখনও মোটামুটি আইনানুগ, কখনও কখনও মোটামুটি বিধিবহির্ভূত ও হিংস্র এবং এই দ্বিতীয় শ্রেণীটি প্রথমটিকে, অন্তত দৃষ্টিগোচরভাবে,

ভরণপোষণের বস্তুগত উপকরণসমূহ এবং রাজনৈতিক অবয়বের বৈধতার জন্য যেসব প্রকরণগুলি অপরিহার্য সেগুলি সরবরাহ করে।"

মসকা তাঁর ক্ষমতাশীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সংক্রান্ত তত্ত্বে রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছার শাসন'-এর ধারণাকে অস্বীকার করেছেন। আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছেন, "গণতন্ত্র হ'ল জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন।" গণতন্ত্রের এই সংজ্ঞাকে মসকা অস্বীকার করেছেন। মরিস দুভারজারের মতে মসকার তত্ত্বে যে শাসনব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তা জনগণের শাসন হলেও এই শাসনব্যবস্থা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ জনগণের ভিতর থেকে উঠে আসে। পৃথিবীর সর্বত্রই যে কোনও দেশ বা জাতি শাসিত হয় রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাসীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা।

মসকার মতে, প্রজাতি, ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, বেঁচে থাকার লড়াইয়ের তীব্রতা ইত্যাদির উপরে নয়, নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্ক সমন্বিত সামাজিক কাঠামোর উপরেই নির্ভর করে যে একটি জনগোষ্ঠী শাসন করবে বা শাসিত হবে। তাঁর মতে, নিগ্রো ও ভারতীয়গণ নিজেদের প্রচেষ্টায় প্রগতির যে স্তরে উপনীত হতে পারত তা ইউরোপীয় শাসনের দ্বারা প্রতিহত হয়েছে। নিগ্রোরা যদি শ্বেতাঙ্গদের মতো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা লাভ করত, তা হলে তারা শ্বেতাঙ্গদের মতো উন্নতি করতে পারত না এটা ভাবার কোনও কারণ নেই। নিগ্রো শিশুরা যখন উপলব্ধি করে যে, তারা নীচ হিসাবে বিবেচিত একটি প্রজাতির সন্তান এবং তারা পাচক ও মালবাহকের চেয়ে বেশি কিছু হওয়ার আশা করতে পারে না, তখন তারা হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে উন্নতির সব উদ্যম হারিয়ে ফেলে।

মসকার মতে, সমাজে ডারউইন-কথিত বেঁচে থাকার লড়াই ততটা দেখা যায় না যতটা দেখা যায় বিশিষ্টতম বলে পরিগণিত হওয়ার জন্য সংগ্রাম। এই প্রবণতাটি সমস্ত সমাজে নিরবচ্ছিন্নভাবে দেখা যায়। বিশিষ্টতম বলে পরিগণিত হওয়ার সংগ্রাম বলতে মসকো বুঝিয়েছেন অর্থ, ক্ষমতা ও সম্মানের জন্য সামাজিক প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব। বেঁচে থাকার লড়াইয়ের মতো এক্ষেত্রে পরাজিতদের নিহত বা নিশ্চিহ্ন করা হয় না। এক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু পরাজিতরা শুধুমাত্র কিছুটা কম পরিমাণে বৈষয়িক তৃপ্তি এবং স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে।

মসকার মতে, একটি মৌলিক এবং অপ্রতিরোধনীয় মনস্তাত্ত্বিক নিয়ম মানুষের স্বভাব গড়ে তোলে। সেটি হ'ল বিশিষ্টতম বলে পরিগণিত হওয়ার জন্য মানুষের আকাঙ্খা এবং তজ্জনিত সংগ্রাম। এই আকাঙ্খাজনিত সংগ্রামের ফলে সমাজে অবধারিতভাবে শাসকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। প্রতিটি সমাজেই একটি শাসক ও শাসিতশ্রেণী ছিল, আছে বা থাকবে। মার্ক্স যেভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থার বদলের সাথে সাথে শ্রেণীহীন সমাজের আবির্ভাবের কথা বলেন, তা মসকার কাছে একেবারেই গ্রহণীয় নয়। অবশ্য প্যারেটো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের যে পরিমাণে সক্রিয় ভূমিকার কথা বলেছেন তা মসকা কখনই বলেননি।

মসকার মতে, যখন সমাজ বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে উপনীত হয় তখন শাসনতান্ত্রিক, সামরিক ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও নৈতিক নেতৃত্ব-সমন্বিত রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সবসময়েই একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী অথবা সংগঠিত সংখ্যালঘু ব্যক্তিবর্গের দ্বারা কায়েম হয়। মসকা বিশ্বাস করতেন যে, গণতন্ত্রেও এই ধরনের সংগঠিত সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দের প্রয়োজন থাকে। যদিও গণতান্ত্রিক বিধিবিধানসমূহ সংখ্যাগরিষ্ঠের নিয়ন্ত্রণের আদর্শের কথাই বলে

সংখ্যালঘু ব্যক্তিবর্গের দ্বারা কায়েম হয়। মসকা বিশ্বাস করতেন যে, গণতন্ত্রেও এই ধরনের সংগঠিত সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দের প্রয়োজন থাকে। যদিও গণতান্ত্রিক বিধিবিধানসমূহ সংখ্যাগরিষ্ঠের নিয়ন্ত্রণের আদর্শের কথাই বলে এবং যদিও গমতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের নিয়ন্ত্রণই প্রদর্শিত হয়, তবুও এই সংখ্যালঘু গোষ্ঠীই বাস্তবে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রকৃত নিয়ন্ত্রক হয়।

মসকা গণতান্ত্রিক সমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের শাসনের সাথে অন্যান্য সমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের শাসনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা উন্মুক্ত বলে গণতান্ত্রিক সমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের গোষ্ঠীও হল উন্মুক্ত। অর্থাৎ যেখানে শাসিতশ্রেণীর থেকেও যোগ্যতর ব্যক্তিবর্গের শাসকশ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ অধিক পরিমাণে বর্তমান থাকে। এখানে সংখ্যালঘু শাসকদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের আংশিক নিয়ন্ত্রণও বজায় থাকতে পারে। গণতন্ত্রে সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দের দ্বারা গৃহীত সরকারি সিদ্ধান্তসমূহের উপর বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর অভাব-অভিযোগ ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রভাব পরিপক্ষিত হয়। অপরদিকে, সামন্ততান্ত্রিক বা অন্য কোনও ধরনের আবদ্ধ সমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের গোষ্ঠীও আবদ্ধ হয়ে থাকে। উন্মুক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রশংসা করে মসকা বলেছেন যে, গণতান্ত্রিক শাসন জনকল্যাণমুখী শাসন। কিন্তু এই শাসন জনগণের দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। শাসনের প্রয়োজনে গণতন্ত্রেও রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের অস্তিত্ব অপরিহার্য। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ববাদী (elitist) দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতি রেখে মসকা গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন সত্ত্বেও সীমিত ভোটাধিকারের কথা বলেছেন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই ভোটাধিকারকে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন।

মসকার মতে, গণ-অসন্তোষের ফলে একটি শাসকশ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্য থেকে এমন একটি শ্রেণীর উত্থান ঘটবে, যে শ্রেণীটি শাসকশ্রেণীর কার্য সম্পাদন করবে। অন্যথায় গোটা সামাজিক কাঠামো ধ্বংস হয়ে যাবে। সমাজের প্রাধান্যশীল শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার এবং বংশানুক্রমিকভাবে ক্ষমতায় আসীন থাকার প্রবণতা লক্ষিত হয়। আবার আগের ক্ষমতাশালীদের অবসান এবং নতুন একটি শ্রেণীর ক্ষমতায় অভ্যুত্থানের প্রবণতাও লক্ষিত হয়। মানবসভ্যতার ইতিহাসে বারংবার এই দুই প্রবণতার মধ্যে সংঘাত পরিলক্ষিত হয়। সমাজের উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর একটি অংশের মধ্যে এই সংঘাতের ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও সম্পদের নতুন উৎসসমূহের বিকাশ, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার, পুরাতন ধর্মের জায়গায় নতুন ধর্মের বিস্তার প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে শাসকশ্রেণীর ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। নতুন আবিষ্কার, বিদেশীদের সাথে বাণিজ্য, যুদ্ধবিগ্রহ, প্রবাসন ও অভিবাসন প্রভৃতি সমাজে নতুনভাবে সম্পদ বা দারিদ্র্যর স্রষ্টাকার। এসবের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে নতুন ধ্যান-ধারণার উদ্ভব, নতুন নৈতিক চেতনার বিকাশ এবং নতুন বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক প্রবণতার সৃষ্টি হয়।

এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ক্ষমতার অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটলে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপযোগী নতুন গুণগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে তখন নতুন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ গঠিত হয়।

শ্রেণীটি একটি বিশিষ্ট সামাজিক শক্তি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই শ্রেণীর অবস্থান হল রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের ঠিক পরেই।

শাসকশ্রেণীর ক্ষমতার উৎস হল তার সংগঠিত সংখ্যালঘুত্ব, যার ফলে এই শ্রেণী অসংগঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপর আধিপত্য কায়েম করে। অসংগঠিত হওয়ার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তি সংখ্যালঘু শাসকবর্গের সংগঠিত শক্তির কাছে ক্ষমতাহীন প্রতিপন্ন হয়। একটি ছোট গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও ঐক্যবদ্ধ কর্মের সুযোগ বেশি থাকে। ফলত, এই সংখ্যালঘু শ্রেণী যা করতে পারে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ তা কখনও করতে পারে না। মসকার মতে, একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের আয়তন যত বড় হয়, সংখ্যালঘু শাসকগোষ্ঠীর আয়তন তুলনামূলকভাবে তত ছোট হয়। এক্ষেত্রে এই সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সংগঠিত করা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের পক্ষে উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

মানুষের প্রকৃতি এমন যে জনপ্রতিনিধিরা নিজেদের জনগণের সেবক থেকে প্রভূতে রূপান্তরিত করে ফেলে। নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থ করার তাগিদে এই সংখ্যালঘু গোষ্ঠী নিজেদের সুসংগঠিত করে তুলে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। অবশ্য জনসাধারণের তুলনায় এদের বস্তুগত, বৌদ্ধিক ও নৈতিক গুণাবলীও উচ্চস্তরের হয়। সংগঠন ও উচ্চতর গুণাবলীর ফলে এরা সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক, ধর্মীয়, নৈতিক ইত্যাদি সামাজিক শক্তিসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। সামরিক শক্তির বলে যুদ্ধপ্রবণ অভিজাতশ্রেণী সমাজে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ থেকে উৎপাদকদের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে বাকিটা আত্মসাৎ করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র সমেত সকল সমাজে দরিদ্রদের তুলনায় ধনীদের সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশি। কোনও কোনও সমাজে নির্দিষ্ট কোনও সময়ে ধর্মীয় শক্তির অধিকার থেকে সম্পদ ও রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব হয়। মধ্যযুগে ইউরোপে যাজকশ্রেণীর প্রভাবেই সমৃদ্ধি ও ক্ষমতালাভ ঘটেছিল, কোনও কোনও সমাজে আবার বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞানের ফলেও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকার লাভ করা যেতে পারে। সংগঠন, উচ্চতর গুণাবলী এবং সামাজিক শক্তিসমূহের অধিকারের ফলে সংখ্যালঘু শাসকশ্রেণী এমন সুবিধা পায় যে আইনে না হলেও বাস্তবে এই শ্রেণী বংশানুক্রমিকভাবে শাসনের অধিকার কায়েম করে।

মসকা বিভিন্ন ঐতিহাসিক অভিজাততন্ত্রেরও শাসকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হিসাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, এদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ বংশগত ততটা নয় যতটা তাদের বিশেষ ধরনের লালনপালন; যার ফলে এদের মধ্যে অন্যদের তুলনায় অধিক পরিমাণে কিছু বৌদ্ধিক ও নৈতিক গুণাবলীর স্ফুরণ ঘটেছে।

যদিও এই সংগঠিত সংখ্যালঘুদের শক্তি জনসাধারণের চেয়ে বেশি, তবুও তারা অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া প্রতিরোধকামী জনগণের বিরুদ্ধে এই শক্তির প্রয়োগ করে না। সাধারণত শাসকশ্রেণী একটি "রাজনৈতিক সূত্র" ('political formula') প্রয়োগের দ্বারা তাদের শাসনকে জনগণের কাছে গ্রহণীয় করে তোলে। এই রাজনৈতিক সূত্রের অন্তর্ভুক্ত হল সাধারণ মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অনুভূতি ও অভ্যাসসমূহ যেগুলি ঐতিহাসিকভাবে একটি জাতির মধ্যে গড়ে ওঠে। এগুলির উপর নির্ভর করে শাসকশ্রেণী যেসকল মোহ ও বিভ্রান্তির সঞ্চার করে, সেগুলিই এই শাসকশ্রেণীর শাসনকে জনসাধারণের কাছে গ্রহণীয় করে তুলে তাকে বৈধতা প্রদান করে। প্রাচীনকালে রাজার শাসনের ঐশ্বরিক অধিকার ছিল এরকম একটি রাজনৈতিক সূত্র। বর্তমান যুগে জাতীয়তাবাদ

হল রাজনৈতিক সূত্রের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। একটি শাসনতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে নিম্নশ্রেণীর জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সূত্র উদ্ভাবনের উপর। সমাজের অধিক জনসংখ্যাবহুল ও স্বল্পশিক্ষিত স্তরের চেতনায় রাজনৈতিক সূত্রের অন্তর্নিহিত নীতিগুলি প্রোথিত থাকা প্রয়োজন। একমাত্র তখনই শাসকশ্রেণী দুর্নীতিপরায়ণ ও অত্যাচারী হলেও দরিদ্র, শোষিত, নিপীড়িত জনসাধারণের আনুগত্যলাভে সক্ষম হয়। কিন্তু মসকা এই সম্ভাবনা কখনও খতিয়ে দেখেননি যে, জনগণের চেতনার মান উন্নত করলে তারা তাদের স্বার্থবিরোধী রাজনৈতিক সূত্রকে নাকচ করতে পারে কিনা।

মসকা বলেছেন যে, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে একটি 'পরিচালক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী' গড়ে ওঠে যারা আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরোধী এবং যারা জনসাধারণের উপর সরকারের তুলনায় বেশি প্রভাবশালী। যখন উচ্চশ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে আক্রমণাত্মক প্রবণতা কমে নমনীয় স্বভাবের আধিক্য ঘটে এবং নিম্নশ্রেণীর প্রত্যাশী ব্যক্তিদের কাছে উচ্চশ্রেণীতে প্রবেশের পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়, তখন নিম্নশ্রেণীর থেকে উঠে আসা শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গ উচ্চশ্রেণীর শাসনের অবসান ঘটায়। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে জীবনের কঠোর প্রয়োজন, নিত্যদিনের জীবনসংগ্রাম, সুশিক্ষিত সংস্কৃতির অভাব ইত্যাদির ফলে মানবপ্রকৃতির কুলিশকঠোর ভাবটি সদাজাগ্রত থাকে। মসকার তত্ত্বের এই অংশটি প্যারেটোর তত্ত্বের অনুরূপ। অতএব, প্যারেটো ও মসকা উভয়ের মধ্যেই মেহনতী জনতা সম্বন্ধে একটি মুগ্ধতা ছিল যদিও তা মার্ক্সীয় ভাবধারার থেকে একেবারেই আলাদা।

মসকার মতে, একটি শাসকশ্রেণীর ভাগ্য নির্ভর করে তার উদ্যম, প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক বাস্তববুদ্ধির উপর। কোনও-না-কোনও ধরনের শাসকশ্রেণী সদাই সমাজে বিরাজ করবে; তা বিলোপের প্রচেষ্টা অর্থহীন। এই উপলব্ধি নিয়ে শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলাই হল আসল কাজ।

১৭.১ প্রস্তাবনা

মিশেল্‌সের মতে সংগঠনমাত্রেই মুষ্টিমেয় শাসক বা গোষ্ঠীতন্ত্রের অনমনীয় বিধি বা লৌহবিধির ("the iron law of oligarchy") দ্বারা পরিচালিত হয়। তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'Political Parties : A Sociological Study of the Oligarchical tendencies of Modern democracy'। এই গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেছেন, "যে সংগঠনের কথা বলে সে আসলে গোষ্ঠীতন্ত্রের কথা বলে" ("who says organization says oligarchy")।

তাঁর পূর্বসূরী প্যারেটো ও মসকার মতোই মিশেল্‌স্ মার্ক্সের বিপরীত অভিমুখে গিয়ে মানবীয় প্রকৃতির এক ক্ষমতাকামী ধারণার উপর ভিত্তি করে গোষ্ঠীতন্ত্রের আবির্ভাবের অনিবার্যতার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, গণতন্ত্রে সংগঠনের যে প্রয়োজন দেখা দেয় তাতে অবশ্যম্ভাবীরূপে গোষ্ঠীতন্ত্রের জন্ম হয়। কারণ মানুষের অন্তর্নিহিত মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা হল ক্ষমতা কামনা করা এবং একবার ক্ষমতা অধিকার করতে পারলে তা চিরস্থায়ী করা।

জনতার মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে মিশেল্‌স্ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, জনগণ নিজেদের শাসন করতে অসমর্থ। তিনি বলেছেন যে, একটি ক্ষুদ্র জনতার তুলনায় একটি বৃহৎ জনতার উপর আধিপত্য বিস্তার করা

সহজ। জনতাকে সহজেই অযৌক্তিকভাবে অভিভাবিত ও প্রভাবিত করা যায়। জনতা কোনও গভীর আলোচনা ও সুচিন্তিত মতামত প্রদানে অপারগ। দ্বিতীয়ত এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ হল গণতন্ত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রচুর সংখ্যক ব্যক্তির অংশগ্রহণের সমস্যা। গণতন্ত্র বলতে যদি বোঝায় যে, বিশালসংখ্যক জনসাধারণ একত্রে এবং প্রত্যক্ষভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ করবে, তাহলে গণতন্ত্র অসম্ভব হয়ে পড়ে। জাতীয় রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে গণতন্ত্রের এই সীমাবদ্ধতা আধুনিক সংগঠনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে সকল ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দলগুলি নিয়ে মিশেল্‌স্ পর্যালোচনা করেছিলেন, সেগুলির বিশাল আয়তনের ফলে সদস্যদের সরাসরি আলোচনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ অসম্ভব বলে প্রতিভাত হয়েছে। যেমন, তৎকালীন বার্লিনের সমাজতান্ত্রিক দলটিরই সদস্যসংখ্যা ছিল নব্বই হাজারের উপর। আধুনিক দীলয় সংগঠনগুলি বৃহদায়তন বিশিষ্ট হওয়ায় শ্রমবিভাগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এগুলির আয়তন যত বৃদ্ধি পায় ততই নতুন কার্যাবলীর উদ্ভব ঘটে ও জটিলতা দেখা দেয়। অতএব, কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব করা এবং তাদের নির্দেশিকা অনুসারে কাজ করার জন্য কিছু ব্যক্তিকে বেছে নেওয়া হয়।

গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত দলীয় সংগঠনগুলির উদ্ভবের প্রথম স্তরে—যখন সেগুলির আয়তন ছোট থাকে—বিভিন্ন দলীয় পদের সাথে বিভিন্ন পরিমাণের অর্থের ও ক্ষমতার কোনও সংশ্রব থাকে না। কিন্তু যখনই সংগঠন আয়তনে বৃদ্ধি পায় তখনই দলীয় পদগুলি অর্থ ও ক্ষমতার উৎস হয়ে ওঠে। এছাড়াও, শ্রমবিভাগের ফলে কতকগুলি বিশেষ দলীয় কর্মের জন্য দক্ষতা, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞানের প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ফলে দলীয় পদাধিকারী হিসাবে কর্মরত একদল পেশাদার রাজনীতিবিদের আবির্ভাব ঘটে। এরা সংগঠনের সেবক না থেকে প্রভু হয়ে পড়ে এবং সংগঠন আরও উচ্চাবচ্চভাবে বিন্যস্ত ও আমলাতান্ত্রিক হয়ে দাঁড়ায়। এই বিশেষজ্ঞসুলভ নেতৃবৃন্দ জনসাধারণের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেয় এবং নিজেদের হাতে প্রচুর সুযোগসুবিধা জড়ো করে। এদের স্বার্থ সাধারণের স্বার্থের বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ সদস্যদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি করা হয় যে, এই নেতৃবৃন্দ অপরিহার্য। প্রতিটি দল অথবা শ্রমিক ও কর্মচারী সংগঠন স্বল্পসংখ্যক পরিচালক ও বিপুলসংখ্যক পরিচালিততে বিভক্ত হয়ে যায়। সংগঠনের গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী নীতির প্রতিকূলে শাসক ও শাসিতদের উদ্ভব ঘটে।

মিশেল্‌স্ বলেছেন যে, বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দলগুলির সবচেয়ে চরম মতাবলম্বী শাখাগুলি এই গোষ্ঠীতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রবণতার কোনও বিরোধিতা করে না। এক্ষেত্রে যুক্তিটা এই হয় যে, দলীয় গণতন্ত্র শুধু একটি আকৃতিগত বিষয় (form) মাত্র। যেখানে গণতন্ত্রের সাথে সংগঠনের বিরোধ বাধে সেখানে সংগঠনের স্বার্থে গণতন্ত্রকে বিসর্জন দেওয়াই শ্রেয়। সংগঠনই হল সমাজতন্ত্র অর্জনের উপায় এবং ফলত সংগঠনের মধ্যেই দলের বৈপ্লবিক সারবত্তা নিহিত থাকে। সংগঠন বা আধেয়কে গণতন্ত্র বা আধারের স্বার্থে বিসর্জন দেওয়া যায় না। আরও বলা হয় যে, সংগ্রাম সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সদস্যদের শেখানো হয় যে, নিয়মানুবর্তিতাই হল শ্রেষ্ঠ বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য এবং এজন্য নিষ্ঠার সাথে উপরিস্থিত নেতাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা কর্তব্য।

জনসাধারণ উদ্যোগগ্রহণে অনিচ্ছুক হয়। মিশেল্‌স্ একে 'জনগণের চিরস্থায়ী অক্ষমতা' বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আদর্শগত বিষয়গুলি সাধারণ সদস্যদের বোধগম্য নয় বলে তারা এসব ব্যাপারে ততটা আগ্রহ বোধ করে না। মিশেল্‌সের মতে, দলের সাধারণ সভাগুলিতে উপস্থিতির স্বল্পতা

থেকেই এদের উদাসীনতার বিষয়টি বোঝা যায়। উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও জনগণের আরও কতকগুলি বিচিত্র বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলির ফলে তাদের অক্ষমতা এবং নেতৃত্বের সক্ষমতা দুইই বৃদ্ধি পায়। মিশেল্‌স্ সমীক্ষা করে দেখেছেন যে, ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দল এবং শ্রমিক ও কমচারী সংগঠনসমূহের অধিকাংশ সদস্যের বয়স হল ২৫ থেকে ৩৯ বছর। যুবকদের অবসর কাটানোর আরও অনেক উপায় আছে। এছাড়াও তারা কেউ কেউ স্বপ্ন দেখে যে, কোনও অলৌকিক উপায়ে, অর্থাৎ বাইরের কোনও শক্তির হস্তক্ষেপে তাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং সারা জীবন তাদের শ্রমিক হিসাবে কাটাতে হবে না। ফলে তারা শ্রমিক সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের ব্যাপারে কিছুটা উদাসীন হয়ে পড়ে। বয়স্করা আবার শ্রমিক সংগঠনগুলির সংগ্রামী ভূমিকার ও সাফল্যের ব্যাপার নির্মোহ হয়ে সদস্যপদ ত্যাগ করে। অতএব, নেতৃবৃন্দ সদস্যদের তুলনায় সাধারণত বয়স ও অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে প্রবীণ হয়। যুবক সদস্যদের অগভীর সমালোচনা তাদের ভীতি উদ্রেকের কোনও কারণ ঘটায় না।

আরও অনেক কারণে সাধারণ সদস্যদের সাথে নেতাদের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশ দেশেই দলীয় নেতারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উঠে আসে এবং ফলত শুরুতেই তারা সাধারণ সদস্যদের তুলনায় সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিগত দিক দিয়ে উন্নততর হয়। এমনকি জার্মানীর মতো যেসব দেশে নেতৃত্বের মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, সেখানেও শ্রমিকশ্রেণী থেকে উদ্ভূত নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ সদস্যদের মধ্যে একটা ব্যবধান গড়ে ওঠে। সাধারণ সদস্যরা দৈনন্দিন ক্ষুন্নিবৃত্তির কাজে এতটাই ব্যাপৃত থাকে যে, সমাজব্যবস্থা ও রাজনীতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন তাদের পক্ষে অসাধ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু একজন নেতা শ্রমিকশ্রেণী থেকে উদ্ভূত হলেও আর্থিক দৈন্য থেকে মুক্তিলাভ করে জনজীবনের খুঁটিনাটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। ফলত তিনি সাধারণ সদস্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। সাধারণ সদস্যদের নানা কারণ ঘটিত অক্ষমতা ও নেতৃবৃন্দের বিশেষজ্ঞতা ও উৎকর্ষের জন্যই দলে গণতন্ত্র বিনষ্ট হয় ও গোষ্ঠীতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে।

মিশেল্‌সের মতে, সংগঠনের আসল কর্তৃত্ব 'বৈতনিক ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত আমলাবৃন্দে'র ('hierarchy of salaried officialdom') হাতে ন্যস্ত থাকে। এখানে মার্ক্সের সাথে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য পরিষ্কার। মার্ক্সের মতে, সম্পত্তির মালিকানা হল কর্তৃত্বের উৎস। অপরদিকে, মিশেল্‌স কর্তৃত্বের উৎস হিসাবে সাংগঠনিক আমলাতন্ত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ক্ষমতা দখল করার জন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে ভোটদাতাদের সমর্থন লাভের ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হয়। এজন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে প্রচার চালাতে হয়। দলীয় প্রচারকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হয়। এছাড়াও দল চালনার জন্য দলের আইনগত অবস্থা ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর দিকে নজর দেওয়ার দরকার হয়। দলের মধ্যে সংহতি রক্ষা ও সুসমঞ্জস পরিচালন ব্যবস্থার স্বার্থে সুসংহত দলীয় নীতি নির্ধারণও কার্যকর করতে হয়। এই সকল ক্রিয়াকলাপ সঠিকভাবে সম্পাদন করার জন্য বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞান ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন। এ সকল দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অবকাশ সাধারণ সদস্যদের থাকে না। নেতারাই দলের গণসংযোগ করা ও দলীয় তহবিল সমৃদ্ধ করার বিষয়গুলি তদারক করেন। সংসদীয় নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী বাছাই ও অন্যান্য দলীয় আনুকূল্য প্রদানের ব্যাপারে শীর্ষ নেতারাই নির্ধারক ভূমিকা পালন করেন। দলের নির্বাচনী সাফল্যকে সুনিশ্চিত করার জন্য দলের সদস্য-সমর্থন ছাড়াও অন্যান্যদের সমর্থন

সংগ্রহের কাজে নেতারাই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যমসমূহ দলীয় নেতাদের কথাবার্তা ও কার্যসমূহকে গুরুত্বদানপূর্বক ব্যাপকভাবে প্রচার করে। এই সব কিছুর সামগ্রিক ফলশ্রুতি হিসাবে দলীয় নেতাদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হয় এবং তাঁদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়।

নেতাদের এই উত্তরোত্তর অসঙ্গতভাবে ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আনুষঙ্গিক দুর্নীতি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সাধারণ সদস্যরা অবশ্য মাঝে মাঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু এই বিদ্রোহ অনেক সময়ই ব্যর্থ হয় উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাবে। এছাড়াও সদস্যরা নিজেদের মধ্যে অগ্রণী কিছু ব্যক্তির প্ররোচনাতেই সাধারণত বিদ্রোহ করে। এই অগ্রণী ব্যক্তিদের ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ সহজেই প্রলুব্ধ করে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। আর কখনও যদি এই বিদ্রোহ সফলও হয়, তখন ঐ অগ্রণী ব্যক্তিবর্গ নিজেরা ক্ষমতাসীন হয়ে আগের নেতাদের মতোই আচরণ করতে থাকে। সাধারণের অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যায়।

বিকেন্দ্রীকরণের ফলেও সাধারণ সদস্যদের অধিকার রক্ষিত হয় না বরং এর ফলে দলের মধ্যে একটি বিশাল গোষ্ঠীতন্ত্রের বদলে সেই ছোট গোষ্ঠীতন্ত্র গড়ে ওঠে। প্রত্যেকটি গোষ্ঠীতন্ত্র নিজস্ব অধিকারভুক্ত বিষয়ে যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হয়। বিকেন্দ্রীকরণের ফলে মাঝারি সারির নেতারা কেন্দ্রীয় সকল নেতৃবৃন্দের আগ্রাসী কর্তৃত্ব থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে।

তবে মিশেল্‌সের তত্ত্ব সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। এর কারণ হল যে তিনি নেতৃবৃন্দ ও মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীতান্ত্রিক শাসকদের (oligarchs) মধ্যে সঠিকভাবে পার্থক্যনির্দেশ করেননি। সমাজে সবসময়েই নেতৃবৃন্দের প্রয়োজন আছে তা দেখাতে গিয়ে তিনি কিন্তু নেতাদের সাথে মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীতান্ত্রিক শাসকদের গুলিয়ে ফেলেছেন। কীভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীতান্ত্রিক শাসকে পরিণত হয় তাও তিনি দেখাননি। তিনি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অপব্যবহারের কথা বলেছেন যার ফলে জনপ্রতিনিধিরা পরবর্তী কালে জনস্বার্থ উপেক্ষা করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করে। কিন্তু বাস্তবে এটা সবসময়েই ঘটেছে কিনা তার যাচাইয়ের মাধ্যমেই এই প্রকল্পটির সত্যতা পরীক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু মিশেল্‌স্ তা করেননি। কিন্তু কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মিশেল্‌সের তত্ত্ব রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন এবং তাঁর পূর্বসূরী প্যারেটো ও মসকার তত্ত্বের যুক্তিসম্মত পরিণতি।

২০.৫ অনুশীলনী

১। প্যারেটো কাদের 'শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ' ('elites') বলেছেন?

২। 'শৃগাল' ও 'সিংহ' বলতে প্যারোটো কী বুঝিয়েছেন?

৩। প্যারেটোর মতে কোন্ অবস্থায় শাসকগণ ক্ষমতাচ্যুত হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

৪। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফাটকা কারবারী ও নির্দিষ্ট উপার্জনভোগীদের মধ্যে প্যারেটো কীভাবে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন?

৫। প্যারেটো তত্ত্বর কী ধরনের সমালোচনা করা হয় থাকে?

৬। সমাজে আধিপত্যশীল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সম্বন্ধে মসকা কী বলেছেন?

৭। মসকা সমাজে কোন্ দু'টি শ্রেণীর অস্তিত্বের কথা বলেছেন?

৮। গণতন্ত্রের ধারণার সাথে মসকার তত্ত্ব কতটা সঙ্গতীপূর্ণ?

৯। একটি জনগোষ্ঠী শাসন করবে না শাসিত হবে—তা কীসের দ্বারা নির্ধারিত হয় বলে মসকা মনে করতেন?

১০। 'বিশিষ্টতম বলে পরিগণিত হওয়ার জন্য সংগ্রাম' বলতে মসকা কী বুঝিয়েছেন?

১১। কীভাবে শাসকশ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং নতুন শাসককুল ক্ষমতায় আসীন হয় বলে মসকা মনে করতেন?

১২। অবর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সম্বন্ধে মসকা কী বলেছেন?

১৩। সংগঠিত সংখ্যালঘুত্বের ফলে শাসকশ্রেণী অসংগঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের তুলনায় কী সুবিধা ভোগ করে বলে মসকা মনে করতেন?

১৪। সংগঠন ছাড়া আর কোন্ কোন্ কারণে সংখ্যালঘুরা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে পারে বলে মসকা অভিমত প্রকাশ করেছেন?

১৫। কীভাবে মসকার মতে শাসকশ্রেণী তাদের শাসনকে শাসিতদের কাছে গ্রহণীয় করে তোলে?

১৬। নিম্নশ্রেণীর নেতারা কখন ও কীভাবে উচ্চশ্রেণীর শাসনের অবসান ঘটাতে পারে বলে মসকা মনে করতেন?

১৭। 'গোষ্ঠীতন্ত্রের লৌহবিধির শাসন' বলতে মিশেল্‌স্ কী বুঝিয়েছেন?

১৮। কেন জনগণ নিজেদের শাসন করতে অসমর্থ বলে মিশেল্‌স্ মনে করতেন?

১৯। মিশেল্‌সের মতে দলীয় সংগঠনে কীভাবে নেতৃবৃন্দের কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হয়?

২০। দলীয় সাধারণ সদস্যদের অক্ষমতার কী কী কারণ মিশেল্‌স্ নির্দেশ করেছেন?

২১। কীভাবে মিশেল্‌সের মতে দলীয় নেতাদের সাথে সাধারণ সদস্যদের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়?

২২। দলীয় নেতারা কী কী কাজের মাধ্যমে সাধারণ সদস্যদের তুলনায় সুদৃঢ় অবস্থান লাভ করে এবং আরও ক্ষমতাসম্পন্ন ও কর্তৃত্বশালী হয় বলে মিশেল্‌স্ মনে করতেন?

২৩। দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে সাধারণ সদস্যদের বিদ্রোহের কী ফল হয় বলে মিশেল্‌স্ নির্দেশ করেছেন?

২৪। দলীয় সংগঠনে বিকেন্দ্রীকরণের কী ফল মিশেল্‌স্ নির্দেশ করেছেন?

২৫। মিশেল্‌সের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা কোথায়?

২০.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। Irving, M. Zeitlin : *Ideology and the Development of Sociological Theory.* (New Delhi : Prentice-Hall of India Pvt. Ltd. 1969)

২। Guy, Rocher : *A General Introduction to Sociology : A Theoretical Perspective.* (London : The Macmillan Press Ltd., 1972)

৩। Lewis, A. Coser : *Masters of Sociological Thought.* (Jaipur : Rawat Publications, 1996)

একক ২১ □ রাজনৈতিক সংস্কৃতি

গঠন

২১.০ উদ্দেশ্য

২১.১ প্রস্তাবনা

২১.২ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা

২১.২.১ রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত কিছু বক্তব্য

২১.৩ রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি

২১.৪ রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক

২১.৪.১ রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণীবিভাগ

২১.৪.২ মিশ্র রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও তার প্রকারভেদ

২১.৫ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তি বা নির্ধারকসমূহ

২১.৫.১ রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপাদান

২১.৫.২ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও প্রতীক

২১.৬ রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্ব

২১.৭ সারাংশ

২১.৮ অনুশীলনী

২১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য হল আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা এবং তার বিভিন্ন দিকের সঙ্গে আপনার পরিচয় স্থাপন। এটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন—

- রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের ধারণা
- রাজনৈতিক সংস্কৃতির কিছু বিশেষত্ব?
- রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক (dimension), রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণীবিভাগ (classification), মিশ্র রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং তার প্রকারভেদ (types)
- রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তি, রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপাদান, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও প্রতীক
- রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্ব

২১.১ প্রস্তাবনা

বৈধতা অর্জনের জন্য যে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং সেই কর্তৃত্বের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ও ইতিবাচক সমর্থনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিবেশ প্রয়োজন। কোনও কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই দৃষ্টিভঙ্গীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়, কোথাও কোথাও আবার এই দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব দেখা যায়। তাই প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নাগরিকেরা কোথাও নিঃশর্তে সমর্থন করেন ও প্রয়োজনীয় আনুগত্য দেখান। কোথাও আবার নাগরিকেরা রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী। এর থেকে আপনারা সহজেই বুঝবেন যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র জানার জন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসৃত হয়। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

আগের অনেক লেখক জাতির রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেভাবে চলে তার কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তাঁরা সকলেই সেই জাতির সদস্যদের বিশ্বাস, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর আলোকপাত করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীসের রাজনীতিচর্চা ও মন্টেস্কু, টকভিল ও বেজহটের লেখার উল্লেখ করা যায় তবে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বিংশ শতকেই শুরু হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার উদ্দেশ্যে গ্যাব্রিয়েল এ. অ্যালমন্ড সর্বপ্রথম রাজনৈতিক সংস্কৃতি কথাটি ব্যবহার করেন।

২১.২ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা

অ্যালান বল মনে করেন যে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি কথাটির কোনও প্রকৃত সংজ্ঞা পাওয়া কঠিন। তবে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজনৈতিক সংস্কৃতির যেভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা আপনাদের জানাই।

গ্যাব্রিয়েল এ অ্যালমন্ড ও জি. বিংঘাম পাওয়েলের মতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের মধ্যে রাজনীতির প্রতি ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতার ধরন। অ্যালান বল মনে করেন যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্বাস, ভাবাবেগ ও মূল্যবোধকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলা হয়। সিডনি ভার্বা রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে অভিজ্ঞতামূলক বিশ্বাস, সুস্পষ্ট প্রতীক ও মূল্যবোধের ধারক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। সেগুলি যে পরিবেশে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সংগঠিত করে, তার সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা দেয়। লুসিয়ান পাইয়ের মতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল কতকগুলি দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্বাস ও অনুভূতির সমষ্টি যা রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে অর্থবহ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তোলে। বুবলাটস্কি মনে করেন যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী, সামাজিক স্তর ও রাজনৈতিক ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের জ্ঞান ও অনুভূতির ধরন এবং তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াশীলতার তারতম্য।

২১.২.১ রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য

রাজনৈতিক সংস্কৃতি ক্রিয়াকলাপকেন্দ্রিক নয়, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসকে বোঝায়। রাজনীতির জগতে কী ঘটছে তার বদলে সেই ঘটনাবলী সম্বন্ধে জনগণের কী দৃষ্টিভঙ্গী ও তার আলোচনাই হল রাজনৈতিক সংস্কৃতি। এই দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন রকমের হতে পারে; বাস্তব রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে

অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা বা বিশ্বাস হতে পারে, রাজনৈতিক জীবনে অনুসরণযোগ্য লক্ষ্য বা মূল্যবোধসংক্রান্ত ধারণা বা বিশ্বাস হতে পারে। এগুলি আবেগমূলকও হতে পারে, উপলব্ধিমূলকও হতে পারে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের হস্তক্ষেপ থাকতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি পুরোপুরি উদ্দেশ্যমূলকভাবে সৃষ্ট। প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি সচেতনভাবে অনুভূত নাও হতে পারে। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের আওতার বাইরে বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবেও রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত সম্পর্কের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সৃষ্ট হয়। তাই রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে, যা পুরোপুরি সরকার-নিয়ন্ত্রিত ও স্থিরীকৃত ব্যবস্থায় রাখা যায় না।

রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে রাজনীতির মনস্তত্ত্বমূলক মাত্রা বলা যায়। এটির একটি বিষয়ীগত পরিধি আছে, যা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে অর্থবহ ও সুদৃঢ় করে। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আদর্শ ও কার্যকরী ধারা উভয়ই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। রাজনৈতিক সংস্কৃতি উদ্দেশ্যহীন নয়, সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারার প্রতিফলন, যে ধারা সুবিন্যস্ত এবং যার বিভিন্ন দিক পরস্পরকে শক্তিশালী করে।

শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জ্ঞানের মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয় না। রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতনতাই রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র স্পষ্ট করে তোলে। এ প্রসঙ্গে অ্যালান বল ব্রিটেনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে লর্ডসভা ও রাজতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা, সামাজিক দিক থেকে উচ্চতর শ্রেণীর ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শিতা ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, সাধারণ মানুষরা যে উচ্চতর শ্রেণীর লোকদের এবং লর্ডসভা ও রাজতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তা ব্রিটেনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম অংশ।

রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যদি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে একই ধরনের মনোভাব কাজ করে, তবে সেখানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দেখতে পাওয়া যায়। যেখানে মতৈক্য দুর্বল, সেখানে বিশৃঙ্খলা বা বিপ্লব ঘটতে পারে। মতৈক্য সামাজিক উদ্দেশ্য সংক্রান্ত বিষয় এবং সেই উদ্দেশ্য অভিমুখে পৌঁছানোর পদ্ধতি—এই দুই বিষয়েই থাকা প্রয়োজন। পৃথিবীর যে কোনও বিপ্লবকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল রাজনৈতিক মতৈক্যের অনুপস্থিতির জন্য। বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এখন যে অস্থিরতা দেখা যায়, তার মূলে আছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে মতৈক্যের অনুপস্থিতি।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি অপরিবর্তিত থাকে না। সমাজের সংস্কৃতিগত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক সংস্কৃতিও অবিরত পুনর্বিন্যস্ত হতে থাকে। বসবাসের জন্য বহির্দেশীয়দের ব্যাপকহারে আগমন, বিপ্লব, যুদ্ধ, যুদ্ধে পরাজয় বা অন্য কোনও রকমের বৃহৎ পরিবর্তনের ফলে কোনও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হতে পারে। তার ফলে রাষ্ট্রের সরকার ও নীতিতেও পরিবর্তন দেখা যায়। ফরাসী বিপ্লবের পর ফ্রান্সে বা বলশেভিক বিপ্লবের পর পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে অনুরূপ পরিবর্তন ঘটেছিল। যুদ্ধে পরাজয়ের পর বিজিত রাষ্ট্রের ওপর বিজয়ী রাষ্ট্র তার রাজনৈতিক মূল্যবোধ চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে। ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বরাজনীতিতে তার প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে তার অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে। এই দেশগুলিকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব চালান করার চেষ্টা করেছে। ফলে, সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলির রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে মার্কিন প্রভাব কিছু পরিবর্তনের সূচনা করেছে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে

নতুন মূল্যবোধ বা মনোভাবের সামঞ্জস্য সাধনের ক্ষেত্রে সাফল্য ও ব্যর্থতার ওপর রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি কোনও অবশিষ্ট ব্যাখামূলক প্রকৃতিযুক্ত (Residual Explanator Category) নয়। এর মধ্যে যে ঘটনাবলীর কথা বলা হয় সেগুলি চিহ্নিত করা যায় এবং অনেকাংশে তাদের পরিমাপও করা যায়। জনমত ও দৃষ্টিভঙ্গীগত সমীক্ষা হল প্রাথমিক ধাপ, যার সাহায্যে বড় গোষ্ঠীর রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরীক্ষা করা যায়। বিভিন্ন সাক্ষাৎকার ও মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যক্তিগত ঘটনা সম্বন্ধে পরিসংখ্যান দিতে পারে। সরকারি বক্তব্য, বক্তৃতা, লেখা, অতিকথা (Myth) ও লৌকিক উপাখ্যান (Legend) রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারার প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করে। তাছাড়াও রাজনৈতিক আচরণ থেকেও রাজনৈতিক সংস্কৃতিগত দৃষ্টিভঙ্গী জানা যায়।

তবে জনমত ও দৃষ্টিভঙ্গীগত সমীক্ষা, সরকারি বক্তব্য, রাজনৈতিক আচরণ ইত্যাদি থেকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি নির্ধারণে নানা সমস্যাও দেখতে পাওয়া যায়। জনগণ তাদের প্রতিক্রিয়া অনেক সময় লুকিয়ে রাখে। যোগাযোগ ও ব্যাখ্যাসংক্রান্ত সমস্যাও গভীর। রাজনৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে নানা ধরনের উপাদান সংযুক্ত। তাদের পৃথক করা খুবই কঠিন। তবুও রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে যতদূর সম্ভব নির্ভরযোগ্য তথ্যসংগ্রহের প্রচেষ্টা অবশ্যই করা উচিত, কারণ তা রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

অনুশীলনী - ১

১। রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে চারজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর ধারণা লিখুন।
(৪ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ হবে)

২। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণাটিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন।
(১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ হবে)

২১.৩ রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি

অধিকাংশ রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই নানা ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব দেখতে পাওয়া যায়। ভাষাগত পার্থক্য, আঞ্চলিক গোষ্ঠীগত মনোভাব, শিক্ষার স্তর, জাতিগত সদস্যপদ, ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধগত পার্থক্য থাকে। তাই অ্যালান বল বলেছেন যে, স্থিতিশীল সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সমজাতীয় নয়। যেখানে একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য খুবই প্রকট, সেখানে রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি দেখতে পাওয়া যায়। যখন কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ধরন অন্যদের থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করা যায়, তখন তাকে রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি বলে। অ্যালমন্ড এবং পাওয়েলের মতে, প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নির্দিষ্ট এক ধরনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পৃথকভাবে প্রতীয়মান হলে তাকে রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। অ্যালান বলের অভিমত অনুসারে, উপসংস্কৃতি বলতে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ধরনকে বোঝায় না; এক বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীকে বোঝায়, যার কিছু কিছু অন্যান্য উপসংস্কৃতির সঙ্গে সমজাতীয়। অর্থাৎ কিছু কিছু আবার সমজাতীয় নয়। ফরাসী কানাডীয়রা উপসংস্কৃতির একটি উদাহরণ। তারা মনে করে

যে, কানাডার প্রতি সামগ্রিক আনুগত্যের থেকে তাদের গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এই দৃষ্টিভঙ্গী খুবই প্রবল হওয়ায় কুইবেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন খুবই শক্তিশালী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণকায় নিগ্রোরা রাজনৈতিক উপসংস্কৃতির উদাহরণ।

যে কোনও দেশের রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি সম্বন্ধে ধারণা ছাড়া সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি অনুধাবন অসম্ভব হয়ে পড়ে। তৃতীয় বিশ্বের অনেক বিকাশশীল দেশে রাজনৈতিক উপসংস্কৃতির সমস্যা খুবই প্রবল। অঞ্চল, ধর্ম, সামাজিক শ্রেণী, জাতি, ভাষা, প্রজন্ম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে সেখানে নানা ধরনের উপসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষেও জাতি, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে উপসংস্কৃতিগত পার্থক্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার তাৎপর্যপূর্ণ দিক। শিখ উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ বা বিভিন্ন অঞ্চলের গোষ্ঠীগত বা আঞ্চলিক মনোভাব ও আন্দোলন ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার গতিবিধির অনুধাবনের ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যবহ।

সাধারণত উপসংস্কৃতি সমাজের প্রধান কাঠামোগত ব্যবস্থাকে বাধা দেয় না। কর্তৃত্বমূলক সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ প্রশ্নে পৃথক ধারণা করে। এর ফলে সাধারণত রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিচালকদের কোনও অসুবিধা হয় না। তারা মূল্যের পুর্নবণ্টনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করতে পারে। কিন্তু যদি উপসংস্কৃতি মূল কাঠামোগত ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করে, তাহলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হয়। তখন রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বলপ্রয়োগ দ্বারা অবস্থা আয়ত্বে আনতে বাধ্য হয়। এর ফলে সমাজে অস্থিরতা ও উত্তেজনা দেখা দেয়। ভারতে ভাষাগত বা আঞ্চলিক বিভিন্ন অপসংস্কৃতিগত গোষ্ঠী মাঝে মাঝে এরূপ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আবার কোথাও কোথাও প্রধান রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল কোনও জাতিগোষ্ঠীর উপসংস্কৃতি। যেমন, ইথিয়োপিয়ায় প্রধান রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল সেখানকার একটি বিশেষ গোষ্ঠী আমহারাটেদের উপসংস্কৃতি।

অনুশীলনী - ২

১। রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়?

(১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনারা উত্তর সীমাবদ্ধ হবে)

২১.৪ রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক (Dimensions)

আপনারা আগেই দেখেছেন যে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল কিছু দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতা, যা একটি সমাজের জনগণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনুভব করে। অ্যালমন্ড এবং পাওয়েলের মতে, এই মানসিকতার তিনটি দিক (Dimensions) আছে ঃ-

(১) জ্ঞান বা ধারণাসংক্রান্ত দিক (Cognitive Orientations)—এর অর্থ হল রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয় বা রাজনৈতিক বিশ্বাস সংক্রান্ত নির্ভুল ধারণা বা জ্ঞান। একজন ব্যক্তির সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকলাপ, যেমন তাঁরা কী ধরনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদান করেন, সরকারি নীতি কী ধরনের বা সমসাময়িক সমস্যাগুলি কী কী, এ সংক্রান্ত সঠিক জ্ঞান বা ধারণা থাকতে পারে। এই জ্ঞান বা ধারণা হল রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রথম দিক।

(২) প্রভাবী দিক (Affective Orientation)—এর অর্থ হল রাজনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অনুভূতি, যেমন রাজনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকা বা একাত্মবোধ করা বা রাজনৈতিক বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করা। ব্যক্তির রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য বা ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যানের অনুভূতি হল রাজনৈতিক সংস্কৃতির দ্বিতীয় দিক।

(৩) মূল্যায়নমূলক দিক (Evaluative Orientation)—এর অর্থ হল রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে বিচার বা মতামত, অর্থাৎ রাজনৈতিক বিষয় বা ঘটনার মূল্যমান বিচার বা মূল্যায়ন। যে কোনও ব্যক্তি রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল্যায়ন করতে পারে। গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে বিচার করে সে রাজনৈতিক ব্যবস্থাটিকে রাজনৈতিক চাহিদার প্রতি যথোপযুক্ত দায়িত্বশীল মনে না করতে পারে। তার নৈতিক বিচার অনুসারে সে সরকারি অসাধুতা বা স্বজনপ্রীতির নিন্দা করতে পারে। এই বিচার হল রাজনৈতিক সংস্কৃতির তৃতীয় দিক।

যে কোনও রাজনৈতিক বিষয়ের ওপর ব্যক্তিগত মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গীকে এই তিনটি দিকের ভিত্তিতে বিচার করা যায়। তিন ধরনের দিকই আবার পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং একই ব্যক্তির রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয়ের বিচারের ক্ষেত্রে তিনটি দিক নানাভাবে মিশ্রিত হতে পারে। জনগণের মধ্যে বিভিন্নভাবে বর্তমান এই দিকগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যপ্রণালীকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর চাহিদা, সমর্থনের জন্য ব্যবস্থা, আইনের মান্যতা, ব্যক্তির ব্যবহার ও রাজনৈতিক ব্যবহারের ধরন, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা এবং রাজনৈতিক ঘটনার পূর্বসংকেত প্রদানের ক্ষেত্রেও এই তিনটির গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত এই তিনটি দিক যে কোনও রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত হতে পারে যেমন—

(ক) সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা—জনগণের সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান, অনুভূতি ও মূল্যায়ন থাকে এবং এগুলি জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বিকাশে সাহায্য করে। এজন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার দৈহিক সদস্যপদই যথেষ্ট নয়, মানসিকভাবেও সদস্য হওয়া প্রয়োজন।

(খ) রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপকরণ—উপাদান প্রক্রিয়া (Input-Output Process) সম্বন্ধে জনগণের জ্ঞান, অনুভূতি ও বিচার থাকে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের চাহিদাগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রবাহিত হয়ে কর্তৃত্বমূলক নীতিতে রূপান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল, স্বার্থগোষ্ঠী, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, গণমাধ্যম ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(গ) আমলা, বিচারব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাঠামো, ভূমিকা এবং ঐ ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী সম্বন্ধে জনগণের জ্ঞান, অনুভূতি ও মূল্যায়ন থাকে, কারণ এদের কাজ হল কর্তৃত্বমূলক সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করা।

(ঘ) রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক অভিনেতা (Political Actor) হিসাবে ব্যক্তির নিজের ভূমিকা এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের ভূমিকা সম্বন্ধেও ব্যক্তির জ্ঞান, অনুভূতি ও বিচার প্রযুক্তি হয়।

(ঙ) বিশেষ রাজনৈতিক নীতি ও প্রশ্ন সম্বন্ধে জনগণের জ্ঞান, অনুভূতি ও বিচার থাকে।

অনুশীলনী - ৩

১। রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক তিন ধরনের দিক কী কী? এগুলির গুরুত্ব আছে কী?

(১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ হবে)

২১.৪.১ রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণীবিভাগ

এই পাঁচ ধরনের রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে তিন ধরনের দিক বিচার করে সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতি জানতে পারা যায়। এই দিকগুলির প্রকৃতি এবং অস্তিত্ব এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে পৃথক হয়। তাই

রাজনৈতিক সংস্কৃতিও সবদেশে এক হয় না। সমাজের সদস্যরা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে কিনা, সরকারি ক্রিয়াকলাপ থেকে উপকার আশা করে কিনা, সরকারের সঙ্গে একাত্মবোধ করে কিনা, অথবা সমাজে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা দেখা যায় কিনা, জনগণ সরকারি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ আশা করে কিনা বা সরকারি কার্যকলাপ সম্বন্ধে জানতে পারে কিনা—এই প্রশ্নগুলির ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণীবিভাগ করা যায়। অর্থাৎ, উপকরণ-উৎপাদান প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর বণ্টন, রাজনৈতিক বিষয়গুলির সম্পর্কে অবহিত থাকা বা না থাকা এবং ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপে রাজনৈতিক বিষয়গুলির গুরুত্বের ভিত্তিতে যে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থার চিহ্নিতকরণ ও বৈশিষ্ট্যকরণ (Characterisation) করা যায়। অ্যালমন্ড ও ভার্বা তিন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির উল্লেখ করেছেন। যথা—

(১) অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতি **(Participatory Political Culture)**—এই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ব্যক্তি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকে, উপকরণ কাঠামো ও প্রক্রিয়ার প্রতি ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন হয়, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সমালোচনা করে এবং প্রয়োজন অনুসারে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করার অধিকার ভোগ করে। অর্থাৎ, এখানে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, ব্যবস্থা, উপকরণ-উৎপাদন কাঠামো ও ব্যক্তির রাজনৈতিক ভূমিকা সংক্রান্ত ধারণাগত, প্রভাবী ও মূল্যায়ন মূলক দিকগুলি খুবই উচ্চমানের। উদাহরণ হল ব্রিটেন, স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও আমেরিকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা।

(২) অধীনস্থ বা শাসিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি **(Subject Political Culture)**—এই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি ব্যক্তির ইতিবাচক মনোভাব থাকে এবং ব্যবস্থার উৎপাদন (Output) যেমন, কল্যাণকর আইনব্যবস্থা, সুযোগসুবিধা ইত্যাদি তাদের জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে তাও বুঝতে পারে, কিন্তু তারা উপকরণ (Input) কাঠামোতে অংশগ্রহণ করতে পারে না। ফলে, রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তাদের সক্রিয় ভূমিকা থাকে না। উপকরণ কাঠামোতে ধারণাগত, প্রভাবী ও মূল্যায়নমূলক ভূমিকা না থাকায় জনগণ শাসকগোষ্ঠীর ও আমলাদের নির্দেশ মেনে চলে ও সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তারা বাস্তব সত্য হিসাবে মেনে নেয়, তাকে পরিবর্তনের ক্ষমতা তাদের থাকে না। রাজনৈতিক অভিনেতা (Actor) হিসাবে নিজের সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকে না। এখানে ব্যক্তির ভূমিকা পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়। সে এই ব্যবস্থাকে কোনওভাবেই প্রভাবিত করতে পারে না এবং ব্যবস্থার কর্তৃত্বমূলক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে পারে না। সে মনে করে যে, তার ভূমিকা হল ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা, পরিবর্তনের প্রচেষ্টা করা নয়। পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং বিংশ শতকে স্বাধীন এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেখা যায়।

(৩) সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি **(Parochial Political Culture)**—এখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে জনগণের সামান্য কোনও জ্ঞান বা ধারণা (Cognition) থাকে না। সুতরাং, প্রভাবী বা মূল্যায়নের (Affective and Evaluative) প্রচেষ্টাও থাকে না। ব্যক্তি তার প্রয়োজনের সময় শুধুমাত্র নিজ পরিবার, জনসম্প্রদায় বা নিজ প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে উদাসীন থাকে। এই জাতীয় জনগণ আধুনিক পশ্চিমী সমাজে দেখা যায় না। বস্তুত আধুনিক সমাজেই তারা দুষ্প্রাপ্য। কোনও কোনও পরিবর্তনশীল (Transitional) সমাজের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতিযুক্ত বৃহৎ বা ক্ষুদ্র আঞ্চলিক গোষ্ঠী পাওয়া যেতে পারে, যারা জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা দ্বারা কোনওভাবেই প্রভাবিত নয়। উদাহরণ হল ভারতের সাবেকী গ্রাম্যসমাজ। এখানে এমন ব্যক্তিদের দেখা পাওয়া যেতে পারে, যারা ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে পুরোপুরি অজ্ঞ। দৃষ্টিভঙ্গী শুধুমাত্র গ্রামীণ পুরোহিত বা আঞ্চলিক নেতাদের পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে ওঠে—যারা একই সঙ্গে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে।

২১.৪.২ মিশ্র রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও তার প্রকারভেদ

রাজনৈতিক ব্যবস্থার এই তিন ধরনের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে ভাগ করা যায়। কিন্তু এগুলি হল আদর্শ ধরন—কোথাও অবিকৃতভাবে এগুলির অস্তিত্ব দেখা যায় না। নাগরিকরা কোথাও একভাবে আচরণ করে না। তাই রাজনৈতিক সংস্কৃতি কোথাও সমসত্ত্ববিশিষ্ট বা সমজাতীয় (Homogeneous) নয়। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বহু নাগরিক থাকতে পারে, যারা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। আবার কিছু নির্লিপ্ত নাগরিকও সেখানে দেখা যেতে পারে। বহু ব্যক্তি সরকারি নিয়ম বিনা প্রতিবাদে মেনে চলে, অনেকে আবার তার সমালোচনায় মুখর থাকে। অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতিতেও অনেক ব্যক্তি থাকতে পারে যারা অধীনস্থ বা শাসিত মনোভাবযুক্ত, অর্থাৎ প্রায় সব সমাজেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি মিশ্র আকারের।

তিনটি শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিতে রবার্ট স্কট ১৯১০ ও ১৯৬০-এ মেক্সিকোর রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন আলোচনা করেছেন। ১৯১০-এ মেক্সিকোর অধিবাসীদের ৯০% ছিল সংকীর্ণ (Parochial) ৯% অধীনস্থ (Subject) এবং ১% অংশগ্রহণকারী (Participant) । ১৯৬০-এ এই সংখ্যাগুলি ছিল যথাক্রমে ২৫%, ৬৫% এবং ১০%।

বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের গুরুত্বের তারতম্য থেকে সামগ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিগত পরিবেশ ঠিকমত বোঝা যায়। এই তিন ধরনের শ্রেণীবিভাগের বিভিন্ন একত্রিতকরণ অনুসারে রাজনৈতিক কাঠামোকে পুনরায় শ্রেণীবিভাগ করা যায়। তাই অ্যালমন্ড ও ভার্বা চার ধরনের মিশ্র বা মিশ্রিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির কথা বলেন।

(১) সংকীর্ণ অধীনস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Parochial Subject Political Culture)—এখানে ব্যক্তি সরকারি ভূমিকার বিভিন্ন ধরন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, কিন্তু বিভিন্ন উপায়ে কীভাবে সে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে সে সম্বন্ধে অজ্ঞ। তা ছাড়াও রাজনৈতিক অভিনেতা (Actor) হিসাবে নিজের সম্বন্ধে তার ধারণাও খুবই অস্পষ্ট ও অবিকশিত। উপকরণ (Input) কাঠামোকে ভালোভাবে বোঝানো হয় না।

(২) অধীনস্থ অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Subject Participant Political Culture)—এখানে কোনও কোনও ব্যক্তি রাজনৈতিকভাবে খুবই সচেতন ও সক্রিয়, কিন্তু বাকিরা নিষ্ক্রিয়। প্রথমোক্তরা বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীযুক্ত। তারা জানে যে, তাদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। আবারও এও জানে যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ কম। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে অধীনস্থ অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলা যায়। এখানে আশা করা হত যে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে নাগরিকরা নিজেদের যুক্ত করবে এবং সোভিয়েত সরকারের কার্যাবলী সম্বন্ধে সজাগ থাকবে। নাগরিকদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীতে সংযুক্ত থাকার জন্য উৎসাহিত করা হত। অথচ, একই সময় শাসকগোষ্ঠী শাসিতদের থেকে আনুগত্য ও সরকারি নির্দেশের প্রতি ঐক্যমত আশা করত।

(৩) সংকীর্ণ অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Parochal Participant Political Culture)—এখানে উপকরণ (Input) কাঠামো প্রধানত আঞ্চলিক, যেমন উপজাতীয় বা জাতি-সংগঠন, যদিও উপকরণ কাঠামো খুবই উন্নত। কিন্তু উপকরণ-উৎপাদন উভয় কাঠামোই সংকীর্ণ স্বার্থের চাপ বিশিষ্ট হওয়ায় জাতীয় অংশগ্রহণকারী সংস্থা হিসাবে তাদের কার্যাবলী খুবই প্রভাবিত হয়।

(৪) পৌর সংস্কৃতি (Civic Culture)—এর মধ্যে তিনটি আদর্শ রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংযুক্ত। অধীনস্থ মানসিকতা থাকায় সমাজের গণমান্য শ্রেণী যথেষ্ট উদ্যম ও স্বাধীনতার সঙ্গে কাজ করতে পারে। অন্যদিকে অংশগ্রহণকারী মানসিকতা থাকায় গণমান্য শ্রেণী জনগণের পছন্দ অনুসারে কাজ করতে বাধ্য হয়। অ্যালমন্ড ও ভার্বার মতে, ব্রিটেন ও আমেরিকার রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল পৌর সংস্কৃতির পরিপূর্ণ রূপ।

অনুশীলনী - ৪

১। রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণীবিভাগ কীভাবে করা যায়?
(১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে উত্তর সীমাবদ্ধ করুন)

২। মিশ্র সংস্কতি কী? মিশ্র সংস্কৃতির ধরনগুলি কী কী?
(১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে উত্তর সীমাবদ্ধ করুন)

২১.৫ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তি বা নির্ধারকসমূহ

রাজনৈতিক সংস্কৃতি সমজাতীয় বা মিশ্র, যাই হোক না কেন তা বিভিন্ন উপাদানের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। উপাদানগুলি সংখ্যায় অনেক এবং তাদের সম্পর্কও নিবিড়। এই ভিত্তিতে উপাদানগুলিকে রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তি বা নির্ধারকও বলা যায়। নির্ধারকগুলি হল ঃ—

(১) ঐতিহাসিক বিকাশের ধারা—যে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর দেশের ঐতিহাসিক বিকাশের ধারার প্রভাব অনস্বীকার্য। নিরবচ্ছিন্নতা বা বিচ্ছিন্নতা যে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গে অ্যালান বল আলোচিত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক বিকাশের ধারার পর্যালোচনা উল্লেখযোগ্য। গ্রেট ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের সঙ্গে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর এক অভিনব সমন্বয় ব্রিটেনের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য। রক্ষণশীল ইংরেজ জাতির ঐতিহ্যবোধ ও সাবেকী মূল্যবোধের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং শিল্পোন্নত সমাজের আধুনিক মূল্যবোধের মিশ্রণ ঘটেছে। কোনও বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই ব্রিটেনের সাবেকী অভিজাততান্ত্রিক কাঠামো শহুরে শিল্পোন্নত সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

অথচ ফ্রান্সের ঐতিহাসিক বিকাশ ভিন্ন ধরনের। ১৭৮৯-এ সংগঠিত ফরাসী বিপ্লব তৎকালীন ফ্রান্সের প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামো, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটায়। নিরবচ্ছিন্নতার বদলে বিচ্ছিন্নতা ফ্রান্সের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। ফরাসী বিপ্লবজাত নতুন বৈপ্লবিক মূল্যবোধ বিশ্বাসকেই ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের রাজনৈতিক সংঘাতের কারণ বলা যায়।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল প্রধানত ব্রিটেনের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন করার প্রচেষ্টা। এই যুদ্ধ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সম্বন্ধে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করে, যা পরবর্তীকালে আমেরিকার সংবিধানে গৃহীত হয়। ফলে এখানে অতীতের সঙ্গে যোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন হয় নি। অথচ স্বাধীনতা যুদ্ধের পর সাম্যমূলক ও প্রতিযোগিতামূলক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে স্থায়ী রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই ব্যবস্থা পরবর্তীকালে শিল্পায়ন ও ব্যাপক অভিবাসনের (Immigration) ফলেও পরিবর্তিত হয় নি।

(২) ঔপনিবেশিক শাসন—রাজনৈতিক সংস্কৃতির কাঠামো নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব প্রতিক্রিয়াকে অস্বীকার করা যায় না। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন নতুন রাষ্ট্রের ওপর দীর্ঘকালীন ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসন সেই রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানকে প্রভাবিত করেছে। শাসকগোষ্ঠী প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা উপনিবেশগুলির অধিবাসীদের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে এবং সেগুলি সম্বন্ধে তাদের মধ্যে কিছুটা সহমতও দেখা যায়। ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসকের কাছ থেকেই গৃহীত হয়েছে।

(৩) ভৌগোলিক অবস্থান—ভৌগোলিক অবস্থান যে কোনও দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। ব্রিটেনের জলবেষ্টিত দ্বীপ-অবস্থান ব্রিটেনের বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ আমেরিকা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব প্রদান করেছে।

(৪) জাতিগত বিভিন্নতা—দেশবাসীর মধ্যে জাতিগত বিভিন্নতা রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। তবে জাতিগত বিভিন্নতার প্রভাব সব জায়গায় একরকম হয় না। জাতিগত পার্থক্য ব্রিটেনে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নানা জাতের মানুষ বসবাস করলেও সকলে মার্কিন জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। তারা নিজেদের মার্কিনী হিসাবে ভাবে এবং মার্কিন সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখায়। জাতিগত পার্থক্য ও উপজাতির আনুগত্যের প্রভাব অনেক দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নানা সমস্যা সৃষ্টি করেছে। জাতিগত প্রবণতা প্রবল হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আনুগত্য জাতীয় সরকারের বদলে নিজ জাতির প্রতি প্রদর্শিত হয়। জাতিগত ভিত্তিতে পররাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য সৃষ্ট হলে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উত্তেজনা ও অস্থিরতা দেখা দিতে পারে।

(৫) ধর্ম—আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞান ও শিল্পায়নের বিকাশ সত্ত্বেও এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও এমন সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় যেখানে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও ধর্মের সম্পর্ক খুবই গভীর। প্রধানত উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং ধর্মের রাজনীতিকরণ হয়েছে। ধর্মকে বাদ দিয়ে এই দেশগুলির রাজনৈতিক সংস্কৃতি আলোচনা সম্পূর্ণতালাভ করে না।

(৬) আর্থসামাজিক কাঠামো—আর্থসামাজিক কাঠামো রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম নির্ধারক। শহরকেন্দ্রিক ও শিল্পভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থায় শিক্ষা ও রাজনৈতিক যোগাযোগ বেশী থাকে। বিভিন্ন ধরনের স্বার্থগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তাই এই ধরনের সমাজের জনগণ অধিকমাত্রায় রাজনীতি-সচেতন, প্রগতিশীল উদারমনোভাবযুক্ত ও পরিবর্তনের পক্ষপাতী হন। সরকারি নীতি নির্ধারণেও তাঁরা অধিকমাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা ও রাজনৈতিক যোগাযোগ কম। জনগণ মূলত কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই এই ধরনের সমাজে রক্ষণশীলতা ও পরিবর্তন বিরোধী প্রবণতা দেখা যায়। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের হারও সেখানে কম।

(৭) রাজনৈতিক মতাদর্শ—আধুনিক কালের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দেশের জনগণের রাজনীতি সংক্রান্ত মনোভাব, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়। তাই রাজনৈতিক মতাদর্শকে রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম নির্ধারক বলা যায়। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর শ্রেণীকাঠামোর প্রভাব অনস্বীকার্য। শ্রেণীগত অবস্থানের ওপর ব্যক্তির চেতনার প্রকৃতি নির্ভর করে। বিভিন্ন দেশের শ্রেণীকাঠামো বিভিন্ন রকম। তাই বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিও বিভিন্ন ধরনের হয়।

২১.৫.১ রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপাদান

রাজনৈতিক সংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে অ্যালান বল দু'ধরনের উপাদানের কথা বলেছেন ঃ-

(১) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি ব্যক্তিদের মনোভাব—রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উৎসের প্রতি সমর্থনসূচক মনোভাব রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করে এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করে। গ্রেট ব্রিটেনে রাজনৈতিক নেতাদের ওপর দেশবাসীর গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা দেখা যায়। মনে করা হয় যে, নেতারা জনস্বার্থেই কাজ করে—বিশেষ কোনও স্বার্থগোষ্ঠীর স্বার্থে নয়। মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনীতিবিদদের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা অনেক কম, তবে এই শ্রদ্ধার অভাব মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অস্থিতিশীলতার কারণ হয় নি।

(২) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভূমিকা—স্থিতিশীল উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সরকারি কার্যাবলীর সীমাবদ্ধতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব থাকে। আবার সরকারি কাজের মাধ্যমে ব্যক্তির কল্যাণও আশা করা হয়। সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা

আর্থসামাজিক বিকাশের স্তর ও শিক্ষার বিকাশের হারের সঙ্গে সংযুক্ত। শিক্ষার মান উন্নত হলে নাগরিকের নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। শিল্পায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নতি ও এই সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সচেতনতা বাড়লে সরকারি কাজ সম্বন্ধে জনগণের সতর্কতা বৃদ্ধি পায়, রাজনৈতিক অংশগ্রহণও বৃদ্ধি পায়। জনগণের নিজেদের সম্পর্কে সামর্থ্যের চেতনা বৃদ্ধি পেলে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সন্তুষ্টি ও ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য বাড়ে। ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈধতা ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

২১.৫.২ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও প্রতীক

যে কোনও সমাজে রাজনৈতিক মূল্যবোধ, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। যেমন জাতীয় পতাকা বা জাতীয় সংগীত ভারতীয় সংবিধানে প্রতীক হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের প্রতীকী মূল্য সকলেই স্বীকার করেন। আমেরিকার রাষ্ট্রপতির সক্রিয় ভূমিকা থাকলেও রাষ্ট্রপতি পদটি জনগণের কাছে প্রতীক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতীকগুলি প্রতিষ্ঠানের আদর্শমূলক উপাদানের প্রকাশ। জনগণের সামর্থ্যের স্তর বা রাজনৈতিক জ্ঞানের স্তরের সঙ্গে প্রতীকগুলির কোনও ওতপ্রোত সম্বন্ধ নেই। কিন্তু প্রতীকের মাধ্যমে জনগণের আবেগ অনুভূতি ব্যক্ত হয় এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। সমস্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই প্রতীকের ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

কোনও কোনও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ধর্মনিরপেক্ষ প্রতীকের বদলে ধর্মীয় প্রতীকও ব্যবহার করা হয়। কোথাও কোথাও জনগণের মধ্যে জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টির জন্য কোনও ধর্মগুরুর ভূমিকার ওপর জোর দেওয়া হয়। প্রত্যেক জাতির জীবনে কিছু প্রাচীন গৌরব কাহিনী থাকে, যেগুলি জাতির মহত্ত্বের পরিচায়ক। অতীত সম্পর্কে এই সকল কাহিনী কখনও অসত্য, কখনও অর্ধসত্য হয়ে থাকে। অতীতের অবিশ্বাস্য কাহিনী বা অতিকথা রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্রিটেনের এলিজাবেথের রাজত্বকাল সম্ভবন্ধে অতিকথা ইংরেজ জাতির জীবনে মহত্ত্ব ও গৌরব সঞ্চার করে।

প্রতীক বিমূর্ত ধারণাকে বাস্তবায়িত করে এবং প্রাধান্যকারী রাজনৈতিক মূল্যবোধকে প্রকাশিত করে। রাজনৈতিক প্রতীকের সঙ্গে যুক্ত আবেগ উচ্ছ্বাসকে কাজে লাগিয়ে সরকার প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের সমর্থনসূচক মনোভাব জাগরণের প্রচেষ্টা করে। প্রতীকের মাধ্যমে সরকার তার বৈধতা প্রতিষ্ঠা করে এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার চেষ্টা করে। যে সমস্ত জাতি বা রাষ্ট্র ব্যাপক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে প্রতীকের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নতুন প্রতীকের মাধ্যমে পূর্বতন সরকারের স্মৃতিকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা চলে, নতুনভাবে জাতীয় ইতিহাস লিখিত হয় এবং নব রূপে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংহতি সৃষ্ট হয়।

অনুশীলনী - ৫

১। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তি বা নির্ধারকগুলি কী কী?
(১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ থাকবে)

২। রাজনৈতিক সংস্কৃতির দু'ধরনের উপাদানগুলি কী কী?
(৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ থাকবে)

৩। রাজনৈতিক প্রতীকের গুরুত্ব কী?
(৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ থাকবে)

২১.৬ রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্ব

সমাজে আইন ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণের প্রশ্নটি সরকারি সংস্থার প্রতি সমর্থনমূলক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর নির্ভর করে। অনেক সময় নতুন জাতির সদস্যরা শুধুমাত্র সরকারি উৎপাদনের (Output) সুযোগসুবিধা এবং যে মাধ্যমগুলির সাহায্যে চাহিদা উপস্থাপিত হয় তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। তারা ইতিবাচক ও সমর্থনমূলক অধীনস্থ দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করেনি এবং আইন মান্য করতে শেখে নি। ফলে সেখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময় কোনও সমর্থন পায় না। অধিকাংশ নতুন জাতির ক্ষেত্রেই এই সমস্যা দেখা যায়।

যে সব ব্যক্তি উৎপাদন (Input) কাঠামোর প্রতি সহানুভূতিশীল এবং যাদের রাজনৈতিক সামর্থ্যসূচক দৃষ্টিভঙ্গী আছে তারা তাদের স্বার্থে প্রয়োজনের সময় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করবে আশা করা যায়। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার সঙ্গে অন্যান্য জাতির পার্থক্য দেখা যায়। আমেরিকার অনেক নাগরিকই কোনও স্থানীয় সমস্যার মুখোমুখি হলে কোনও স্থানীয় গোষ্ঠীকেই সমর্থন করবে এবং তাদের স্থানীয় সমস্যাগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করবে। ইটালির নাগরিকরা মনে করে যে, ব্যক্তি হিসাবে সে সরকারি কাজকে খুব কমই প্রভাবিত করতে পারে। এর ফলে যখন অসন্তুষ্টি প্রবল না থাকে, তখন নিষ্ক্রিয় সমর্থন দেখা যায় যতক্ষণ অসন্তুষ্টি প্রবল না হয়, ততক্ষণ রাগ, হতাশা ও নৈরাশ্য চাপা থাকে। পরে তা হিংসাত্মক আকার নিতে পারে।

এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে জাতপাতের তারতম্য ও উপজাতীয় আনুগত্য গুরুতর বিকাশসংক্রান্ত সমস্যার সৃষ্টি করেছে। জাতিগত, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও উপজাতীয় এককগুলির নানা ধরন থেকে আফ্রিকায় জাতির সৃষ্টি হয়েছে, যাদের মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্য কোনও সাধারণ বন্ধন (Common Bond) নেই। ফলে সদস্যরা তাদের স্থানীয় এককের বাইরে কোনও তথ্য জানে না, আনুগত্যও দেখায় না। জাতি গঠনে প্রক্রিয়ায় জাতীয় সত্তা সম্বন্ধে তথ্য সম্প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন, জাতীয় সত্তার প্রতি অঙ্গীকার প্রয়োজন। আফ্রিকা ও এশিয়ার নতুন জাতিগুলির ইতিহাসের কোনও-না-কোনও বিন্দুতে উপজাতীয় এককের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে জাতীয় আনুগত্যের দ্বন্দ্ব দেখা যায়। তখন জাতীয় অনন্যতার (Identity) প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

জাতীয় অনন্যতার প্রশ্ন শুধুমাত্র নতুন আফ্রো-এশীয় জাতিগুলির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। আধুনিক কালে আমেরিকার অনেক দক্ষিণবাসীর কাছে জাতিগত বিচ্ছিন্নকরণের প্রশ্ন জাতীয় অনন্যতার (Identity) ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছে।

যে জাতির ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের জাতীয় সংযুক্তির ঐতিহ্য নেই, সেখানে সমস্যাগুলি আরও গভীর; মীমাংসায় পৌছানো খুবই কঠিন ব্যাপার হতে পারে। স্থানীয় উপজাতি মনে করতে পারে যে, তার সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামো, স্কুল নির্মাণ, শিল্পগঠন বা জাতীয় সামরিক বাহিনীতে যুবকদের ভর্তি দ্বারা বিঘ্নিত হতে পারে; আনুগত্যের দ্বন্দ্বের চরম উদাহরণ হল গণসম্মোহনী নেতাকে কেন্দ্র করে উগ্র জাতীয়তাবাদ, যেমন ইজিপ্টের নাসের। মেক্সিকোর ব্যবস্থা মধ্যপন্থী সমাধান, সেখানে উচ্চ ধরনের সাধারণ সমর্থন ব্যবস্থা, একটি প্রাধান্যকারী দল ও সর্বজনস্বীকৃত বিপ্লবী প্রতীক নানা ধরনের বক্তব্য ও গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য সাধন করে। ভারতবর্ষ

আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ ভিত্তি থেকে একই লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করছে। সাফল্য ঘটেছে কি ঘটেনি তা পরবর্তীকালে বিবেচ্য বর্তমানে উপজাতীয় আনুগত্য বিভিন্ন স্থানে খুবই প্রকট এবং এগুলি প্রতিহত করা প্রয়োজন।

সমাজের রাজনৈতিক আস্থার সাধারণ স্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক প্রতিযোগী ও বিরোধীরা কি পরস্পরকে সন্দেহ করে, রাজনৈতিক আলোচনা ও আদানপ্রদান কি তুলনামূলকভাবে স্বাধীন ও সহজভাবে ঘটে, রাজনৈতিক বিষয়ে যোগাযোগের মাধ্যমে কি সীমাবদ্ধ এই প্রশ্নগুলি কোনও দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে অনুধাবনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। জার্মানী ও ইতালীতে গত ৫০ বছরের দুঃখজনক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার জন্য রাজনীতিকে ব্যক্তিগত আদানপ্রদানের বিষয় হিসাবে পরিত্যাজ্য মনে করা হয়। এর ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সংযোগ বিঘ্নিত হয়। অন্যদিকে ব্রিটেনে অভিজাত রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি জনগণের বিশ্বাস দেখা যায়। রাজতন্ত্র ও লর্ডসভা ব্রিটেনে এখনও বর্তমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে ব্যাপক গণতন্ত্রীকরণ ঘটেছে। জনসাধারণের জন্য দলব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণে কিছু শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। ভোটের উচ্চ সংখ্যা ও দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন থেকে বোঝা যায় যে জনগণ বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামো থেকে নিজেদের আলাদা মনে করে না, যদিও সামান্য কিছু লোকই সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকে; ফলে এখানে সাম্যমূলক গণতান্ত্রিক সমাজের ধারণার সঙ্গে শ্রেণীমূলক অভিজাততান্ত্রিক সমাজের সংমিশ্রণ ঘটেছে এবং একটি স্তরবিন্যস্ত অথচ ঐক্যবদ্ধ, সাবেকী অথচ আধুনিক রক্ষণশীল অথচ উদারনৈতিক সমাজ সৃষ্টি হয়েছে ।

রাজনীতি কি সামঞ্জস্য বিধানকারী নাকি বিরোধ ও বিভেদসূচক প্রক্রিয়া—এই প্রশ্নটিও রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রশ্নের সঙ্গে সংযুক্ত। ব্রিটেনের সাধারণ ধারণা এই যে যারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তারা স্বার্থের বৈধ প্রতিনিধিত্ব করে। আইনপ্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সমস্ত স্বার্থযুক্ত লোকেদের পরামর্শ ও কথাবার্তার ঐতিহ্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যে বৈধতা প্রয়োজন ও চাহিদা পূর্ণ করে তার প্রতিফলন। এরই উল্টো ধারণা হল এই যে রাজনীতির প্রাধান্য বিস্তারের জন্য অবিরাম সংগ্রাম প্রয়োজন। মার্ক্সীয় মত এই পরিপ্রেক্ষিত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে। এখানে সমস্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকেই প্রাধান্যকারী শ্রেণীর অধস্তন শ্রেণীর উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা কিংবা শোষিতদের শৃঙ্খলামোচনের চেষ্টা বলে মনে করা হয়।

রাজনৈতিক আদানপ্রদানে শিষ্টাচারের (Civility) স্তর এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। সৌজন্য, রীতিসিদ্ধ পদ্ধতি ও আদর্শ রাজনৈতিক ভিন্নমতের কঠোরতাকে কিছুটা হ্রাস করে। ব্রিটেন ও আমেরিকার আইনসভার রীতিসিদ্ধ ও রীতিবহির্ভূত প্রয়াসগুলি এই ধরনের প্রবণতার প্রতিফলন। এ জাতীয় পরিমিত আদর্শের (Moderating Norms) অভাবে আফ্রিকা ও এশিয়ার স্বাধীন দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক রাজনীতি কার্যকরী করতে অসুবিধা হয়।

সংবেদশীল (Responsive) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি চরম পরীক্ষা হল সরকারি ক্ষমতা এক ধরনের নেতৃত্ব থেকে অন্য ধরনের নেতৃত্বের হাতে বদল করার ক্ষমতা। যদি ব্যক্তিগত আস্থার স্তর খুবই নিম্নমানের হয়, যদি রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে জীবনমৃত্যু সংগ্রাম মনে করা হয় এবং রাজনৈতিক সৌজন্য উগ্র সংগ্রামকে প্রশমিত না করে তাহলে পদাধিকারী অভিজাত গোষ্ঠীর পক্ষে তাদের ভূমিকা পরিত্যাগ করা এবং নতুন সরকারের জন্য পথ ছেড়ে দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সমাজে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃত ভূমিকা জানা প্রয়োজন। রাজনৈতিক ব্যবস্থা কি প্রচলিত অর্থনৈতিক ধারার ও সামাজিক আচরণের সংরক্ষক হিসাবে কাজ করে নাকি সমাজ পরিবর্তনের উপায় হিসাবে পরিগণিত হয়; রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামর্থ্য কি বাড়ানো উচিত, নাকি তাকে সন্দেহের চোখে দেখা উচিত ও যতদূর

সম্ভব নিয়ন্ত্রিত রাখা উচিত, রাষ্ট্র কি বিস্তৃত জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে নাকি অনিয়ন্ত্রিত বাজার-অর্থনীতি সমর্থন করে—এই প্রশ্নগুলি সবসময় গণনীতি সংক্রান্ত বিতর্কে ওঠে না? প্রায়শ রাজনৈতিক সংস্কৃতি কিছু সীমা নির্ধারণ করে দেয় এবং বিতর্ক চলে সেই সীমাসংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি কোনও বিশেষ নীতি মানছে কিনা তার ভিত্তিতে। কিন্তু পূর্ববর্তী প্রশ্নগুলি রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতি অনুধাবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি একটি মূল্যবান ধারণামূলক যন্ত্র (Tool), যার সাহায্যে আমরা রাজনৈতিক তত্ত্বের ব্যক্তি ও সমষ্টির গুরুত্ব (Micro-Macro Gap) সহজেই অতিক্রম করতে পারি। রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির আলোচনা থেকে সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনায় পৌঁছানো যায়। ব্যক্তির ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, প্রতিক্রিয়া ও ব্যক্তিগত ঘটনার আলোচনা (Case Study) থেকে সমষ্টিগত পরিসংখ্যান ও গোষ্ঠী আচরণের ধারা জানা যায়। এই ধারা রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক আচরণ প্রতিফলিত করে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর বণ্টন ব্যবস্থাকে প্রকাশ করে এবং ব্যক্তিগত প্রবণতার সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যকে যুক্ত করে।

অনুশীলনী - ৬

১। রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্বের দু'টি দিক আলোচনা করুন?
(১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ হবে)

২। এশিয়া ও আফ্রিকার রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে কোনও একটি দিকের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
(৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ হবে)

২১.৭ সারাংশ

রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত আধুনিক আলোচনার শুরু বিংশ শতকে অ্যালমন্ড ও ভার্বার হাতে। লুসিয়ান পাই, পাওয়েল, অ্যালান বল, বুবলাটস্কি ইত্যাদি লেখকও রাজনৈতিক সংস্কৃতির আলোচনা করেছেন। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের রাজনীতির প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব তাকেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলা হয়। এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। রাজনৈতিক সংস্কৃতি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বদলে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে জনগণের মনোভাবকে বোঝায়। এই মনোভাব রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করতে পারে, বিরোধিতাও করতে পারে। তাই জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী সমজাতীয় হয় না, বিভিন্ন ধরনের হয়। কোথাও এই দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য বেশি হলে সেখানে রাজনৈতিক উপসংস্কৃতির অবস্থান থাকে। ভাষা, অঞ্চল, ধর্ম, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদির ভিত্তিতে ভারতে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি দেখতে পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির তিনটি দিক আছে—রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত জ্ঞান বা ধারণা, রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম বা বিরোধী অনুভূতি এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির মূল্যমান বিচার। তিনটি দিকের উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে তিনভাবে ভাগ করা যায়—অংশগ্রহণকারী অধীনস্থ এবং সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি। তিনটি ধরনের কোনোটিই একক ও অবিকৃতভাবে কোথাও দেখা যায় না, মিশ্রিত থাকে। মিশ্র রাজনৈতিক সংস্কৃতির আবার চারটি প্রকারভেদ হল—সংকীর্ণ-অধীনস্থ, অধীনস্থ-অংশগ্রহণকারী, সংকীর্ণ-অংশগ্রহণকারী এবং পৌর সংস্কৃতি।

ঐতিহাসিক বিকাশ, ঔপনিবেশিক শাসন, ভৌগোলিক অবস্থান, জাতিগত বিভিন্নতা, ধর্ম, আর্থসামাজিক কাঠামো, রাজনৈতিক মতাদর্শ ও শ্রেণী কাঠামো হ'ল রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন নির্ধারক। বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের প্রতীকের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে জনগণের আবেগ, অনুভূতি ও উত্তেজনা জাগরণ দ্বারা একদিকে জাতীয় ঐক্য রক্ষার প্রচেষ্টা চলে এবং অন্যদিকে সরকার তার বৈধতা প্রতিষ্ঠা চালায়।

যে কোনও দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার রাজনৈতিক সংস্কৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতির ওপরই রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি চির পরিবর্তনশীল। নতুন ধারণা, শিল্পায়ন, নতুন নেতৃত্ব, যুদ্ধ, বিপ্লব ইত্যাদি বিভিন্ন কারণের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতেও পরিবর্তন ঘটে।

২১.৮ অনুশীলনী

১। রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? রাজনৈতিক সংস্কৃতির তিনটি দিক কী কী? এই দিকগুলি কোন্ কোন্ রাজনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত হতে পারে?

২। রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি কাকে বলে?

৩। রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণীবিভাগ কীভাবে করা হয়? মিশ্র রাজনৈতিক সংস্কৃতি কী? মিশ্র রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধরনগুলি কী কী?

৪। রাজনৈতিক সংস্কৃতির নির্ধারকগুলি কী কী?

৫। রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করুন।

২১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। Gabrial A. Almond and Sidney Verva : The Civic Culture, Sage Publication, Newbury Park, London, New Delhi. 1989, pp. 1-44.

২। Lucian Pye & Sidney Verva (ed) : Political Culture and Political Development, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1965, pp. 1-24.

৩। Allan R. Ball : Modern Politics and Government, English Language Book Society & Macmillan, London, ELBS ed 1982, pp. 52-63.

৪। Amal Kumar Mukhopadhyay : Political Sociology, K.P. Bagchi, Calcutta—1994, pp. 86-102.

৫। অনাদি কুমার মহাপাত্র : রাজনীতিক সমাজতত্ত্ব, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলেজ স্কোয়ার (পশ্চিম), কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৩৭৮-৩৯৯।

৬। প্রাণগোবিন্দ দাশ : আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্ব, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৬৮২-৫৯৮।

একক ২২ □ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ

গঠন

২২.০ উদ্দেশ্য
২২.১ প্রস্তাবনা
২২.২ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ধারণা
২২.২.১ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সংক্রান্ত কিছু বক্তব্য
২২.৩ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রকারভেদ
২২.৪ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের বিভিন্ন মাধ্যম
২২.৫ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের গুরুত্ব
২২.৬ সারাংশ
২২.৭ অনুশীলনী
২২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

২২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য হল আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ধারণা ও তারা বিভিন্ন দিক আপনাকে জানানো। এখানে আলোচিত হয়েছে—

- রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্ভবন্ধে বিভিন্ন লেখকের ধারণা
- রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের বৈশিষ্ট্য
- রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রকারভেদ
- রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মুখ্য ও গৌণ মাধ্যমসমূহ
- রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের গুরুত্ব

২২.১ প্রস্তাবনা

যে কোনও সমাজব্যবস্থায় সংস্কৃতিগত দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ বিভিন্ন প্রজন্ম ধরে সমাজে সঞ্চারিত হয়। প্রজন্মগত ধারাবাহিকতা হল সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোনও গোষ্ঠীর সদস্যদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীর সংস্কৃতির মৃত্যু ঘটে না। গোষ্ঠীর নতুন সদস্যদের দ্বারা সংস্কৃতিগত ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী বহমান থাকে এবং সংস্কৃতি তার নিজের শক্তিতে কার্যকরী হয়। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয় তাকে সামাজিকীকরণ বলে। সামাজিকীকরণ দ্বারা সমাজের চিন্তাভাবনা, আদর্শ, মূল্যবোধ ইত্যাদি ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত হয়, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় এবং ব্যক্তির সামাজিক প্রকৃতির উন্মেষ ঘটে। তাই সামাজিকীকরণ হল ব্যক্তির সামাজিক সংস্কৃতি শিক্ষাগ্রহণের প্রক্রিয়া।

যখন এই সামাজিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত শিক্ষার রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা থাকে, তখন তাকে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বলে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনুকূলে শিক্ষাগ্রহণের প্রক্রিয়া ও অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারের পদ্ধতি। রাজনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করতে না পারলে ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হয়। তাই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ওপর প্রচলিত ব্যবস্থার সাফল্য, বা ব্যর্থতা নির্ভর করে।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের আলোচনা আধুনিককালে খুবই জনপ্রিয়। তবে প্রাচীনকালেও এ সংক্রান্ত আলোচনা দেখা যায়। প্লেটো নাগরিকদের মধ্যে বিশেষ ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। অ্যারিস্টটলও সাংবিধানিক ব্যবস্থা সংরক্ষণের কথা বলেছেন। ফ্যাসিবাদী, নাৎসীবাদী সকলেই নিজ মতাদর্শের অনুকূল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার কথা বলেন। তবে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সূত্রপাত ঘটে বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে। চার্লস মেরিয়ম বিষয়টির ওপর আলোচনার সূত্রপাত করেন।

২২.২ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ধারণা

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল একটি প্রক্রিয়া, যার সাহায্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরে রাজনৈতিক সংস্কৃতি অর্জিত হয় এবং যার সাহায্যে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রবহমান হয়। অর্থাৎ, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান, তথ্য, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ দ্বারা ব্যক্তি রাজনৈতিক সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়, ব্যক্তির রাজনৈতিক পছন্দ নির্ধারিত হয় এবং ব্যক্তি নাগরিকের ভূমিকা ও আচরণবিধি আয়ত্ত করে। তাই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ফল হল রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও তার বিভিন্ন ভূমিকা এবং ভূমিকাপালনকারীদের সম্বন্ধে জ্ঞান (Cognition) মূল্যবোধ (Value Standard), ও অনুভূতি (Feelings)।

এবার রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কী বলেন দেখা যাক। এস. এল. ওয়াসবির মতে, সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সময় এবং তারও প্রাক্কালে যে প্রক্রিয়ায় জনগণ রাজনৈতিক মূল্যবোধ অর্জন এবং যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক মূল্যবোধ এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় তাকে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বলে। ওয়াসবির মতে, রাজনৈতিক মূল্যবোধ বলতে শুধুমাত্র দলীয় পছন্দকে বোঝায় না, রাজনৈতিক স্বার্থ ও মতামতকেও বোঝায়। অ্যালান বল বলেছেন যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি মনোভাব এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণই হল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ। জি. এ. অ্যালমন্ড এবং জি. বি. পাওয়েলের মতে, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল একটি বিশেষ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও পরিবর্তন সাধিত হয়, ব্যক্তির মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সঞ্চারিত হয় এবং রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। ইস্টন ও ডেনিস মনে করেন যে, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল সেই সকল বিকাশমান পদ্ধতি, যার মাধ্যমে জনগণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণের ধারা অর্জন করে। সিজেলের মতে, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল একটি শিক্ষামূলক পদ্ধতি যার সাহায্যে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বীকৃত রীতিনীতি ও আচরণ এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিদের শিক্ষিত ও উন্নত করে তোলা যাতে তারা রাজনৈতিক সমাজের কার্যকরী সদস্যে পরিণত হয়।

২২.২.১ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সংক্রান্ত কিছু বক্তব্য

রাজনৈতিক সংস্কৃতির শিক্ষাগ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ সময় হল শৈশব। কিন্তু এই শিক্ষা শৈশবের কয়েকটি বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ব্যক্তির সমগ্র জীবন জুড়ে এই শিক্ষা চলে। বড় বয়সের বৈচিত্র্যপূর্ণ সামাজিক প্রভাব ব্যক্তির অল্প বয়সের ধারণাকে বদলে দিতে পারে, আবার সেই ধারণাকে শক্তিশালীও করতে পারে। শৈশবে পরিবারসূত্রে ব্যক্তি কোনও রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে পক্ষপাতমূলক ধারণা পোষণ করতে পারে। পরবর্তীকালে শিক্ষা, চাকরী, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা ইত্যাদির ফলে তার মধ্যে সেই দল সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মনোভাব সঞ্চারিত হতে পারে। নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া, নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ, রাজনৈতিক সামাজিক সংকট ইত্যাদির ফলে নতুন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি আয়ত্ত করা প্রয়োজন হয়, পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গী বর্জন করতে হয়। তাই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণকে একটি আজীবনকালীন অভিজ্ঞতা বলা যায়।

বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে এবং বিভিন্ন দেশ বা মহাদেশের মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রসারিত করার উপায় হল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ। এর ফলে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। তখন আবার নতুন করে সামাজিকীকরণ শুরু হয়। কিন্তু সামাজিকীকরণের অবলুপ্তি ঘটে না।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির কাঠামোকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য সরকার শিশুদের এবং বয়স্কদেরও নিজস্ব মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্বাস শেখাতে চেষ্টা করে। বয়স্কদের মাধ্যমে শিশুদেরও প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়। এই প্রচেষ্টার ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আনুগত্য বা বিরোধিতা বা উদাসীনতাজনিত মতবাদ গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ দ্বারা তাই ব্যক্তি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্নভাবে কাজ করতে উৎসাহিত হয়।

অ্যালমন্ডের মতে, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল পরিবেশ থেকে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রেরিত প্রথম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ (Input)। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ জনমত গঠনে সাহায্য করে, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজকর্ম ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে, এবং সামাজিক কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে।

রাজনৈতিক মূল্যবোধ, আদর্শ ও প্রতীকের প্রতি সমাজের সকলের এক ধরনের মনোভাব থাকলে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্যসাধন সহজ হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা এক ধরনের হলে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ গঠনের কার্যকারিতাও বৃদ্ধি পায়। গোষ্ঠীগত এক ধরনের অভিজ্ঞতা, যেমন, সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতি, সমাজ পরিবর্তনের দ্রুততা বা শ্লথগতি, দীর্ঘকালীন শান্তি বা ঘন ঘন হিংসাত্মক ঘটনা, অস্থিরতার উপস্থিতি বা অভাব ইত্যাদি জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধকে জোরদার করে। ফলে তাদের গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়।

ফ্রয়েড ও মনস্তত্ত্ববিদরা মনে করেন যে, সামাজিকীকরণ হল বিভেদকামী প্রবণতাকে সামাজিকভাবে স্বীকৃত পথে পরিচালিত করা ও সেই সঙ্গে তাদের সংযত রাখা। এই প্রসঙ্গে প্লেটোর আদর্শ যা মানুষের জন্মগত বিভেদমূলক প্রবণতাকে সংযত করে ও সমাজে শৃঙ্খলা আনয়ন করে, তার উল্লেখ করা যায়। আবার রুশোর বিশেষ ইচ্ছা বা ব্যক্তিগত প্রবণতাকে সাধারণ ইচ্ছায় রূপান্তরিত করার প্রসঙ্গও একই বক্তব্যের উপস্থাপনা করে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ববিদ অবশ্য রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন—মনস্তত্ত্বের ওপর নয়।

তিন ভাবে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের উপাদানগুলি সঞ্চারিত হয়—অনুকরণ (Imitation), নির্দেশ (Instruction), এবং প্রেরণা (Motivation)। রবার্ট লে ভাইন মনে করেন যে, এই পদ্ধতিগুলি শৈশবে কার্যকরী হয়। কিন্তু রাশ ও অ্যালথফের মতে, এগুলি সমগ্র সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া প্রসঙ্গেই কার্যকরী। শিশুদের মধ্যে অনুকরণ প্রবণতা বিশেষভাবে দেখা যায়। কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে অনুকরণ, নির্দেশ ও প্রেরণার সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। শিশু অজ্ঞাতসারে তার পিতামাতার পছন্দগুলি অনুকরণ করতে পারে। আবার শহরে আগত গ্রামবাসী শহুরে দৃষ্টিভঙ্গীর অনুকরণ দ্বারা নিজেকে শহরের অধিবাসীদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে। রাজনৈতিক শিক্ষা, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা বা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ হল নির্দেশের উদাহরণ। সরকার আনুষ্ঠানিক বা প্রখ্যাত পদ্ধতিতে সমাজের স্বীকৃত মূল্যবোধ সম্বন্ধে জনগণকে নির্দেশ দিতে পারে। আবার শিক্ষকের কাছ থেকে প্রেরণার মাধ্যমে শিশু পরবর্তীকালে সুনাগরিক হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করার বড় হাতিয়ার হল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমে জনগণকে একদিকে রাজনীতি বা রাজনৈতিক সংস্কৃতি শেখানো হয়, অন্যদিকে আবার রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটানো হয়। যেমন, কোথাও একনায়কতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন হলে স্কুলের বইতে ইতিহাস বদলানো হয়, স্কুল ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয় এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে নিয়ন্ত্রিত করে নতুন সরকার বা একনায়কতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টির প্রয়াস চলে।

সমাজে কোনও কোনও ঘটনা বা অভিজ্ঞতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেমন যুদ্ধ বা মন্দা লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে দুঃখজনক অভিজ্ঞতা বহন করে। অনেক পূর্বতন ঔপনিবেশিক দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ এক নতুন ধরনের অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে। জাতীয় সংগ্রামে যোগদান দ্বারা এই জনগোষ্ঠীগুলি রাজনীতির নতুন ভূমিকা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করে এবং নতুন রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ এবং জাতির রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠন করে এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারাকে প্রবহমান রাখে। অন্যভাবে বলা যায় যে, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ কোনও দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ, পরিবর্তন ও সৃজন করে থাকে। এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রেরণ দ্বারা রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ জাতির রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ করে। স্থায়ী ও সুস্থির রাজনৈতিক পরিবেশে এই সংরক্ষণমূলক কাজ গুরুত্বলাভ করে। কিন্তু স্থায়ী ও সুস্থির রাজনৈতিক পরিবেশ আধুনিক কালে সহজলভ্য নয়। অনেক জাতিই বর্তমানে পুরোনো ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামরত এবং নতুন সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে নতুন রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য ব্যস্ত। তাই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের পরিবর্তনসূচক কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবার আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক জাতি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় রত, এজন্য নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রয়োজন। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের সৃজনমূলক কাজ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। জাতির ঐতিহাসিক বিকাশ, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ, নাগরিক ও নেতাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ইত্যাদি উপাদানের ওপর নির্ভর করে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের তিনটি ভূমিকার মধ্যে কোনটি বেশী কার্যকরী হবে। বাস্তবিক পক্ষে যে কোনও সমাজে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের এই তিনটি ভূমিকাই কোনও-না-কোনওভাবে বর্তমান থাকে।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ জাতির প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করে, সরকারি ব্যবস্থার পক্ষে মূল্যবোধ সঞ্চারিত করে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি করে।

অনুশীলনী - ১

১। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের অর্থ কী? এ প্রসঙ্গে চারজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর ধারণা লিখুন।
(১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমিত হবে)

২। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ধারণাটিকে বিশদভাবে ব্যক্ত করুন।
(১৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমিত হবে)

২২.৩ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রকারভেদ

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ দু'ধরনের হতে পারে—প্রত্যক্ষ বা সুস্পষ্ট এবং পরোক্ষ বা প্রচ্ছন্ন (Direct or Manifest and Indirect বা Latent)। যে প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে তথ্য, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী সরাসরি সঞ্চারিত হয় তাকে প্রত্যক্ষ বা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বলে। এখানে তথ্য, মূল্যবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে রাজনীতির সম্বন্ধ প্রত্যক্ষভাবে থাকে। উদাহরণ হল বিভিন্ন দল দ্বারা জনগণের মধ্যে নির্দিষ্ট ধরনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, মতাদর্শ ও অনুভূতি সঞ্চারিত করার প্রচেষ্টা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি সংক্রান্ত পাঠ বা পরিবার থেকে রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে শিক্ষালাভ। যে প্রক্রিয়ায় পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব সঞ্চারিত করা হয় তাকে প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বলে। এখানে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক মূল্যবোধ বা মনোভাবের বদলে অরাজনৈতিক মূল্যবোধ বা মনোভাব সঞ্চারিত হয়; কিন্তু এই অরাজনৈতিক বিষয়টি পরবর্তীকালে রাজনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মনোভাবকে প্রভাবিত করে। উদাহরণ হল শিশুর কর্তৃত্বের প্রতি মনোভাব, যা পরবর্তীকালে তার মধ্যে রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তি রচনা করে।

সামাজিকীকরণ সুস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন দু'ধরনের বা উদ্দেশ্যমূলক ও উদ্দেশ্যহীন (Intentional & Unintentional) হতে পারে। শিক্ষক যখন ছাত্রকে আইন মান্য করতে শেখান, তখন উদ্দেশ্যমূলক সুস্পষ্ট সামাজিকীকরণ ঘটে। আবার শিশু যখন পুলিশ দ্বারা পরিবারের কোনও সদস্যের নিগ্রহ দেখে পুলিশকে ভয় করতে শেখে তখন উদ্দেশ্যহীন সুস্পষ্ট সামাজিকীকরণ দেখা যায়। আবার যখন শিশুকে শেখানো হয় যে, একটি ভালো ছেলে বড়দের মান্য করে তখন উদ্দেশ্যমূলক প্রচ্ছন্ন সামাজিকীকরণ ঘটে। তাছাড়া, শিশুটি যখন খেলাধুলায় যোগ দিয়ে নিয়মের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তখন উদ্দেশ্যহীন প্রচ্ছন্ন সামাজিকীকরণের উদাহরণ দেখা যায়।

সুস্পষ্ট সামাজিকীকরণের উদ্যোগ ব্যক্তির দিক থেকে আসে না, সামাজিকীকরণের সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কিন্তু প্রচ্ছন্ন সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণ সংস্থার ভূমিকার থেকে ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক বেশি। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ঘটনা ও কাঠামোর সঙ্গে ব্যক্তির যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যক্তির ধারণা পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং তার প্রচ্ছন্ন সামাজিকীকরণ বিকাশলাভ করে।

সুস্পষ্ট সামাজিকীকরণ ও প্রচ্ছন্ন সামাজিকীকরণের মধ্যে সমন্বয় ও সহাবস্থান দেখা যায়। কোনোটিই এককভাবে ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ, মতাদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গীর সঞ্চারণ করতে পারে না। তবে কারও ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সামাজিকীকরণ অধিকতর কার্যকর, কারও ক্ষেত্রে আবার প্রচ্ছন্ন সামাজিকীকরণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলনী - ২

১। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রকারভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

(১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ হবে।)

২২.৪ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের বিভিন্ন মাধ্যম

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সকল দেশেই প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি দেশবাসীর সমর্থনসূচক মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার চেষ্টা চলে। এ প্রসঙ্গে কতকগুলি মাধ্যম বা সংস্থার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সংস্থাগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ—

(ক) প্রাথমিক গোষ্ঠী বা সংস্থা :

(১) *পরিবার*—এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে রাজনৈতিক মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী বা বিশ্বাস সঞ্চারিত করার ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী। শিশু পরিবার থেকেই রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করে। পরিবারের মধ্যে তার জীবনের প্রথম ১০/১৫ বছরেই শিশু তার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অধিকাংশটাই অর্জন করে। সে বাবা, মা ও অন্যান্যদের মানসিকতা লক্ষ্য করে। সেগুলি তার মনে স্থায়ী ছাপ ফেলে। পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের অন্যান্য প্রভাব সত্ত্বেও তার শিশুকালীন রাজনীতি শিক্ষা বহাল থাকে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, আমেরিকার ৭৫% ভোটদাতা পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী চলেন। উইলির একটি ছোট ফরাসী শহরের গবেষণা থেকে জানা যায় যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্ভবধে বিদ্বেষ শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গীকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে, যদিও স্কুলপাঠ্য বইয়ের অন্য ধারণা চিত্রিত করা হয়েছে।

পরিবার শিশুদের কাছে বহির্জগতের বাতায়ন; পরিবারের মধ্যেই সুস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ঘটে থাকে। শিশু পরিবারের কর্তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। এই আনুগত্য পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টিতে সাহায্য করে। পরিবার তাকে পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে। এই অভিজ্ঞতা তার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে।

শিশুর জীবনে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে শিশুদের পরিবারের গুরুত্বের কারণ হল ঃ—

(i) অনেকদিন ধরে পরিবারই একমাত্র সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে শিশুর জীবনে বর্তমান থাকে। পরিবারই তার দৈহিক, মানসিক ও বস্তুগত প্রয়োজন পূর্ণ করে। শিশুও পরিবারের ভালোবাসা ও সমর্থনের ওপর নির্ভর করে। ফলে, সে সহজেই পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গী বা বাবা-মার ভালোমন্দ বোধ ও নৈতিক বিচার গ্রহণ করে।

(ii) শিশুর বাবা-মাকে অনুকরণের স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। বাবা-মা তার কাছে অনুকরণযোগ্য মডেল বলে প্রতিভাত হয়। শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর জগৎ থেকে নতুন ধারণা ও মডেল গ্রহণ করে ঠিকই, কিন্তু বাবা-মায়ের মডেল তার স্মৃতি থেকে কখনও মুছে যায় না।

(iii) পরিবারের সদস্যরা একই পরিবেশে বসবাস করে, একই প্রতিবেশীর দ্বারা প্রভাবিত হয়, একই সংবাদপত্র পড়ে বা রেডিও, টেলিভিশনের একই অনুষ্ঠান দেখে। ফলে, পরিবারের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়ে একই ধরনের মনোভাব গড়ে ওঠে। তবে ব্যক্তি বড় হয়ে নিজস্ব রাজনৈতিক ধারণা গড়ে তোলে না বা

কখনও পরিবারের ধারণার বিরুদ্ধতা করে না, একথা ঠিক নয়। কিন্তু তা হলেও তার মধ্যে পিতামাতার শিশুকালের প্রভাব থেকে যায়।

পরিবারের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সাধারণত রক্ষণশীল প্রকৃতির হয়, কারণ পরিবার সাবেকী ধারণা ও মূল্যবোধ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা করে। ফলে, পরিবারের মাধ্যমে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্রুত ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ প্রতিভাত হয়। আধুনিক বিকাশশীল সমাজগুলিতে এই ধরনের সমস্যা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়।

(২) *অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী*—ব্যক্তির শৈশবকালে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে তার জীবনে পরিবারের গুরুত্ব কমতে থাকে। স্বাতন্ত্র্য অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিকে অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর সদস্য হতে হয়। সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের গোষ্ঠীকেই অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী বলা হয়। আধুনিককালে শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও আধুনিকীকরণের ফলে সাবেকী জীবনধারার পরিবর্তন ঘটেছে—সমস্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আধুনিক সমাজে অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবের রাজনীতি বিষয়ক মনোভাব ব্যক্তির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করে। গোষ্ঠীগত সিদ্ধান্ত-গ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যরা অংশগ্রহণ করে। ফলে, তাদের মধ্যে যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার উন্মেষ ঘটে, তা তাদের রাজনৈতিক দক্ষতাবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর মধ্যে সহজ আদান-প্রদান ঘটে এবং আবেগপ্রবণ ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে। এর ফলে, অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ সহজ হয়। তবে অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর সাফল্য নির্ভর করে রাজনীতিতে তার উৎসাহ আছে কিনা তার উপর। যেমন, আমেরিকার অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীগুলির মধ্যে রাজনীতির প্রতি উৎসাহ কম। ফলে তারা রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের কাজ ঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারে না।

(৩) *শিক্ষা প্রতিষ্ঠা*—বয়োবৃদ্ধির পর শিশু শিক্ষালাভের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে এবং বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় তার জীবনে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে গুরুত্বলাভ করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুস্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ সামাজিকীকরণ সম্ভব হয়। বিদ্যালয়ের পাঠক্রম জাতীয়তাবাদী আদর্শ, জাতির অতীত গৌরব, জাতীয় ঐতিহ্য বা নেতাদের সম্বন্ধে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করে দেশের প্রতি আনুগত্য বাড়াতে চেষ্টা করে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়। শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে লেনিনবাদী-মার্ক্সবাদী দর্শনে দীক্ষিত করার চেষ্টা করা হয়। উদারনৈতিক গণতন্ত্রেও এ ধরনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের ক্ষমতা যাদের ওপর ন্যস্ত থাকে তাঁরা শ্রেণীস্বার্থের অনুকূলে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। বল বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনুকূলে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মার্কিন শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক মতাদর্শ প্রসার করা হয়। প্রচ্ছন্ন বা পরোক্ষ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঘটে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও অন্যান্য নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে শিক্ষার্থীর যোগ থাকে। এই সংযোগ তার রাজনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচীর বাইরে নানা কার্যক্রমে শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। ফলে, তাদের মধ্যে পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিক বিষয়ে অংশগ্রহণের প্রবণতা গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশলাভ করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা নিয়মকানুন ও কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। এই অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তি নির্মাণ করে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কখনও কখনও কোনও শিক্ষার্থীর মনে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরোধী মূল্যবোধ ও মানসিকতা সঞ্চার করে। বিভিন্ন

দেশের ছাত্র আন্দোলন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যেমন ১৯৬৮ সালের ফরাসী সংকটে ছাত্রদের ভূমিকা, আমেরিকার ছাত্রদের ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধিতা বা কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে নকশাল আন্দোলন।

(খ) গৌণ গোষ্ঠী বা সংস্থা :

(১) *পেশাগত সংগঠন*—বৃত্তি বা পেশাগত ভিত্তিতে নানা সংগঠনের উদাহরণ হল শ্রমিক সংঘ, বণিক সংঘ, কৃষক সংগঠন ইত্যাদি। এই সংগঠনগুলি পেশাগত স্বার্থের সংরক্ষণ করে থাকে। তবে আধুনিক কালে এগুলি কোনও-না-কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ফলে সংগঠনটি দলীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এবং সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে দলীয় মতাদর্শ প্রভাব বিস্তার করে। সংগঠনগুলি একদিকে পেশাগত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রচারকার্য চালায়, বিক্ষোভ-আন্দোলন ও ধর্মঘট করে ও সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে, অন্যদিকে আবার সংযুক্ত রাজনৈতিক দলের পক্ষে নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে নির্বাচনী প্রচারকার্যে যোগ দেয় এবং নির্বাচনী তহবিলে অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালায়। পেশাগত সংগঠনগুলির কাজ সদস্যদের মধ্যে রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও চিন্তা-ভাবনার সঞ্চার করা।

(২) *রাজনৈতিক দল*—রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে জনগণ সমাজের রাজনৈতিক কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করে, কারণ রাজনৈতিক দল নানা ধরনের মানুষকে রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত করে। ফলে জনগণের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ শক্তিশালী হয়, নতুন রাজনৈতিক মূল্যবোধ বা বিশ্বাসের সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক দল প্রচলিত রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা করতে পারে, আবার প্রচলিত রাজনৈতিক ধারার আমূল পরিবর্তন চাইতে পারে। রাজনৈতিক দলের এই ভূমিকা নির্ভর করে দলটির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, কার্যধারা ও প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কের ওপর। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারি ও বিরোধী দল উভয়েই রাজনৈতিক বিষয়ে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও জনগণকে রাজনীতি সচেতন করে তোলে।

(৩) *গণমাধ্যম*—রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলি সুস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন উভয় ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে এগুলি বর্তমানে খুবই উন্নত হয়েছে। রাজনৈতিক ঘটনা ও ঘটনাসংক্রান্ত ভাষ্য গণমাধ্যমগুলির সাহায্যে অতি দ্রুত জনগণের কাছে পৌঁছে যায়। ফলে রাজনৈতিক বিষয়ে জনগণের চিন্তাভাবনা বাড়ে, রাজনৈতিক সচেতনতার পরিধি প্রসারিত হয় এবং জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের প্রবণতা গড়ে ওঠে। এগুলি হল প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ। সুস্পষ্ট রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলির ভূমিকা খুবই কার্যকরী। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী বা সরকার নিজ বক্তব্য তুলে ধরার জন্য এগুলিকে পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে কাজে লাগায়। সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকলে গণমাধ্যমগুলি রাজনৈতিক বিষয়ে সরকারের বক্তব্য সরাসরি জনগণের কাছে উপস্থাপিত করে। শুধু যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণমাধ্যমের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী তা নয়। উদারপন্থী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতেও, এমনকি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেও এই প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও গণমাধ্যমগুলি বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয়। সেক্ষেত্রে মালিক বা নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক মূল্যবোধ গণমাধ্যমের সাহায্যে জনগণকে জানানো হয়।

(৪) *সরকারি কাঠামো*—সরকারি কাঠামো বিকেন্দ্রীভূত হলে বহুসংখ্যক নাগরিক সরকারি কাঠামো ও আমলাদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়। ফলে রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও সচেতনতা বাড়ে। আবার, সরকারি

কাঠামো কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণে থাকলে নাগরিকের সঙ্গে সরকারের যোগ কম থাকে। ফলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বিকাশ ও রাজনৈতিক সচেতনতা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(৫) *ধর্মীয় সংগঠন*—রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রেই অর্থবহ ভূমিকা পালন করেছে। আধুনিক গণতন্ত্রগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাভাবনার গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের ভূমিকা হ্রাস পেয়েছে। তবুও কোনও কোনও দেশে মহিলাদের রাজনৈতিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের সঙ্গে রোমান ক্যাথলিক ধ্যানধ্যারণার বিরোধের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য; আবার সাধারণভাবে বলতে গেলে, ধর্মীয় মূল্যবোধ নাগরিকের মধ্যে নৈতিকতা বিকশিত করে যা রাজনীতির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলনী - ৩

১। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে তিনটি প্রাথমিক সংগঠনের গুরুত্ব আলোচনা করুন। (আপনার উত্তর ১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

২। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে যে কোনও তিনটি গৌণ সংগঠনের সম্বন্ধে লিখুন। (আপনার উত্তর ১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

২২.৫ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের গুরুত্ব

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের বিভিন্ন মাধ্যম বা সংস্থাগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব, প্রতিক্রিয়া বর্তমান। একটি মানুষের জীবনে বিভিন্ন মাধ্যম একই সঙ্গে কার্যকরী দেখা যায়। তাই এগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা ঠিক নয়। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল বিভিন্ন মাধ্যমের দ্বারা সংগঠিত এক সমন্বিত মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী, বা রাজনৈতিক বিষয় ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কখনও কখনও এদের মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। তবে সামগ্রিক বিচারে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলি পরস্পরের পরিপূরক হিসাবেই কাজ করে।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নের জন্য রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রয়োজন আছে। সমাজে প্রতিদিন নানা পরিবর্তন ঘটে। এগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। এই পরিবর্তনগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কতটা প্রভাবিত করছে তা জানার জন্য রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্ভবধে জ্ঞান প্রয়োজন।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি আজ স্বাধীন। এক সময়ে এরা ইউরোপীয় শক্তির অধীনে ছিল। সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় শক্তির রাজনৈতিক কাঠামো এই দেশগুলিতে পরিচিত ছিল। তাই তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অনুকরণে রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। আবার এদের নিজস্ব রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোও আছে। পশ্চিমের প্রভাবে তাদের অবস্থা কেমন জানা প্রয়োজন। পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলির আর্থসামাজিক ব্যবস্থাও এখন পরিবর্তনশীলতার মুখে। এজন্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতির প্রয়োজন। মার্ক্সবাদ আবার প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন করে নতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়। তারা বুর্জোয়া সামাজিকীকরণকে মানে না। এই সকল পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সামাজিকীকরণ ধারাবাহিকভাবে চলে এবং এটি একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। তাই, হঠাৎ কোনও পরিবর্তন এসে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে না।

উদারনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক দু'ধরনের রাষ্ট্রেই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ দেখা যায়। তবে উভয়ের প্রকৃতি পৃথক। উদারনৈতিক রাষ্ট্রে পরিবর্তন যাতে সমাজকে ভাঙনের দিকে নিয়ে যেতে না পারে, সেজন্য রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও তার নিরবচ্ছিন্নতার ওপর জোর দেওয়া হয়। এজন্য নানা ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ওপর জোর দেওয়া হয় জনগণকে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত করানোর জন্য। এখানেও ধারাবাহিকতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হলে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে, রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার সংকট দেখা যায়। রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ঘটে, শেষ পর্যন্ত বিপ্লব দেখা দেয়। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলি সরকার ঠিকমত ব্যবহার করতে না পারলে এ ধরনের ঘটনা ঘটে।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সকল স্তরে সমানভাবে ঘটে না। মূল সংস্কৃতি ও উপসংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য থেকে যায়। উপসংস্কৃতির রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের নানা সমস্যা দেখা যায়। সরকার যখন বিভিন্ন মাধ্যমগুলির সাহায্যে উপসংস্কৃতিকে মূল জাতীয় স্রোতের অভিমুখী করে তুলতে চায়, তখন উপসংস্কৃতির নেতারা বিরোধিতা করেন। তাঁরা তাঁদের সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেন। বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে সমতত্ব বিশিষ্ট রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার সরকারি প্রয়াস উপসংস্কৃতির ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন ঘটায়। উপসংস্কৃতির নেতারা তা পছন্দ করেন না। ফলে বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদকামী প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে বিরোধ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পক্ষে বিপজ্জনক। এ জাতীয় বিরোধের সুযোগে বাইরের স্বার্থান্বেষী শক্তি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ করতে চেষ্টা করে। এজন্য রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতার উপর গুরুত্ব প্রদান আবশ্যক।

অনুশীলনী - ৪

১। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
(আপনার উত্তর ১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

২২.৬ সারাংশ

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সংক্রান্ত আধুনিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটে বিংশ শতকে। চার্লস মেরিয়ম, জি. এ. অ্যালমন্ড, জি. বি. পাওয়েল, রবার্ট সিজেল, ডেভিড ইস্টন, এস. এল. ওয়াসবি, অ্যালান বল ইত্যাদি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ ও জ্ঞান ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ একদিনে অর্জিত হয় না। শৈশব থেকে সমগ্র জীবনব্যাপী ব্যক্তির মধ্যে এই প্রক্রিয়া চলে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ দ্বারা রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ব্যক্তির একাত্মতা গড়ে ওঠে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাও স্থিতিশীলতা লাভ করে।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ দু'ধরনের—সুস্পষ্ট এবং প্রচ্ছন্ন। সুস্পষ্ট সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। প্রচ্ছন্ন সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে অরাজনৈতিক মনোভাব সম্বন্ধে ব্যক্তি জানতে পারে, কিন্তু তা পরবর্তীকালে ব্যক্তির রাজনীতিসংক্রান্ত মনোভাবকে প্রভাবিত করে।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম বা সংস্থাগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—প্রাথমিক সংস্থা এবং গৌণ সংস্থা। প্রাথমিক সংস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পরিবার, অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর নিবিড় যোগ থাকে। গৌণ সংস্থাগুলি হল পেশাগত সংগঠন, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, সরকারি কাঠামো ও ধর্মীয় সংগঠন। এখানে সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বদলে নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্ক দেখা যায়। উভয় ধরনের গোষ্ঠীর মাধ্যমেই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্পাদিত হয়।

সমাজের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সঙ্গে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের প্রশ্নটি সংযুক্ত। আধুনিককালে শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও অন্যান্য নানা পরিবর্তনের মধ্যে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে গেলে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। উদারনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ব্যবস্থাতেই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

২২.৭ অনুশীলনী

১। রাজনৈতিক সমাজিকীকরণ বলতে কী বোঝেন? রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ কয় প্রকার?

৩। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলি কী কী?

৪। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। G. A. Almond and Sidney Verba : The Civic Culture, Sage Publication, Newbury Park 1989, pp. 266-306.

২। G. A. Almond and G. B. Powell : Comparative Government, Amerind Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi, Bombay, Calcutta, New York.

৩। Allan Ball : Modern Politics And Government, English Language Book Society, London, LLBS ed 1982, pp. 63-71.

৪। Ali Ashraf and L. N. Sharma : Political Sociology, Universities Press, Hyderabad, 1995, Reprint pp. 167-178.

৫। Amal Kumar Mukhopadhyay : K. P. Bagchi & Co. Calcutta, 1994, pp. 103-119.

৬। প্রাণগোবিন্দ দাশ : রাষ্ট্রতত্ত্ব, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৫৬৯-৫৮২।

৭। ড. অনাদিকুমার মহাপাত্র : রাজনীতিক সমাজতত্ত্ব, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলেজ স্কোয়ার (পশ্চিম), ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৩৯৯-৪১৮।

একক ২৩ □ শিক্ষা ও রাজনীতি

গঠন

২৩.০ উদ্দেশ্য
২৩.১ প্রস্তাবনা
২৩.২ শিক্ষার অর্থ
২৩.২.১ শিক্ষার দু'টি ধারণা
২৩.৩ রাজনৈতিক ধারণা
২৩.৩.১ রাজনীতি প্রসঙ্গে কিছু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের বক্তব্য
২৩.৪ শিক্ষা ও রাজনীতির সম্পর্ক
২৩.৪.১ রাজনীতির উপর শিক্ষার প্রভাব
২৩.৪.২ শিক্ষার উপর রাজনীতির প্রভাব
২৩.৫ সারাংশ
২৩.৬ অনুশীলনী
২৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

২৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য হল শিক্ষা ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্বন্ধে আপনাকে অবহিত করা। এ প্রসঙ্গে আপনাকে জানানো হচ্ছে—

- শিক্ষা বলতে কী বোঝায়?
- রাজনীতির ধারণা।
- শিক্ষা কীভাবে রাজনীতিকে প্রভাবিত করে।
- শিক্ষা কীভাবে রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়।

২৩.১ প্রস্তাবনা

আগের এককে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ আলোচিত হয়েছে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের বিভিন্ন মাধ্যমগুলির মধ্যে শিক্ষার গুরুত্বের কথা আগেই বলা হয়েছে। তা থেকে রাজনীতি ও শিক্ষার পারস্পরিক সম্বন্ধের গুরুত্বের অনুমান করা যায়।

বর্তমান এককে প্রথমে শিক্ষার অর্থ, পরে রাজনীতির অর্থ এবং সবশেষে পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে।

শিক্ষা কথাটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় অর্থে প্রচলিত। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা শিক্ষায়তনলব্ধ জ্ঞানকে বোঝায় না—পরিবেশলব্ধ জ্ঞানকে বোঝায়, যা অচেতনভাবে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়। প্রাচীনকালে এই শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আধুনিক কালে শিক্ষা কথাটি সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষায়তনলব্ধ সচেতন জ্ঞানকে বোঝায়।

রাজনীতি বলতে সরকারের কাজ, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্রসংক্রান্ত বিষয়, নির্বাচন ইত্যাদিকে বোঝায়। বিরোধ, বিরোধের মীমাংসা, ভাব, শক্তি ও কর্তৃত্ব হল রাজনীতির বিষয়বস্তু।

শিক্ষা রাজনীতিকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ দু'ভাবে প্রভাবিত করে। আবার রাজনীতিও শিক্ষার বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করে অনুকূল রাজনৈতিক মতামত সৃষ্টির চেষ্টা করে। আধুনিক সমাজে উভয়ের সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ। সমাজতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক উভয় ধরনের সমাজেই শিক্ষা ও রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

২৩.২ শিক্ষার অর্থ

প্রাচীন গ্রীক চিন্তাবিদদের কাছে শিক্ষার অর্থ হল একটি সুসংবদ্ধ ও সচেতন পদ্ধতি, যার সাহায্যে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে থাকে। অ্যারিস্টটল মনে করেন যে, শিক্ষা মানুষের বিভিন্ন গুণাবলীর বিকাশ ঘটায় এবং তার মনের উৎকর্ষসাধন করে, যাতে সে চরম সত্য, সৌন্দর্য্য ও সর্বোত্তমকে উপলব্ধি করতে পারে। সামনার বলেন যে, শিক্ষা হল একটি প্রচেষ্টা যার সাহায্যে শিশুর ওপর দৃষ্টিভঙ্গী, অনুভূতি ও কাজের ধরন আরোপ করা হয়, কারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে চললে তার দৃষ্টিভঙ্গী, অনুভূতি বা কাজের ধরন অন্যরকম হত। ডুর্কহাইমের মতে, সমাজজীবনের প্রস্তুতি হিসাবে পূর্ববর্তী প্রজন্মের চর্চিত ক্রিয়াই হল শিক্ষা। সামাজিক পরিবেশ ও সমাজজীবনের চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষা শিশুর মধ্যে দৈহিক, নৈতিক ও বৌদ্ধিক শক্তিকে জাগ্রত ও বিকশিত করে। ম্যাকেঞ্জীর মতে শিক্ষা হল ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন ও আত্মোপলব্ধি। আধুনিক কালে শিক্ষা বলতে শিক্ষায়তনের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান ও গ্রন্থলব্ধ জ্ঞানকে বোঝায়। এই জ্ঞান ব্যক্তির চিন্তার পরিধিকে বিস্তৃত করে এবং ব্যক্তির কাজের উৎকর্ষ ঘটায়। মার্ক্সবাদ অনুসারে শিক্ষা হল একটি সামাজিক ও সচেতন কাজ এবং সমষ্টিগত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধন হয়।

২৩.২.১ শিক্ষার দু'টি ধারণা

শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষা কথাটি দুধরনের অর্থে ব্যবহার করা হয়—ব্যাপক অর্থ এবং সংকীর্ণ অর্থ। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা কোনও সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকে বোঝায় না। এই শিক্ষা কোনও নিয়মের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, নির্দিষ্ট পাঠ্য তালিকার সঙ্গে যুক্ত নয়। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা সামাজিক জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং সামগ্রিক সামাজিক পরিবেশ ও বিভিন্ন নির্দিষ্ট সামাজিক পরিবেশ উভয়ের প্রভাবের সমন্বয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশসাধনকে বোঝায়। এই শিক্ষা ব্যক্তিকে বৃহত্তর সামাজিক জীবনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে। এই শিক্ষা সচেতনভাবে নয়, অচেতনভাবে ঘটে থাকে।

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হল শিক্ষায়তনের নির্দিষ্ট পাঠক্রমের ভিত্তিতে লব্ধ জ্ঞান। নির্দিষ্ট পাঠক্রম, পঠনপাঠন, প্রশ্নপত্র প্রস্তুতি, পরীক্ষাগ্রহণ, সফল ছাত্রকে স্বীকৃতি প্রদান–ইত্যাদি সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত। ছাত্র বা ছাত্রী শিক্ষক বা শিক্ষিকার কাছ থেকে এই শিক্ষা লাভ করে। আধুনিক সমাজে এই ধরনের শিক্ষাদানের জন্য নানা স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকে। যেমন—বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র, বিশেষীকৃত প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। এই প্রতিষ্ঠানগুলির নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য থাকে। সংকীর্ণ শিক্ষার উদ্দেশ্য

হল ব্যক্তির বিশেষ কোনও বিষয়সংক্রান্ত ক্ষমতা ও সুপ্ত গুণাবলী প্রকাশ করা। এই শিক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন, পরিবার ও ব্যক্তি সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। এই শিক্ষা সচেতনভাবে ঘটে থাকে।

আদিম সমাজে আনুষ্ঠানিক বা সংকীর্ণ শিক্ষা ছিল না। শিক্ষা ব্যাপক অর্থে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে জটিল সমাজে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও আধুনিকীকরণের ফলে আনুষ্ঠানিক সংকীর্ণ শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে।

অনুশীলনী - ১

১। শিক্ষার অর্থ পরিস্ফুট করুন।
(৬ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ হবে)

২। শিক্ষার সংকীর্ণ ও ব্যাপক অর্থ বলতে কী বোঝায়?
(৬ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ হবে)

২৩.৩ রাজনীতির ধারণা

সাধারণভাবে রাজনীতি বলতে সরকারের কাজ, রাজনৈতিক দলের পরিচালনা, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও মতামতকে বোঝায়। রাষ্ট্রসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়কে রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নির্বাচন, রাজনৈতিক দল গঠন ও পরিচালনা, সরকার গঠন ও পরিচালনা, সরকারকে প্রভাবিত করার চেষ্টা, বিশেষ প্রভাবী গোষ্ঠীর মাধ্যমে সরকারের ওপর চাপ—এ সবই রাজনীতির বিষয়।

আধুনিককালে রাজনীতি কথাটি মতবিরোধ ও সংঘর্ষের সঙ্গে যুক্ত। আদিম সমাজে নিয়মকানুন ও তাদের রূপায়ণের বাস্তব প্রচেষ্টা বা রাজনীতি থাকলেও জটিলতা, মতবিরোধ ও সংঘর্ষ ছিল না। তাই রাজনীতিও গুরুত্বহীন ছিল। আদিম যুগে নেতার আদেশ প্রত্যেকে বিনা প্রতিবাদে মেনে চলত। বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগহীন অনুন্নত সমাজেও সরকার, আইনের প্রয়োগ ও শাস্তির ব্যবস্থা বা রাজনীতি আছে। কিন্তু সেখানে রাজনীতি আধুনিক অর্থে প্রচলিত নয়, কারণ এই সমাজে মতবিরোধ ও স্বার্থের সংঘর্ষ ঘটলেও তা প্রকট নয়। তাই অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজনীতি কথাটি আধুনিক কালের জটিল ও উন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহার করেন। আধুনিক সমাজে সচেতনতা, স্বার্থবোধ ও আত্মকেন্দ্রিকতা বেড়ে যাওয়ার ফলে সংঘর্ষ ও মতবিরোধ সমাজের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক সমাজে প্রচলিত ব্যবস্থার পক্ষে ও প্রচলিত ব্যবস্থা পরিবর্তনের পক্ষে—দু'পক্ষেই সমর্থনকারী থাকে। ফলে মতবিরোধ ও সংঘর্ষও বাড়ে।

সমাজে পরিবর্তনশীলতা ও নিত্যনতুন পরিস্থিতি বিভিন্ন শক্তির মধ্যে ঐক্যমত্য স্থায়ী হতে দেয় না; ফলে মতবিরোধ থেকেই যায় আর রাজনীতিও সমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে। মতবিরোধ থেকে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে। এই দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক স্থায়িত্বকে বিঘ্নিত করে এবং রাজনীতিতে সংকট সৃষ্টি করে। সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য মীমাংসা ও সমঝোতা চাই। মীমাংসাও তাই রাজনীতির অঙ্গ। বিরোধ মিটে গেলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সকলেই সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য দেখায়। গণতন্ত্রে সাংবিধানিক পথে বিরোধের মীমাংসা হয়। স্বৈরতন্ত্রে বা একনায়কতন্ত্রের কোনও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি নেই। সেখানে সংবিধান-বহির্ভূত উপায় অনুসৃত হয়। দ্বন্দ্ব ও বিরোধ প্রবল হ'লে বিপ্লবের আশঙ্কা থাকে।

বিরোধের মীমাংসা ঘটলেই রাজনীতির অবসান ঘটে না। মীমাংসার পরও নতুন বিরোধ দেখা যায়। আবার কিছু বিরোধ অমীমাংসিত থেকে যায়। সমাজের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা যত জটিল হয়, বিরোধ তত বেশি বাড়তে থাকে। সরকারকে নতুনভাবে মীমাংসার পথ বার করতে হয়; অর্থাৎ রাজনীতির প্রয়োজন ফুরায় না।

ভাব বা ধারণা (Ideas) রাজনীতির যাবতীয় আচার-আচরণ ও ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে। ভাবকে কেন্দ্র করে সমাজে বিরোধ ঘটে। আবার ভাবকে কেন্দ্র করেই মীমাংসার পথও খোঁজা হয়। শাসক ও শাসিত উভয়ে একই প্রকার ভাব বা ধারণার অংশীদার হলে রাজনীতিতে সংঘর্ষ দেখা দেয় না। আর দেখা দিলেও তা সংকট সৃষ্টি করে না। অর্থাৎ, ভাব রাজনীতিকে স্থিতিশীল করে। আবার ভাব রাজনীতিকে অস্থিতিশীলতাও প্রদান করে। শাসক ও শাসিতের মধ্যে ভাবের বিরোধ সংঘর্ষ সৃষ্টি করে। তাই ভাবের ক্ষেত্রে ঐকমত্য আনার ওপর অনেকে জোর দেন। বিভিন্ন দেশের সরকার ভাবকে ইচ্ছামত ব্যবহার করে রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মধ্য দিয়ে সরকারের পক্ষে অনুকূল ভাব সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলে।

রাজনীতিতে বিরোধ ঘটলে তার মীমাংসা কে করে এবং কীসের সাহায্যে করে—সেই আলোচনাও রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। উত্তর হল ক্ষমতা বা শক্তি (Power)। ভীতিপ্রদর্শন বা অন্যান্য উপায়ে অন্যের আচরণকে প্রভাবিত করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে। ম্যাকিয়াভেলি, হবস, চার্লস মেরিয়ম, হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল ইত্যাদি শক্তিকে রাজনীতির বৈশিষ্ট্য মনে করেন। শক্তির সঙ্গে কর্তৃত্ব (Authority) সম্পর্কযুক্ত। কর্তৃত্ব হল আনুগত্যের বৈধ অধিকার। কর্তৃত্বের সাহায্যেই শাসক আনুগত্য আদায় করেন।

২৩.৩.১ রাজনীতি প্রসঙ্গে কিছু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর বক্তব্য

ম্যাকেঞ্জী বলেন যে, ক্ষমতা হল রাজনীতির চাবিকাঠি। র‍্যাফেলের মতে, সরকারের কাজকর্মকে প্রভাবিত করে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর এমন আচরণকে রাজনীতি বলা যায়। ইস্টন মনে করেন যে, রাজনীতি হল সমাজের জন্য মূল্যের কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দ যা সকলেই মেনে চলতে বাধ্য। সরকারি নীতি, নানা সিদ্ধান্ত ও তাদের বাস্তব রূপায়ণের মধ্য দিয়ে এই কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দ সম্পন্ন করে। সমাজের মূল্যগুলির পরিমাণ সীমাবদ্ধ সরকারি নীতি সকলের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে মূল্যের এই কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দ করে থাকে। মার্ক্সের মতে বিভিন্ন শ্রেণী, সামাজিক গোষ্ঠী, জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কই হল রাজনীতি। প্রতিটি শ্রেণী জাতি বা গোষ্ঠী নিজের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে থাকে। এই মনোভাবই রাজনীতির জন্ম দেয়। মার্ক্সও রাজনীতিতে ক্ষমতার প্রয়োগ ও ক্ষমতার প্রকাশের কথা বলেন।

অনুশীলনী - ২

১ রাজনীতি বলতে কী বোঝানো হয়?
(১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ হবে)

২। রাজনীতি প্রসঙ্গে তিনজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর বক্তব্য লিখুন?
(৩ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ হবে)

২৩.৪ শিক্ষা ও রাজনীতির সম্পর্ক

শিক্ষা ও রাজনীতির সম্পর্ককে আমরা দু'দিক থেকে আলোচনা করতে পারি—প্রথমত, শিক্ষা কীভাবে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বা রাজনৈতিক যোগ্যতাকে প্রভাবিত করে এবং দ্বিতীয়ত, রাজনীতি কীভাবে শিক্ষার বিষয়কে প্রভাবিত করে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী বা মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে। পরবর্তী দু'টি অংশে আমরা তাই রাজনীতির ওপর শিক্ষার প্রভাব এবং শিক্ষার ওপর রাজনীতির প্রভাব আলোচনা করব।

২৩.৪.১ রাজনীতির উপর শিক্ষার প্রভাব

রাজনীতির ওপর শিক্ষার প্রভাব পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ দু'ভাবেই দেখা যায়। আমরা প্রথমে আমাদের আলোচনা পরোক্ষ প্রভাবের মধ্যেই সীমিত রাখব। পরে প্রত্যক্ষ প্রভাবের আলোচনায় যাব।

(ক) রাজনীতির ওপর শিক্ষার পরোক্ষ প্রভাব :

(i) শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল মানুষের সুপ্ত ক্ষমতা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশসাধন। সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনের পক্ষে কল্যাণকর বৃত্তিসমূহ বা সুপ্রবৃত্তিগুলি যাতে গড়ে ওঠে এবং সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের পক্ষে হানিকর বৃত্তিসমূহ বা কুপ্রবৃত্তিগুলি যাতে নিয়ন্ত্রিত হয় শিক্ষার মাধ্যমে সে চেষ্টাও করা হয়। শিক্ষা ব্যক্তিকে বুদ্ধিগত ও নৈতিক দিক থেকে উন্নত করে তোলে।

ফলে তার রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রেও সে অধিকতর যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারে।

(ii) শিক্ষা ব্যক্তিকে জীবিকার্জনের স্বার্থে আয় বা রোজগারের যোগ্য করে তোলে। আধুনিক যুগে এ প্রসঙ্গে বৃত্তিগত শিক্ষার প্রচলন ঘটেছে। এই শিক্ষা আধুনিক শিল্প-সভ্যতার ভিত্তি এবং ব্যক্তিকে কর্মকুশলতা প্রদান করে। সাধারণ শিক্ষা এবং বৃত্তিগত শিক্ষা—উভয় শিক্ষাই ব্যক্তিকে সুস্থ পেশা ও রোজগার দ্বারা নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণে সাহায্য করে। ফলে ব্যক্তির ও সমাজের উৎপাদনশীলতা বাড়ে। সমাজের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম দিক। শিক্ষা তাই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন আনতে পারে।

(iii) ব্যক্তির অসামাজিক মনোবৃত্তি বা ভ্রান্ত মনোভাব শিক্ষা দূর করে। পরিবারের মধ্যে শিশু যদি কিছু অন্ধ আনুগত্য বা কুসংস্কার গড়ে তোলে, শিক্ষা তাকে তা থেকে মুক্ত করে। শিক্ষা শিক্ষার্থীকে সঠিক তথ্য সরবরাহ করে, বিজ্ঞানমনস্ক হতে শেখায়। শিক্ষার্থীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ তাকে পরবর্তী রাজনৈতিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করে।

(iv) শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করে। ফলে ব্যক্তির মধ্যে নিজস্বতার চেতনা গড়ে ওঠে। এই বিচার-বিবেচনাবোধ, আত্মবিশ্বাস বা নিজস্বতার চেতনা ব্যক্তিকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

(v) স্কুল-কলেজের শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার মানসিকতা গড়ে তোলা হয়। এই প্রতিযোগিতার মনোভাব পরবর্তী জীবনে তাকে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে। নির্দিষ্ট পাঠক্রমের ভিত্তিতে নানা বিষয়ের পরীক্ষা, প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মেধানুসারে স্থাপন, উচ্চ স্থানাধিকারীদের কৃতিত্বের

স্বীকৃতি—এইভাবে প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা হয়। স্কুল জীবনে সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব পরবর্তীকালে রাজনৈতিক দলের সুস্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করে।

(vi) শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে ন্যায়নীতি, কর্তব্যপরায়ণতা, শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি গুণগুলি প্রোথিত করা হয়। এই গুণগুলি পরবর্তীকালে তাকে রাজনৈতিক কর্তব্যপালনে উৎসাহিত করে এবং তার মধ্যে রাজনৈতিক আনুগত্যবোধ ও দেশের আইনের প্রতি শৃঙ্খলার মনোভাব সৃষ্টি করে। ব্যক্তি সুনাগরিকে পরিণত হয়।

(vii) স্কুলের বা কলেজের পাঠ্যপুস্তক ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী দেশের ইতিহাস, প্রচলিত প্রথা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা জাতীয় নেতাদের সম্ভবধে জানতে পারে। এইখানে শিক্ষার সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজের আচার-ব্যবহার, চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়। সেও প্রচলিত জীবনধারার অনুগামী হয়। তার সামাজিকীকরণ পূর্ণতালাভ করে। ফলে জাতীয় চিন্তাধারা, আচার-ব্যবহার বা সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। বিরোধ বা অসামঞ্জস্যের আশঙ্কা থাকে না। সমাজে রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দেয় না। সামাজিকীকরণ ও রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

(খ) রাজনীতির ওপর শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাব :

(১) অ্যালমন্ড ও ভার্বা মনে করেন যে, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্বাস বা মনোভাব নির্ধারণের বিভিন্ন উপাদান, যেমন পেশা, শিক্ষা, বয়স, বাসস্থান, স্ত্রী-পুরুষ ইত্যাদির মধ্যে শিক্ষার ভূমিকা সবথেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তিনি পরিসংখ্যানের সাহায্যে আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানী, ইতালি ও মেক্সিকো—এই পাঁচটি দেশে দেখেছেন যে, শিক্ষিতদের দৃষ্টিভঙ্গী অশিক্ষিতদের থেকে স্বতন্ত্র। শুধু তাই নয়, পাঁচটি দেশেই কয়েকটি ব্যাপারে শিক্ষিতদের মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী একইভাবে প্রভাবিত দেখেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

(i) ব্যক্তির ওপর সরকারের প্রভাব সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তি অশিক্ষিত ব্যক্তির থেকে অনেক বেশি সজাগ।

(ii) শিক্ষিত ব্যক্তি অশিক্ষিত ব্যক্তির থেকে অনেক বেশি রাজনীতি বোঝার চেষ্টা করে এবং নির্বাচনী প্রচারে অনেক বেশি মন দেয়।

(iii) সে অনেক বেশি রাজনৈতিক তথ্য ও সংবাদ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।

(iv) অনেক বেশি রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে সে মতামত পোষণ করে।

(v) সে রাজনৈতিক আলোচনায় অনেক বেশি উৎসাহিত বোধ করে এবং স্বচ্ছন্দে রাজনীতি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে।

(vi) সে অনেক বেশি লোকের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে।

(vii) সে মনে করে যে, সে সরকারকে প্রভাবিত করতে সক্ষম।

(viii) সে কোনও সংগঠনের সক্রিয় সদস্যপদে উৎসাহী। এই সংগঠনগত অবস্থান তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করে। তাকে রাজনীতিতে আরও উৎসাহী করে তোলে।

(viii) সে তার সামাজিক পরিবেশের ওপর অনেক বেশি আস্থা রাখে এবং অন্যান্যদের বিশ্বাস করে। এই আস্থা ও বিশ্বাস অন্যান্যদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে তাকে উদ্বুদ্ধ করে।

(২) শিক্ষিতরাই রাজনীতিতে বেশি সংযুক্ত হয় এবং রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। তারা রাজনৈতিক সংবাদ রাখে, সরকারের প্রভাব সম্বন্ধে সজাগ, সরকারের কাজ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, গণমাধ্যমগুলির থেকে রাজনীতি অনুধাবন করে, রাজনৈতিক মতামত পোষণ করে ও ব্যক্ত করে, রাজনৈতিক আলোচনায়

যোগ দেয়, সরকারকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাযুক্ত বলে নিজেদের মনে করে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী অশিক্ষিতদের মধ্যে কম থাকে। ফলে তারা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসাহিত বোধ করে না।

(৩) উচ্চ শিক্ষার ফলে জাতীয় পার্থক্য হ্রাস পায়, কারণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি অনেকাংশে শিক্ষার হারের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। উচ্চ শিক্ষার ফলে ব্যক্তির পরিবার বা অন্যান্য মুখ্য প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরতা কমে। অ্যালমন্ড ও ভার্বা তাঁদের সমীক্ষায় পাঁচটি দেশের শিক্ষিত অংশের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত ঐক্য এবং একই ধরনের শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা দেখতে পেয়েছেন, যদিও তাদের শিক্ষাব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের। অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিতদের মধ্যে এ ধরনের ঐক্য পাওয়া যায় না। তারা তাদের জাতির ইতিহাস ও জাতীয় সংস্কৃতির দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। অ্যালমন্ড ও ভার্বা আরও বলেছেন যে, ইতালীর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিদের পার্থক্য থাকতে পারে; কিন্তু তাদের মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে তা অশিক্ষিত বা প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ইতালীবাসী বা আমেরিকাবাসীদের সঙ্গে তাদের তুলনা করলে পাওয়া যাবে না।

(৪) অ্যালমন্ড ও ভার্বা বলেছেন যে, শিক্ষার হারের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলের সদস্যদের সম্বন্ধে সহনশীলতা বেড়ে যায়। ফলে রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক মনোভাব বিকাশলাভ করে।

(৫) শিক্ষাহারের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত ধারণামূলক (Cognitive) দিকই শুধু বৃদ্ধি পায় না, প্রভাবী (Affective) এবং মূল্যায়নমূলক (Evaluative) দিকও বিকশিত হয় এবং দেশের শিক্ষিত অংশের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব বৃদ্ধি পায়। শিক্ষিত আমেরিকা বা ইংলন্ডবাসীর মধ্যে জাতির রাজনৈতিক দিক সম্বন্ধে গৌরববোধের প্রকাশ দেখা যায়। শিক্ষা তাই জাতীয় ঐক্য ও সমষ্টিগত রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার করে।

(৬) শিক্ষা মানুষের রাজনৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে। তাই সব সমাজেই ছাত্র সম্প্রদায়কে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিভিন্ন অন্যায় বা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা যায়। উদাহরণ হল ভিয়েতনামে মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও অন্যান্য দেশে ছাত্র সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ আন্দোলন, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ বিদ্বেষ নীতির বিরুদ্ধে সেখানকার ও অন্যান্য দেশের ছাত্রদের আন্দোলন।

(৭) অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত ব্যক্তিরা অধীনস্থ (Subject) বা সংকীর্ণ (Parochial), রাজনৈতিক সংস্কৃতিযুক্ত, কিন্তু শিক্ষিতরা অংশগ্রহণকারী (Participatory) রাজনৈতিক সংস্কৃতিযুক্ত। অল্প শিক্ষিতরা বা অশিক্ষিতরা সাধারণত রাজনীতি ও সরকার সম্বন্ধে অধীনস্থ মনোভাব পোষণ করে। তারা সরকারের প্রভাব সম্বন্ধে জানে এবং সরকারি আমলাদের দ্বারা সমজাতীয় আচরণ আশা করে, কিন্তু রাজনীতি আলোচনা বা নির্বাচনী প্রচারে উৎসাহ দেখায় না। কোথাও কোথাও আবার অশিক্ষিতরা সরকারি প্রভাব সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে, পরিবার বা সম্প্রদায়ের বাইরে চিন্তা করে না। তারা সংকীর্ণ মনোভাবযুক্ত। কিন্তু শিক্ষিতদের মধ্যে রাজনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান, সরকারি প্রভাব সম্বন্ধে ধারণা এবং মূল্যায়ন থাকে। অংশগ্রহণকারী মানসিকতা তাদের মধ্যে প্রবল।

২৩.৪.২. শিক্ষার ওপর রাজনীতির প্রভাব

(১) শিক্ষা ব্যক্তি মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাছাড়াও সমাজবদ্ধ মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিক্ষা সামগ্রিকভাবে সমাজব্যবস্থাকেই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শিক্ষার এই অপরিসীম গুরুত্বের জন্য বর্তমানে অধিকাংশ দেশেই সমাজের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ওপর অল্পবিস্তর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এই নিয়ন্ত্রণ সমাজবাদী ও উদারনৈতিক উভয় ধরনের রাষ্ট্রেই দেখা যায়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে দেশবাসীর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ প্রোথিত করার সরকারি প্রচেষ্টা দেখা যায়। দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও আনুগত্য জাগ্রত করার জন্য বিশেষ

ধরনের শিক্ষার ওপর উদারনৈতিক গণতন্ত্রও জোর দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনুকূলে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সরকারি ব্যবস্থা গৃহীত হয়। সেখানেও উদারনৈতিক মতাদর্শ প্রসারিত করার চেষ্টা চলে। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির মনকে নিয়ন্ত্রিত করে সুপরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের সরকারি প্রচেষ্টা বা শিক্ষার রাজনীতিকরণ আধুনিক যুগে খুবই প্রবল।

(২) প্রাচীনকালে অল্প কিছু লোকের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ সীমিত ছিল। সমাজ ছিল সহজ, সরল। তাই পরিবার বা পাড়া-প্রতিবেশীর মাধ্যমে সমাজের সদস্যদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব ছিল। শিক্ষার গুরুত্ব বেশি ছিল না। আধুনিক শিক্ষা-প্রধান সমাজে শিক্ষার রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষীকরণ ঘটেছে। সামাজিকীকরণ ও রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে শিক্ষার গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক জটিল শিল্পভিত্তিক সমাজে ব্যক্তিদের মধ্যে ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, আচার-আচরণগত পার্থক্য দেখা যায়। তাই এখানে স্বভাবসিদ্ধভাবে ব্যক্তি ও সমাজের সব অংশের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। শিক্ষাসূত্রে প্রাপ্ত মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে এক ধরনের সংযোগকারী (Integrative) শক্তি সৃষ্টি হয়, যার সাহায্যে সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখা যায়। ফলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার তাৎপর্য্য অনস্বীকার্য। দেশের ইতিহাস, জাতি ও জাতীয় নেতাদের গৌরবময় কাহিনী দেশবাসীর মধ্যে ঐক্য ও দেশাত্মবোধ সৃষ্টি করে। সরকারি প্রচেষ্টা দ্বারা সমাজের সংযোগকারী শক্তি হিসাবে শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং বিদ্যালয় বা কলেজের পাঠক্রমে দেশের ইতিহাস বা জাতীয় গৌরবময় কাহিনী অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অনুশীলনী - ৩

১। রাজনীতির ওপর শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব আলোচনা করুন।
(১৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমিত হবে)

২। শিক্ষার ওপর রাজনীতির প্রভাব আলোচনা করুন।
(আপনার উত্তর ৮ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

২৩.৫ সারাংশ

আলোচ্য এককে শিক্ষা ও রাজনীতির সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে শিক্ষা ও পরে রাজনীতির অর্থ এবং শেষে উভয়ের সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে।

শিক্ষা কথাটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা সামগ্রিক জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত এবং সামগ্রিক সামাজিক পরিবেশ ও ব্যক্তির নির্দিষ্ট সামাজিক পরিবেশ--উভয়ের সমন্বয়ে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশসাধনকে বোঝায়। এই শিক্ষা সর্বাত্মক ও স্বয়ং শিক্ষা এবং শিক্ষক ছাড়াও সম্ভব। এই শিক্ষা ব্যক্তিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে। ব্যক্তি এই শিক্ষা সচেতনভাবে নয়, অচেতনভাবেই লাভ করে। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হল নির্দিষ্ট পাঠক্রমের ভিত্তিতে লব্ধ জ্ঞান। এই শিক্ষা ছাত্র বা ছাত্রী সচেতনভাবে শিক্ষক বা শিক্ষিকার কাছ থেকে লাভ করে।

রাজনীতি বলতে সরকারের কাজ, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও মতামত, দলীয় পরিচালনা, নির্বাচন স্বার্থগোষ্ঠীর কাজ ইত্যাদিকে বোঝায়। রাজনীতি কথাটি মতবিরোধ বা সংঘর্ষের সঙ্গে যুক্ত। এই সংঘর্ষ আধুনিক যুগের জটিল জীবনযাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে আধুনিক যুগে রাজনীতির গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। মতবিরোধ জনিত দ্বন্দ্ব সমাজের স্থায়িত্ব বিঘ্নিত করে। তাই মীমাংসা ও সমঝোতা রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ। মীমাংসার পর নতুন বিরোধ ঘটে—আবার মীমাংসা—আবার বিরোধ—অর্থাৎ সমাজে রাজনীতির প্রয়োজন থেকে যায়। বিরোধ ও সমঝোতা উভয় ক্ষেত্রেই ভাব বা Idea গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনীতিতে বিরোধের মীমাংসা করে ক্ষমতা বা শক্তি। ক্ষমতা হল ভয় দেখিয়ে বা অন্যভাবে অন্যের আচরণকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য। শক্তি বৈধতা লাভ করে কর্তৃত্বে পরিণত হয়। অর্থাৎ বিরোধ, মীমাংসা, ভাব, কর্তৃত্ব ও শক্তি হল রাজনীতির বিষয়।

শিক্ষা ও রাজনীতির পারস্পরিক সংযোগ সম্পর্ক খুবই নিকট। শিক্ষা রাজনীতিকে প্রভাবিত করে, আবার রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিতও হয়।

২৩.৬ অনুশীলনী

১। শিক্ষা ও রাজনীতির অর্থ কী?
(১৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমিত হবে)

২। শিক্ষা ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করুন।
(আপনার উত্তর ২০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

২৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। G. A. Almond & Sidney Verba : The Civic Culture; Sage Publications, Newbury Park, 1989, Ch II & pp. 315-324.

২। Bottomore : Sociology; Blackie & Son (India) Ltd. Bombay, 1979, pp. 262-272

৩। ড. অনাদিকুমার মহাপাত্র : রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব; সুহৃদ পাবলিকেশন—কলেজ স্কোয়ার (পশ্চিম), ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৪১৮-৪২০।

৪। Kingsely Davis : Human Society; Surjeet Publications, New Delhi, 1981. pp. 227-230.

৫। টম বটোমোর : সমাজবিদ্যা; অনুবাদ হিমাচল চক্রবর্তী, কে. পি. বাগচী; নিউ দিল্লী, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ২৭৯-২৮৯।

৬। ড. রমানাথ মুখোপাধ্যায় : প্রসঙ্গে সমাজতত্ত্ব; সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স, কলিকাতা ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২৬৩-২৭৯।

একক ২৪ □ ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি

গঠন

২৪.০ উদ্দেশ্য
২৪.১ প্রস্তাবনা
২৪.২ ধর্মের ধারণা
২৪.২.১ ধর্মের সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য
২৪.৩ ধর্ম ও সমাজ
২৪.৩.১ ধর্মের ইতিবাচক সামাজিক ভূমিকা
২৪.৩.২ ধর্মের নেতিবাচক সামাজিক ভূমিকা
২৪.৪ ধর্ম ও রাজনীতি
২৪.৪.১ ধর্মীয় রাজনীতি
২৪.৪.২ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি
২৪.৫ সারাংশ
২৪.৬ অনুশীলনী
২৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

২৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য হল ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি কীভাবে সম্পর্কযুক্ত সে সম্বন্ধে আপনাকে অবহিত করা। এ প্রসঙ্গে আপনি জানতে পারবেন—

- ধর্মের ধারণা ও ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য।
- ধর্মের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক প্রসঙ্গে ধর্মের ইতিবাচক ও নেতিবাচক সামাজিক ভূমিকা।
- ধর্ম ও রাজনীতির সম্বন্ধ।
- ধর্মীয় রাজনীতি এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি সম্বন্ধে ধারণা।

২৪.১ প্রস্তাবনা

আগের এককে শিক্ষা ও রাজনীতির কথা আলোচিত হয়েছে। বর্তমান এককে আমরা ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে ধর্মের অর্থ, তারপর ধর্ম ও সমাজের আলোচনা প্রসঙ্গে ধর্মের ইতিবাচক ও নেতিবাচক সামাজিক ভূমিকা এবং সবশেষে ধর্ম ও রাজনীতির সম্বন্ধ, ধর্মীয় রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

ধর্ম হল অতিপ্রাকৃত, অতিমানবিক, আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতি মানুষের বিশ্বাস এবং এই শক্তির সন্তুষ্টি বিধানের প্রচেষ্টা। ধর্ম শুধুমাত্র বিশ্বাস নয়, বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে কিছু অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপ, উৎসব ও ধর্মীয় বিষয়। ধর্মকে অনেকে মানবজীবনের সর্বোচ্চ মূল্যবোধ, মানবতা বা নৈতিক শুদ্ধতা মনে করেন।

সমাজে ধর্মের নানা উপকারী ভূমিকা আছে, নানা অপকারী ভূমিকাও দেখা যায়। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নীতিবোধের প্রতিষ্ঠা করে, মানুষের ও সমাজের বাহ্যিক আচরণ ও মনের ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করে; দুঃখে বা বিপদে সান্ত্বনা ও নিরাপত্তা দেয়; সাহিত্য, শিল্পকলা, ললিতকলার উন্নতি ঘটায়; বস্তুজগৎকেও প্রভাবিত করে এবং সমাজে ব্যক্তিদের সৌভ্রাত্র ও ঐক্যের বন্ধনে গ্রথিত করে। ধর্ম নানা সমাজসেবামূলক কাজেও প্রেরণা দেয়।

ধর্ম আবার মানুষের উদ্যম, প্রচেষ্টা ও স্বাধীন চিন্তাকে ব্যাহত করে তাকে অদৃষ্ট নির্ভর করে তোলে; ধর্মান্ধতা ও বিজ্ঞান বিরোধিতার জন্ম দেয় এবং সমাজের প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। মার্ক্স ধর্মকে উচ্চ শ্রেণী দ্বারা শ্রমজীবী শ্রেণীকে শোষণের উপায় মনে করেন।

ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যেও পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রাচীনকালে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে প্রচার করে রাজার প্রতি জনগণের দ্বিধাহীন আনুগত্য সৃষ্টি করত। মধ্যযুগের ইউরোপে পোপ ও রাজার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে কে ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিনিধি এই প্রশ্নে। ধর্ম নানা বিপ্লব ও আন্দোলনের সূচনা করেছে। আধুনিক নির্বাচনী রাজনীতিতেও ধর্মের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। প্রার্থী বাছাই বা মন্ত্রীসভা গঠনে ধর্মীয় প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাচীনকালে ধর্মীয় রাজনীতি প্রাধান্য পেত। আধুনিক কালে প্রায় সর্বত্র ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে এখনও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী রাজনীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে থাকে।

২৪.২ ধর্মের ধারণা

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ধর্মের ধারণাটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা দেখা যাক। জেমস জি. ফ্রেজারের মতে, মানুষের থেকে উচ্চতর শক্তি, যা প্রকৃতির ধারা ও মানবজীবনের গতিপথ নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ করে তার প্রসন্নতা বা সন্তুষ্টি সাধন হল ধর্ম। অগবার্ন ও নিমকফের আলোচনা অনুসারে ধর্ম হল মানুষের থেকে উচ্চতর শক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী। ম্যাকাইভার মনে করেন যে, ধর্ম বলতে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে এবং মানুষ ও উচ্চতর কোনও শক্তির মধ্যে সম্পর্ককে বোঝায়। এমিল ডুর্কহাইমের অভিমত অনুসারে ধর্ম হল এক ধরনের বিশ্বাস ও এক বিশেষ পদ্ধতি যার সৃষ্টি হয়েছে কতকগুলি পবিত্র বিষয়কে কেন্দ্র করে। এম. সি. ট্যাগার্টের মতে ধর্ম হল একটি আবেগ, যা মানুষ ও বিশ্বসংসারের মধ্যে ঐক্য আছে, এই প্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আবার কোঁৎ মনে করেন যে, ধর্ম ও মানবতা অভিন্ন। তিনি মানবতাকেই ধর্ম হিসাবে গণ্য করেন। ধর্ম বলতে ম্যাকেঞ্জী পূর্ণ শুদ্ধতার প্রতি আন্তরিক অনুরক্তিকে বুঝিয়েছেন। রাধাকৃষ্ণাণও বলেছেন যে, সুন্দর, শিব ও সত্যের জন্য মনের অনুসন্ধানই হল ঈশ্বরের আরাধনা।

ধর্ম সম্বন্ধে মার্ক্সের ধারণা পুরোপুরি বিপরীত। তিনি ধর্মের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, ধর্ম হল উৎপাদনের মালিক শ্রেণীর হাতে একটি বিশেষ হাতিয়ার, যার সাহায্যে সমাজের দরিদ্র শ্রমজীবী শ্রেণীকে আফিমের নেশার ন্যায় মোহাচ্ছন্ন ও অবশ করে রাখা হয়। ধর্মীয় চেতনাকে তিনি মানুষের দাসভাবের পরিচায়ক মনে করেন। শ্রমজীবী জনগণ তাদের দুঃখকষ্টকে নিজেদের নিয়তি বা অদৃষ্ট মনে করে ঈশ্বরের কাছে নিজেদের সমর্পণ করে। তাই ধর্ম থেকেই অদৃষ্টবাদ জন্ম নেয়।

অন্যদিকে আবার ম্যাক্স হ্বেবার ধর্মবিশ্বাস ও অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন।

২৪.২.১ ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য

ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীর ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যায়।

(১) ধর্মের মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা বা দেবভাবনা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। কোনও উচ্চতর শক্তির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস সব ধর্মেই দেখা যায়। এই উচ্চতর শক্তিকে মহত্তম, সর্বগুণান্বিত ও শক্তিশালী মনে করা হয়।

(২) উচ্চতর শক্তির প্রতি বিশ্বাস থেকে মানুষের মনে নানা আবেগমূলক অনুভূতি, যেমন--ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি সৃষ্ট হয়। এগুলি ধর্মের অন্তর্গত।

(৩) ধর্মের একটি ক্রিয়ামূলক বা আনুষ্ঠানিক দিক আছে। নানা আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-উৎসব ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মীয় আবেগ বা অনুভূতি ব্যক্ত হয়। এইসব আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদিও ধর্মের অন্তর্গত।

(৪) পার্থিব বা অপার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই আশা-আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্তিকে উচ্চতর শক্তির ওপর নির্ভরশীল করে তোলে।

(৫) ধর্ম একদিকে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মানবজীবনে সর্বোচ্চ মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত, তেমনি আবার ধর্মের মধ্যে সামাজিক আদর্শ, সামাজিক সংহতি এবং সামাজিক মূল্যবোধও দেখা যায়। তাই ধর্ম একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিষয়।

(৬) সব ধর্মেরই একটা অন্তরঙ্গ এবং একটি বহিরঙ্গ দিক আছে। উচ্চতর শক্তির প্রতি আস্থা, অনুভূতি বা আবেগ হল ধর্মের অন্তরঙ্গ দিক। আর ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকলাপ হল বহিরঙ্গ দিক। অন্তরঙ্গ দিকটি ব্যক্তির নিজস্ব জগৎ আর বহিরঙ্গ দিকটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৭) মার্ক্সবাদীদের কাছে ধর্ম কোনও উচ্চ ধারণা নয়, বরং মায়াজাল সৃষ্টি করে শ্রেণীশোষণকে অব্যাহত রাখার উপায়। সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা হয়।

অনুশীলনী - ১

১। ধর্ম সম্বন্ধে চারজন সমাজবিজ্ঞানীর বক্তব্য লিখুন।
(আপনার উত্তর ৪ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

২। ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?
(আপনার উত্তর ১৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

২৪.৩ ধর্ম ও সমাজ

ধর্ম একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। আদিম সমাজে ধর্মবোধ ও ধর্ম সৃষ্টি হয়েছিল এবং আদিম কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সবদেশেই মানুষের মন ও সমাজে ধর্মের স্থায়ী আসন দেখা যায়। ধর্ম তাই একটি বিশ্বজনীন বিষয়। ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে ধর্মের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'ধরনের সামাজিক ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়।

ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন এবং সমাজজীবনের অনেকাংশ জুড়ে ধর্মের অবস্থান। ধর্ম ব্যক্তি-মানুষকে নৈতিক পথে পরিচালিত করে এবং অনৈতিক পথ থেকে রক্ষা করে। উচ্চতর সত্তার প্রতি বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম মানুষের মনে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব জাগরিত করে। এই ভাব তার বাহ্যিক আচার-আচরণ ও মানসিক চিন্তাভাবনাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করে। অতি-প্রাকৃতের সমর্থন দ্বারা ধর্ম সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতিকেও রক্ষা করে। ধর্ম কিছু সামাজিক কাজকে সমাজের বিরুদ্ধতা ও ঈশ্বর-বিরোধিতা বলে প্রচার করে। ধর্ম কিছু কাজকে আবার সমর্থনও করে। এইভাবে ধর্ম সামাজিক জীবনের একটি মডেল সম্বন্ধে ধারণা দেয়। সমাজে বিভিন্ন ঘটনা, উৎসব বা অনুষ্ঠান কোনও-না-কোনও ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, উপনয়ন, দীক্ষা ইত্যাদি ঘটনা; হালখাতা, গৃহপ্রবেশ ইত্যাদি উৎসব এবং শস্য বপন, ধান্যরোপণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আচার ও অনুশাসন দেখা যায়। তাই বলা যায় যে, ধর্ম ব্যক্তি-মানুষের আচার-ব্যবহার ও সমাজের জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। ধর্ম ও সমাজের সম্বন্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে ধর্মের এই নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা খুবই প্রাসঙ্গিক।

ধর্ম সমাজের ব্যক্তিদের বাহ্যিক আচরণ ও মনের চিন্তাভাবনাকে সংযত করে ব্যক্তির ও সমাজের নৈতিক উন্নতি ঘটায়। সুস্থ, সুন্দর সমাজজীবনের জন্য নীতিগত সততা খুবই প্রয়োজন। ধর্ম মানুষকে সততার শিক্ষা দেয় ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। অসৎ পথকে পাপ বলে চিহ্নিত করে অসৎ পথ থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করে। ধর্মবোধের প্রভাব মানুষকে সহ্যশক্তি, সহানুভূতি ও মমত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করে। সমাজবদ্ধ মানুষ যাতে সামাজিক প্রথা ও নিয়ম ঠিকভাবে মেনে চলে এবং সামাজিক দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করে ধর্ম সে ব্যাপারেও সহায়তা করে। তাই বলা যায় যে, ধর্ম নীতিবোধ ও সততার শিক্ষা দ্বারা ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে সুনীতি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।

ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনে মাঝে মাঝে সমস্যা বা হতাশা দেখা দেয়। ব্যক্তি তার জীবনে দুঃখকষ্ট বা বিপদের সম্মুখীন হলে হতাশাগ্রস্ত ও ভীত হয়ে পড়ে। উচ্চতর দৈবশক্তির আশ্রয় তাকে নিরাপত্তা প্রদান করে। দুঃখবিপদে সে সান্ত্বনা খুঁজে পায়। সমাজজীবনেও প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি মাঝে মাঝে সমাজকে বিপদগ্রস্ত করে তোলে। ধর্ম ও উচ্চতর সত্তার আশ্রয় সমাজজীবনে নিরাপত্তা বোধের সঞ্চার করে, আশার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনে ধর্ম নিরাপত্তা, সান্ত্বনা ও আশা যোগায় এবং হতাশা বা বিপদ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে।

ধর্মবোধের প্রেরণায় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে নির্মিত হয়েছে নানা মন্দির, মসজিদ গির্জা, ইত্যাদি। নানা ধরনের সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলাও সৃষ্ট হয়েছে। তাদের শিল্পকর্ম, ভাস্কর্য, মাধুর্য ও কারিগরী উৎকর্ষ এখনও বিস্ময়কর বলে প্রতিভাত হয়। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ধর্মের আবেদন

তাই সমাজে ভাস্কর্য, সৌধ, সঙ্গীত ও চিত্রকলার সমৃদ্ধিসাধন করেছে বলা যায়। অর্থাৎ, ধর্মের আবেদন মানুষের সৃষ্টিশীল প্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং ধর্মের প্রভাবে সমাজের সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটেছে।

ধর্ম ব্যক্তি ও সমাজের বস্তুগত ব্যবহারিক জীবনেও পরিবর্তন এনেছে। ম্যাক্স হেবার মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ ও ধর্মের সম্বন্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষা মানুষের ও সমাজের বস্তুগত জীবনকে প্রভাবিত করেছে। বৌদ্ধধর্ম পার্থিব জীবনকে অর্থহীন মনে করে ও বৈরাগ্যের ও নির্বাণের কথা বলে। তাই বৌদ্ধধর্মে বস্তুগত জীবনের সমৃদ্ধিকে উৎসাহ দেওয়া হয় না। হিন্দুধর্মেও বস্তুগত সম্পদকে গুরুত্বহীন ভাবা হয়। তাই হিন্দুধর্ম অনুসরণকারী কোনও ব্যক্তি বস্তুগত সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট নন। ইসলাম ধর্ম পুঁজির বিরোধিতা করে। তাই পুঁজিবাদ সেখানে বাধা পায়। কিন্তু প্রটেস্টান্ট ধর্ম পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বিকশিত করার সহায়ক শিক্ষা দেয়। তাই ইংল্যান্ড, হল্যান্ড বা আমেরিকায় পুঁজিবাদের অগ্রগতি ঘটেছে।

মন্দির, মসজিদ, গির্জা ইত্যাদি ধর্মীয় সংগঠনগুলির সামাজিক ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সংগঠনগুলিতে উপাসনা, পূজা ইত্যাদি উপলক্ষে বহু মানুষ একত্রিত হয়। বিভিন্ন মানুষের মেলামেশার ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। ঈশ্বরের পিতৃত্বের ছায়ায় বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে ওঠে। এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, সৌভ্রাত্র ও সম্প্রীতি সৃষ্টি ধর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা।

ধর্মবোধের মাধ্যমে ব্যক্তি তার ক্ষুদ্র 'অহং'-কে পরিত্যাগ করে বৃহৎ 'অহং' বা সামাজিক সত্তার সঙ্গে একীভূত হয়; সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে বৃহৎ সমষ্টিগত স্বার্থের চিন্তা করতে শেখে। ধর্মের মাধ্যমে তাই সমাজজীবনে ঐক্য ও সংহতি সাধিত হয়। ঈদ, খ্রীষ্টমাস, দুর্গাপূজা ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসবে বিভিন্ন ধরনের মানুষের যোগদান করে, একইভাবে আনন্দ উপভোগ করে এবং একই চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। তাই সংযোগকারী বা সংহতিসাধনকারী হিসাবে ধর্মের সামাজিক গুরুত্ব খুব বেশি।

যথার্থ ধর্মবোধ ব্যক্তিকে সমাজসেবায় উদ্বুদ্ধ করে। বিভিন্ন ধর্মের জনহিতকর বা সেবামূলক নানা কাজ দেখা যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন খরা, বন্যা ও সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্যোগ, যেমন যুদ্ধ, বিপ্লব ইত্যাদি বিপদের সময় বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন হতাশাগ্রস্ত ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে জনসেবামূলক বিভিন্ন কাজ করে। তাছাড়াও ধর্মীয় সংগঠন পরিচালিত হাসপাতাল, বিদ্যালয়, অনাথ আশ্রম, বৃদ্ধাশ্রম, দাতব্য সংস্থা ইত্যাদিও দুঃস্থ, দরিদ্র, আর্ত মানুষের সাহায্য করে থাকে। ধর্মের এই সেবামূলক কাজের সামাজিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

২৪.৩.২ ধর্মের নেতিবাচক সামাজিক ভূমিকা

এতক্ষণ আমরা ধর্মের সামাজিক গুরুত্বের ইতিবাচক দিক দেখলাম, কিন্তু ধর্মের সামাজিক ভূমিকার কিছু নেতিবাচক দিকও আছে। সেগুলি নীচে আলোচনা করা হল।

ধর্ম মানুষের ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশকে বাধা দেয় এবং স্বাধীন চিন্তাভাবনাকে ব্যাহত করে। ধর্ম অন্ধবিশ্বাস, উচ্চতর শক্তির ওপর নির্ভরশীলতা এবং নিয়তির কথা বলে। ফলে ব্যক্তির আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বাধীন ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না।

ধর্মীয় প্রভাবে ব্যক্তি তার দুঃখকষ্ট ও বিপদকে অদৃষ্টের বা ভাগ্যের ফল মনে করে এবং দুঃখকষ্ট সহ্য করতে শেখে। তারা আশা করে যে, পরবর্তীকালে উচ্চতর সত্তার দয়ায় তাদের জীবনের অন্ধকার বিদূরিত

হবে। ফলে নানা সামাজিক অন্যায়কেও তারা নীরবে মেনে নেয়। অন্যায়ের সঙ্গে আপস করার মনোবৃত্তি ধর্মের প্রভাবে গড়ে ওঠে। ফলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা জনগণ হারিয়ে ফেলে। ফলে মানুষ কর্মবিমুখ ও অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়ে।

ধর্মের অনেক সমালোচক মনে করেন যে, ধর্ম বিচার-বিবর্জিত এবং আবেগপ্রবণ চিন্তাধারার জন্ম দেয়। তাঁদের ধর্মান্ধতা, অন্ধ কুসংস্কার এবং জ্ঞানের অভাব ধর্মের অবদান। ধর্মবিশ্বাসীদের ধারণা এই যে, ধর্মের মধ্যেই যাবতীয় জ্ঞান, সত্য ও দর্শন নিহিত। তাই ধর্মের বাইরে এগুলির সন্ধান অর্থহীন। এই ধরনের বিশ্বাস, তথ্য ও জ্ঞানের জন্য মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাকে ধ্বংস করে, সৃজনমূলক কাজে বাধা সৃষ্টি করে এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিরোধিতা করে।

ধর্মবিশ্বাসী ভাবেন যে, ধর্মীয় অনুশাসন হল শাশ্বত ও চিরন্তন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে নতুন ব্যবস্থা, নতুন ভাবনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ধর্ম তার আচার-অনুষ্ঠান অপরিবর্তিতভাবে জনগণের উপর চাপিয়ে রাখে। ফলে ধর্ম প্রগতিশীল ধ্যানধারণার বিরোধিতা করে এবং রক্ষণশীলতার আমদানি করে।

ধর্মের মধ্যে যেমন সংহতিমূলক চেতনা থাকে, তেমনি আবার বিভেদমূলক শক্তিও থাকে। একই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গভীর একাত্মতা ধর্মবোধ থেকে সৃষ্টি হয়। তেমনি আবার ধর্মবোধ বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরী মনোভাব সৃষ্টি করে। ইতিহাসে ধর্মের ভিত্তিতে বৈরিতার উদাহরণ অনেক। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান দু'টি ধর্মের মানুষের মধ্যে বৈরিতা, দাঙ্গা ও সংঘর্ষের উদাহরণ আছে। এই ধরনের বৈরিতা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ করে এবং সমাজে বিদ্বেষমূলক ও বিভেদমূলক মনোভাবের সূচনা করে।

মার্ক্সের মতে, ধর্ম সমাজে শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। ধর্ম নামক হাতিয়ারটি উচ্চশ্রেণী বা উৎপাদনের মালিকশ্রেণীর হাতে থাকে এবং এর সাহায্যে শ্রমজীবী শ্রেণীর ওপর শোষণ চালানো হয়। ধর্ম সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কাছে আফিমের নেশার মতো। এই নেশায় তাদের বিভোর করে রাখায় তারা সমাজের উচ্চ শোষক শ্রেণীর শোষণ বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়। তাই মার্ক্স ধর্মকে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করেন।

অনুশীলনী - ২

১। ধর্মের ইতিবাচক সামাজিক ভূমিকা আলোচনা করুন।
(আপনার উত্তর ১৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

২। ধর্মের নেতিবাচক সামাজিক ভূমিকা সম্বন্ধে লিখুন।
(আপনার উত্তর ১৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

২৪.৪ ধর্ম ও রাজনীতি

ধর্ম ও রাজনীতি—একটি হল আধ্যাত্মিক জগতের বিষয় এবং অন্যটি বাস্তব জীবনে পার্থিব বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। তা সত্ত্বেও উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ একে অন্যকে প্রভাবিত করে এবং অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃত্ব অনেক সময় ধর্মের দ্বারা সমর্থিত হয় এবং বৈধতা লাভ করে। এই প্রসঙ্গে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ মতটি উল্লেখযোগ্য। এই মতানুসারে রাষ্ট্র ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। রাজা হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং রাষ্ট্রের বৈধ শাসক। তাঁর মাধ্যমেই তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। রাজার আদেশ তাই ঈশ্বরের আদেশ। জনগণের কর্তব্য হল বিনা প্রতিবাদে তা মেনে চলা। রাজার আদেশ অমান্য করার অর্থ হল ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধিতা করা। তাই রাজদ্রোহিতা হল ধর্মদ্রোহিতা। প্রাচীন ভারত, জাপান, মিশর ইত্যাদি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের প্রচলন ছিল। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মপুত্র বলা হয়। রামায়ণের রামচন্দ্র হলেন বিষ্ণু। হিব্রু ধারণা ও ওল্ড টেস্টামেন্টেও রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি ভাবা হত।

মধ্যযুগের খ্রীষ্টান জগতে ধর্মগুরু পোপ এবং রাষ্ট্রের শাসক রাজার মধ্যে দীর্ঘদিন বিরোধ চলেছে। পোপ না রাজা—কে ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিনিধি এই ছিল বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু। উভয়েই জনগণের কাছে নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে প্রচার করে জনগণের আনুগত্য দাবি করেন।

একই সমাজে দু'টি কর্তৃত্বের উদ্ভব ঘটে। প্রথম দিকে চার্চের পোপ প্রাধান্য বিস্তার করেন। অনেক সময় রাজসিংহাসনের জন্য অনেক উত্তরাধিকারী দেখা যেত। কখনও বা কোনও উত্তরাধিকারী মিলত না। ফলে উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ভার চার্চ গ্রহণ করত। অনেক সময় চার্চ রাজার শাসনকে বৈধতা প্রদান করত বা নতুন বিজিত ভূখণ্ডে কর্তৃত্ব প্রসারে সাহায্য করত। মধ্যযুগের শেষে অবশ্য ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে রাজাই স্বীকৃতি লাভ করেন। প্রটেস্টান্ট রিফর্মেশন স্বীকার করে যে, জাতীয় রাষ্ট্রের রাজারা প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্ষমতালাভ করেছেন। তবে সমগ্র মধ্যযুগ ধরেই ধর্ম ও রাজনীতির মিশ্রণ এবং চার্চের ধর্মজগৎ ছাড়াও পার্থিব জগতে প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টা দেখা যায়। রাজাও অনেক সময় চার্চের সমর্থন খুঁজতেন।

ধর্ম অনেক সময় বিপ্লব, বিদ্রোহ বা আন্দোলনকে সমর্থন করেছে। উদাহরণ হল প্রটেস্টান্ট আন্দোলন। এই আন্দোলনে ধর্মীয় স্বার্থ, রাজনৈতিক স্বার্থ ও জাতীয়তাবাদী চেতনার সমন্বয় দেখা যায়। এই আন্দোলনের অন্যতম কারণ হল ক্যাথলিক চার্চের বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এবং পোপের রাজনৈতিক ক্ষমতা হ্রাসের জন্য রাজাদের ইচ্ছা।

ধর্ম ও রাজনীতির যোগ প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। প্রাচীন ভারতে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে ক্ষত্রিয়রা শাসন ক্ষমতার অধিকারী হতেন, অর্থাৎ রাজপদ লাভ করতেন। আবার হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথা অনুসারে ক্ষত্রিয়দের ওপর ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হত। অর্থাৎ, রাজার প্রশাসনিক ক্ষমতার ওপর ছিল ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্বমূলক ভূমিকা। আবার ধর্মীয় অনুশাসনে রাজার দায়িত্ব বা কর্তব্যেরও উল্লেখ থাকত। প্রাচীন চীনদেশের ধর্মীয় বিধান অনুসারে দেশের নিরাপত্তা রক্ষা ও বন্যা দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ছিল চীন সম্রাটের ওপর। তিনি তাঁর দায়িত্বপালনে অসমর্থ হলে মনে করা হত যে, তিনি শাসনের জন্য ঈশ্বরের অনুমোদন হারিয়ে ফেলেছেন। সুতরাং, প্রাচীনকালে রাজার শাসনের কর্তৃত্ব ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা স্বীকৃত হত। আবার প্রজাদের অধিকারের প্রসঙ্গও সেখানে থাকত।

ধর্মানুরাগী ব্যক্তির রাজনীতি নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয়। দেশের বিপদে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশের অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁরাও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। রাজনীতির লোকেরাও ধর্মানুরাগীদের জীবনধারার

মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাকে অনুপ্রবিষ্ট করান। ফলে, আধ্যাত্মিক জগতের ধার্মিক মানুষেও রাজনৈতিক স্বার্থকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র ধর্মের জগতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেন না।

আধুনিক যুগে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক খুবই নিবিড়। ভারতের কেন্দ্রে ও রাজ্যে সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক বিষয়ের ওপর ধর্মীয় বিচার-বিবেচনার প্রভাব দেখা যায়। নির্বাচনী সাফল্যের জন্য রাজনৈতিক দলগুলি ধর্মীয় দল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে সমঝোতা করে। কোনও কোনও নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থী বাছাই প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলি ঐ এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রার্থীকে দলীয় প্রতীক প্রদান করে। আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করার পর মন্ত্রীসভা গঠনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও সরকার ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের এবং বিশেষভাবে সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর অনুভূতিকে অগ্রাহ্য করে না। রাজনৈতিক দলের নেতাদের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গুরু বা আচার্য বা মৌলানাদের আশীর্বাদ ও সমর্থন লাভের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করতে দেখা যায়। ধর্মীয় নেতারাও এই সুযোগকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন। এইভাবে ধর্মীয় নেতা ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সমঝোতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ধর্মীয় নেতারাও রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন এবং ধর্মীয় অনুগামীদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বা ভোট দেওয়ার বিষয়টিকে প্রভাবিত করেন।

২৪.৪.১ ধর্মীয় রাজনীতি

ধর্মীয় বিষয় বা পুরোহিত বা যাজক সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত ও রাষ্ট্রকেই ধর্মীয় রাষ্ট্র বলা হয়। এই ধর্মীয় রাষ্ট্রে ঐশ্বরিক আইন প্রচলিত থাকে, চার্চ বা যাজক সম্প্রদায় বা পুরোহিতদের প্রাধান্য থাকে এবং শাসনের বৈধতা আসে ঐশ্বরিক উৎস থেকে। মধ্যযুগে মুসলমানদের আমলে ভারতের শাসন ধর্মীয় রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত ছিল। সুলতানদের শাসনের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মের অনুশাসনগুলিকে কার্যকর করা। সুলতানরা প্রশাসনিক ও ধর্মীয় উভয় দিকেই চূড়ান্ত ক্ষমতাভোগ করতেন। সুলতানি আমলে শরিয়তের নির্দেশনামাই ছিল রাজকীয় অনুশাসনের ভিত্তি। ইসলাম ধর্মশাস্ত্রের নিয়মানুসারে সামাজিক নিয়ম প্রণীত হত।

ইসলামীয় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভিত্তি, শক্তি ও সংগঠন হিসাবে ধর্মের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর সেখানে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে প্রথমে পয়গম্বরের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর খলিফার কর্তৃত্ব দেখা যায়। শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে উলেমাদের প্রাধান্য ছিল। মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদই উলেমা নামে পরিচিত ছিলেন। উলেমারা শরিয়ৎ ব্যাখ্যা করতেন। সুলতানরা সেই ব্যাখ্যা মেনে তদনুসারে শাসন করতেন।

মধ্যযুগে ইউরোপেও চার্চের প্রাধান্য ছিল। পোপ গেলাসিয়াস—১ (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯২-৯৬) মধ্যযুগের ইউরোপে চার্চ ও রাজার দ্বৈত কর্তৃত্ব স্বীকার করেন এবং বলেন যে, উভয়ের মধ্যে চার্চের দায়িত্বই অধিকতর। রাজার কর্তব্য ছিল ঐশ্বরিক মতে চলা; কিন্তু পোপ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কর্তৃত্ব করতেন। রাজার দায়িত্ব ছিল পোপের মতে চলা। এক শতক আগে সেন্ট অ্যামব্রোস বলেছিলেন যে, রাজা চার্চের অন্তর্গত, চার্চের ওপর নয়। সমগ্র মধ্যযুগ ধরে ইউরোপে পোপের প্রাধান্য প্রচার করা হয়। রাজার ভূমিকা ছিল কর্তব্যপালন; রাজা তাঁর কর্তব্য ঠিকমত পালন করলে চার্চ ঈশ্বরের কাছ থেকে নির্দেশ দ্বারা রাজার শাসনকে যাথার্থ প্রদান করত। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে মার্সিগ্লিও, ম্যাকিয়াভেলি বা বোডিনের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত চার্চের আধ্যাত্মিক প্রাধান্য রাজনীতির জগতেও প্রসারিত ছিল।

বর্তমান ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র। এখানে ইসলাম ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। শাসন, আইন ও বিচার ব্যবস্থার ওপর কোরান ও শরিয়তের প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়। মধ্যপ্রাচ্যেও কিছু ইসলামীয় রাষ্ট্র আছে। সেখানেও শরিয়তের নির্দেশ অনুসারে শাসন, আইন, বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। অন্যদিকে, নেপাল হল হিন্দুরাষ্ট্র। তবে আধুনিক কালে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত।

২৪.৪.২ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি

মানব সভ্যতার প্রথম যুগে ধর্মই ছিল সমাজ ও রাজনীতির প্রধান নিয়ন্ত্রণ। প্রাকৃতিক কার্যকারণ সূত্র, প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিকাশ ইত্যাদি পরবর্তীকালে প্রকৃতির ওপর মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ফলে, ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের বদলে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রাধান্য দেখা যায়। ধর্মের দৃষ্টির বদলে যুক্তি ও জ্ঞানের সাহায্যে মানুষের জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। ফলে রাজনীতিতেও পরিবর্তন দেখা যায়। ধর্মীয় রাজনীতির বদলে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে।

পশ্চিমী জগতে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক থেকে রাজনীতি ও পার্থিব বিষয় থেকে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়কে পৃথক করা হয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে, ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে ধর্মের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি বলতে অধার্মিক বা ধর্মবিরোধী বা দেবতাহীন রাষ্ট্রকে বোঝায় না। রাষ্ট্রীয় কাজে ধর্মীয় বিবেচনার অবলুপ্তি, সব ধর্মের লোকেদের সমান সুযোগ, মনুষ্যসৃষ্ট আইনের প্রাধান্য, জনগণের নির্দেশ দ্বারা রাজনৈতিক বৈধতাকরণ এবং রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র দ্বারা রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনাকে বোঝায়। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে রাজনৈতিক ধ্যানধারণার ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমস্যাসমূহের সমাধান করা হয়, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা গুরুত্ব লাভ করে এবং যুক্তির মানদণ্ডে সমস্ত বিষয় স্থিরীকৃত হয়।

ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি বর্তমানের বৈশিষ্ট্য। স্বাধীন ভারতের সংবিধান ১৯৫০ সালে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির প্রতিষ্ঠা করেছে। আধুনিক যুগে শিক্ষার প্রসার, নারীশিক্ষার বিস্তার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও পশ্চিমীকরণের প্রভাব এই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি বিকাশে সহায়তা করেছে। বিভিন্ন দেশে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির অনুকূলে নানা সাংবিধানিক ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে।

এসত্ত্বেও বলা যাবে না ধর্ম ও রাজনীতির কোনও সংযোগ বর্তমানে নেই। ধর্মীয়, রাজকীয় বা পুরোহিততন্ত্র এখন আর নেই। কিন্তু রাজনীতি ও ধর্মের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এখনও পুরোপুরি বন্ধ হয় নি। সংগঠিত খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীরা ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি। ইহুদি ধর্ম, ইসলাম মৌলবাদ, চরমপন্থী ক্যাথলিক মতবাদ এখনও বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে শিখ ধর্মাবলম্বীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলনী - ৩

১। ধর্ম ও রাজনীতির সম্বন্ধ আলোচনা করুন।
(আপনার উত্তর ১৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

২। ধর্মীয় রাজনীতি বলতে কী বোঝায়?
(আপনার উত্তর ১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

৩। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি বলতে কী বোঝায়?
(আপনার উত্তর ১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সীমিত হবে)

২৪.৫ সারাংশ

আলোচ্য এককে ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে ধর্মের ধারণা, তারপর ধর্ম ও সমাজের সম্পর্ক, ধর্মের ইতিবাচক ও নেতিবাচক সামাজিক ভূমিকা এবং সবশেষে ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক, ধর্মীয় রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির আলোচনা করা হয়েছে। ধর্ম এক উচ্চতর সত্তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করে। ধর্মের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি সেই উচ্চতর সত্তার আশীর্বাদ লাভ করতে চায়। ধর্মের মধ্যে একদিকে বিশ্বাস ও আবেগ অন্যদিকে কিছু কর্মপদ্ধতি ও অনুষ্ঠান আছে। প্রথমটি ধর্মের ভিতরের এবং দ্বিতীয়টি ধর্মের বাইরের দিক। অনেকে আবার মানবতা, শুদ্ধতা ও সত্যকেই ধর্ম মনে করেন। মার্ক্সবাদীরা ধর্মকে সমালোচনার চোখে দেখেন এবং ধর্মকে শ্রেণীশোষণের উপায় মনে করেন।

ধর্ম সমাজে নীতিবোধ প্রতিষ্ঠা করে এবং ব্যক্তি ও সমাজের বাহ্যিক আচরণ ও মানসিক ভাবনাচিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। বিপদের সময় ধর্মের আশ্রয় ব্যক্তিকে, সমাজকে নিরাপত্তা প্রদান করে। ধর্মীয় প্রেরণায় নানা উন্নত সাহিত্য, চিত্রকলা, সৌধ, সঙ্গীত ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে এবং সংস্কৃতির উন্নতি ঘটেছে। বস্তুজগতের অর্থনৈতিক আচরণেও ধর্মীয় প্রভাব দেখা যায়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বহু লোকের সমাবেশ তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে এবং সমাজের ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করে। ধর্মের সমাজসেবামূলক কাজও কম নয়।

ধর্ম আবার ব্যক্তিকে উচ্চতর সত্তার প্রতি নির্ভরশীল করে তার স্বাধীন বিকাশকে বাধা দেয় ও তাকে ভাগ্যনির্ভর করে তোলে। ধর্ম অনেক সময় কুসংস্কারের জন্ম দেয় ও বিজ্ঞানবিমুখতা সৃষ্টি করে। ফলে সমাজের প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়। ধর্মীয় আবেগ অনেক সময় বিদ্বেষ ও বিভেদমূলক প্রবণতা নিয়ে আসে। মার্ক্স তো ধর্মকে শ্রেণীশোষণের উপায় মনে করেন।

ধর্ম আবার রাজনীতিকে প্রভাবিত করে এবং রাজনীতি দ্বারাও প্রভাবিত হয়। ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ ধর্মের সাহায্যে রাজার প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। মধ্যযুগে পোপ ও রাজার মধ্যে বিরোধ ঘটেছে এবং উভয়েই নিজ প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টা করেছে। ধর্ম অনেক সময় বিপ্লব বা আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছে। ধর্মীয় প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন আধুনিক নির্বাচনী রাজনীতিতে গুরুত্বলাভ করেছে।

মধ্যযুগে ইউরোপে ও ভারতে ধর্মীয় রাজনীতি প্রচলিত ছিল। এখন নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণের ফলে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি প্রাধান্যলাভ করেছে। ভারতের সংবিধান ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সূচনা ঘটিয়েছে। তবে এখনও মাঝে মাঝে রাজনীতি ও ধর্মের সংযোগ নানা মৌলবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বা নির্বাচনী রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য।

২৪.৭ অনুশীলনী

১। ধর্ম বলতে কী বোঝায়?
(১৫ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমিত হবে)

২। ধর্মের সামাজিক ভূমিকা কী?
(২০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমিত হবে)

৩। ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক আলোচনা করুন।
(৩০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমিত হবে)

৪। ধর্মীয় রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি কাকে বলে?
(২০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমিত হবে)

২৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১) Rakhahari Chatterjee (ed.) : Religion, Politics and Communication, The South Asian experience, South Asian Publishers Pvt. Ltd., New Delhi 110002, 1994, pp. 1-20.

২) Bottomore : Sociology, Blackie & Son (India Ltd.), Bombay, 1979 (4th Impression), pp. 237-249.

৩) Roumila Thapar : From Lineage to State, Oxford, New Delhi, 1990, pp. 62-7.

৪) অনাদি কুমার মহাপাত্র : রাজনীতিক সমাজতত্ত্ব, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলেজ স্কোয়ার (পশ্চিম) ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৪২১-৪৬১।

৫) Kingsley Davis : Human Society, Surjeet Publication, Delhi, 1981, pp. 509-545.

৬) টম বটোমার : সমাজবিদ্যা, অনুবাদক হিমাচল চক্রবর্তী, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, নিউ দিল্লী, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ২৪৭-২৬২।

৭) ড. অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় : প্রসঙ্গ সমাজতত্ত্ব, সেন্ট্রাল বুক পাবলিকেশন, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২৩৮-২৫৮।

একক ২৫ □ রাজনৈতিক যোগাযোগ

গঠন

২৫.০ উদ্দেশ্য

২৫.১ প্রস্তাবনা

২৫.২ রাজনৈতিক যোগাযোগ

২৫.২.১ রাজনৈতিক যোগাযোগের সংজ্ঞা

২৫.২.২ বিষয়টির উদ্ভব ও বিকাশ

২৫.২.৩ সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা

২৫.৩ রাজনৈতিক যোগাযোগের মূল উপাদান

২৫.৩.১ যোগাযোগের কাঠামো ঃ প্রকৃতি ও গুরুত্ব

২৫.৩.২ যোগাযোগের প্রক্রিয়া ঃ রাজনৈতিক গতিশীলতা

২৫.৩.৩ ব্যবস্থার সক্ষমতা

২৫.৩.৪ রূপান্তর ক্রিয়া

২৫.৪ প্রযুক্তি বিপ্লব ও রাজনৈতিক যোগাযোগ

২৫.৫ উপসংহার

২৫.৬ অনুশীলনী

২৫.৭ গ্রন্থপঞ্জী

২৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককের নিম্নলিখিত অংশে আপনি যা জানতে পারবেন—

- যোগাযোগ কেন রাজনীতির প্রধান চালিকা শক্তি।
- 'রাজনৈতিক' ও 'যোগাযোগ'-এর বিভিন্ন সংজ্ঞা; রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য।
- গ্রীকযুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত রাজনৈতিক যোগাযোগের উদ্ভব ও বিকাশে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট; রাজনৈতিক যোগাযোগের অতিসরল ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতা।
- রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার কাঠামোগত প্রেক্ষিত।
- যোগাযোগ প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক গতিশীলতা।
- প্রযুক্তি বিপ্লবের প্রবল অগ্রগতি।

২৫.১ প্রস্তাবনা

এই পর্যায়ে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় রাজনৈতিক যোগাযোগ, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিতে সক্রিয় গোষ্ঠী। এই বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার জন্য যে প্রেক্ষাপটের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন, এখানে তা বর্ণনা করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব অবশ্যই এমন এক বিষয় বা রাজনীতি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্মোচনের দিকে নজর দেয়; তবে এই নজরেরও এক বৈশিষ্ট্য আছে। মনে রাখতে হবে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের ভিত্তি হল বৈধ ক্ষমতা। নিছক ক্ষমতার সঙ্গে বৈধ ক্ষমতার পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। নিছক ক্ষমতার পরিধি কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে **প্রভুত্ব (domination)**; এক্ষেত্রে যাদের ওপর প্রভুত্ব করা হয় তাদের ভূমিকা থাকে গৌণ। অন্যদিকে বৈধ ক্ষমতার পরিধিতে শাসিতের গুরুত্ব যথেষ্ট। এই গুরুত্বের কথা মনে রেখে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে তত্ত্বায়ণ প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে থাকে 'ক্ষমতা' (power) ও প্রভুত্বের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের প্রয়াস। এক্ষেত্রে অবশ্য প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স হেবার (Max Weber)-এর অবদান বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। বলা যেতে পারে 'ক্ষমতা', 'প্রভুত্ব' ও 'কর্তৃত্ব' (authority)-র প্রকৃতিগত ভিন্নতা ও পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করে তিনি রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ও অগ্রগতি সম্ভব করে তোলেন। পরবর্তী কালে তাঁর উপযুক্ত উত্তরসূরীগণ এই বিষয়ের বিস্তৃতিতে যথেষ্ট অবদান রাখেন।

ক্ষমতার সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এ কারণেই রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের আলোচনায় রাষ্ট্র-ক্ষমতাকে প্রভাবিত করা এবং ঐ ক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অধিকার করার গুরুত্ব অসীম। রাষ্ট্রের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হেবার নিজেই উল্লেখ করেছেন রাষ্ট্রের এক বৈশিষ্ট্যের কথা ঃ রাষ্ট্র এমন এক সংগঠন যা শারীরিক বল প্রয়োগের অধিকারকে বৈধভাবে নিজের আয়ত্তাধীন রাখে ("The State is an institution that legitimately monopolises the means of physical coercion")।

সংক্ষেপে বলা চলে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের মূল প্রেক্ষিত দুটি ঃ (১) ক্ষমতার প্রেক্ষিত—কীভাবে অন্যকে/অন্যদের নিজের ইচ্ছাধীন করে রাখা যায়; (২) কর্তৃত্বের প্রেক্ষিত—কীভাবে এই ক্ষমতার প্রতি সম্ভাব্য গ্রহীতাদের সম্মতি নিশ্চিত করা যায়। আমরা যখন আমাদের মূল বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করব তখন এই দুই প্রেক্ষিতের প্রাসঙ্গিকতা ক্রমশ স্পষ্ট হবে।

২৫.২ রাজনৈতিক যোগাযোগ

যোগাযোগ প্রক্রিয়া ব্যতীত মানব জীবন ও সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। আমাদের চেতনা, অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধান্ত সহ দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানবসভ্যতার বিস্ময়কর অগ্রগতির মূল চাবিকাঠিও এই যোগাযোগ। আমাদের জীবনের যোগাযোগের এই গুরুত্বের নিরিখেই বলা যায় যে রাজনৈতিক যোগাযোগ ব্যতীত রাজনৈতিক ব্যবস্থা পূর্ণতা লাভ করে না। আসলে রাজনীতির মূলেই আছে এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তথ্য ও মতামত আদান-প্রদান করা হয়।

আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব, এই শতাব্দীতে রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়া তত্ত্বায়ণ ও বাস্তবে ক্রমশ পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একটি বিষয়ই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে ঃ **যোগাযোগই রাজনীতির প্রধান চালিকা শক্তি।** এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কার্ল ডয়েশ (Karl Deutsch) তাঁর Nerves of Government নামক গ্রন্থের শুরুতেই বলেন, রাজনীতি ব্যাখ্যার কেন্দ্রমূলে রয়েছে যোগাযোগ বা প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের দাবী।

রাজনীতির ভিত্তিতেই আছে কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে—তা যে-কোনো অঞ্চলই হোক বা গোষ্ঠীই হোক বা রাষ্ট্র ও সমাজের মতো বৃহৎ সংগঠনই হোক—সংশ্লিষ্ট সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক। এই সম্পর্কের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক গঠন যে, যৌথতার চেতনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তার মূলেই আছে যোগাযোগ। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের মূল তিনটি ক্ষেত্রে নজর দিলে দেখা যায় প্রতিটির মধ্যেই সম্পৃক্ত হয়ে আছে যোগাযোগ প্রক্রিয়া ঃ

(১) **রাজনৈতিক বিন্যাসের সামাজিক ভিত্তি (Social foundation of political order)**—এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেভাবে সামাজিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

(২) **রাজনৈতিক আচরণের সামাজিক ভিত্তি (Social base of political behaviour)**—এক্ষেত্রে নির্বাচন, রাজনৈতিক মতামত, রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্যপদ এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ বা সমর্থনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(৩) **রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সামাজিক প্রেক্ষিত (Social dimensions of political process)**—এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতি ও অস্থিরতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

তবে রাজনৈতিক যোগাযোগের গুরুত্ব সন্দেহাতীত হলেও এই প্রক্রিয়ার সংজ্ঞার বিষয় বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। আমরা রাজনৈতিক যোগাযোগের সাধারণ (general) ও নির্দিষ্ট (specific) সংজ্ঞা উল্লেখ করতে পারি।

২৫.২.১ রাজনৈতিক যোগাযোগের সংজ্ঞা

'রাজনৈতিক' ও 'যোগাযোগ' এই দুই ধারণাকেই বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব। ব্যাপকার্থে 'যোগাযোগ'-এর অর্থ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে তথ্য, বক্তব্য, সংকেত এবং প্রতীকের আদান-প্রদান ব্যাপকার্থে রাজনীতি এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্তন আনা যায়। এই সূত্রে বলা যায়, রাজনৈতিক যোগাযোগ এক বিশেষ প্রক্রিয়া যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ইচ্ছাকৃত ও প্রণোদিত কার্যকলাপ অঙ্গীভূত। রাজনৈতিক যোগাযোগের এই সাধারণ সংজ্ঞার পরিধি স্বাভাবিকভাবেই বিস্তৃত। এক্ষেত্রে কোনও এক নির্বাচন প্রার্থীর বক্তৃতা বা এক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের আলোচনা, এমনকি কোনও এক সংগঠনের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর লিখিত নির্দেশও রাজনৈতিক যোগাযোগের আওতাভুক্ত।

অন্যদিকে রাজনৈতিক যোগাযোগের নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় তা এমন এক প্রক্রিয়া যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিশেষ প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্র সরকার সংক্রান্ত নানা তথ্য। ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভাবন ও প্রেরণ। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের কয়েকটি গবেষণামূলক কাজের উল্লেখ করে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। হ্যারল্ড লাসওয়েল (Harold Lasswell) তাঁর Propaganda Technique in the World War (১৯২৭) গ্রন্থে রেডিও ও লিফলেট বণ্টনের মাধ্যমে যে 'মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ' ব্যাখ্যা করেছেন তা রাজনৈতিক যোগাযোগের নির্দিষ্ট সংজ্ঞার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে টেলিভিশন, পোষ্টার ও বক্তৃতা, ভূমিকা ও আইন বিভাগ উদ্ভূত যোগাযোগ প্রক্রিয়া সৃষ্টিতে বিভিন্ন কমিটির প্রতিবেদন এবং সংসদীয় বক্তৃতা রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণে সাহায্য করে। যদিও এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন, উইলবার স্ক্র্যাম (Wilbur Schramm) ও সমমনোভাবাপন্ন বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে কয়েকটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এই প্রক্রিয়ার ব্যাপ্তি অনেক বেশি। তাদের মতে, এই সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যার ফলে ভ্রান্ত ধারণা হতে পারে যে এই তথ্য সম্প্রচার ক্ষমতাযুক্ত এই বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের বাইরে রাজনৈতিক যোগাযোগের গুরুত্ব কমে যায়।

উপরোক্ত যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক যোগাযোগের এক বহুল প্রচলিত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে : রাজনৈতিক যোগাযোগ এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে রাজনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন তথ্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার এক অংশ থেকে অন্য অংশে প্রেরিত হয়; এক্ষেত্রে সমাজের প্রতিটি স্তরে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে তথ্য আদানপ্রদান ঘটে থাকে।

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ববিদরা এ বিষয়ে একমত যে রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার দুটি মূল উদ্দেশ্য হল তথ্য প্রদান (twin form) ও প্রত্যয় উৎপাদনের চেষ্টা (persuasion)। এক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন হল : **কে বা কারা পরিবর্তন ঘটাচ্ছে? কার/কাদের পরিবর্তন হচ্ছে? কেন এই পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হচ্ছে?**

২৫.২.২ বিষয়টির উদ্ভব ও বিকাশ

রাজনৈতিক যোগাযোগের বিশ্লেষণ প্রধানত রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের আওতাভুক্ত হলেও এই বিশ্লেষণের সূত্র রয়েছে কয়েকজন মহান দার্শনিকের চিন্তাভাবনায়। এক্ষেত্রে প্লেটো (Plato)-র **Gorgius,** এ্যারিস্টটল (Aristotle)-এর **Rhetoric,** জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)-এর **System of Logic** ও ম্যাকিয়াভেলি (Machiavelli)-এর **The Prince** উল্লেখযোগ্য। প্লেটো তাঁর ঐ গ্রন্থে প্রচার (propaganda)-এর নৈতিক প্রেক্ষিত সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ্যারিস্টটল ও মিলের উদ্দেশ্য ছিল উৎস হিসেবে বিতর্কের কাঠামোগত রূপ আলোচনা করা।

Rhetoric গ্রন্থে এ্যারিস্টটল প্রত্যয় উৎপাদনের তিনটি কারণ উল্লেখ করেন। প্রথম, বক্তার ব্যক্তিগত চরিত্র : দ্বিতীয়, 'গ্রহীতা'র (audience) একটি বিশেষ মানসিক অবস্থা; তৃতীয়, বক্তার বক্তব্যের প্রখরতা। এ্যারিস্টটল আরও উল্লেখ করেন, সার্থকভাবে এই প্রত্যয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে বক্তার যুক্তিবোধ প্রখর হতে হবে ও এর সঙ্গে থাকতে হবে মানুষের আবেগ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, পরবর্তী কালে মার্কস (Marx)-এর

German Ideology বা সোরেল (Sorel)-এর Reflection on Violence বা লেনিন (Lenin)-এর What is to be Done বা প্যারেটো (Pareto)-এর The Mind and Society রাজনৈতিক যোগাযোগের ঐ বিশেষ দার্শনিক ঐতিহ্যেরই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন।

বিংশ শতাব্দীতেই রাজনৈতিক যোগাযোগ ও এই প্রক্রিয়া সংক্রান্ত প্রত্যয় উৎপাদনের চেষ্টা রাজনীতিতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পায়। অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে উদ্ভাবিত প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের (representative democracy)-এর উদ্ভব ও ক্রমবর্ধমান প্রভাবের যোগ লক্ষ্য করা যায়। তবে বিংশ শতাব্দীতেই জনগণের প্রতিনিধিদের মধ্যে এই সচেতনতা বাড়ে যে ক্ষমতা পেতে বা টিকিয়ে রাখতে হলে শুধুমাত্র নিজে/নিজের বিবেচনায় সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি প্রণয়ন বা রূপায়ণ করলেই চলবে না। ক্ষমতা ধরে রাখতে গেলে জনসাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে যে গৃহীত নীতি সাধারণভাবে কাম্য এবং এই নীতি প্রণয়ন ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট যোগ্যতার অধিকারীরাই নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাজনৈতিকভাবে এই প্রত্যয় গড়ে তোলা সম্ভব তখনই যখন এক বা একাধিক ব্যক্তি/গোষ্ঠী নিজের/নিজেদের ইচ্ছার দ্বারা অন্যদের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করতে পারে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক যোগাযোগকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ারূপে গণ্য করতে হয় যার মাধ্যমে প্রেরক কোনও রাজনৈতিক তথ্য গ্রহীতার কাছে এমনভাবে পাঠায় যে তার ফলে গ্রহীতা অন্যথায় যে কাজ করতো না তা করতে বাধ্য হয়। রাজনৈতিক যোগাযোগের এরূপ বর্ণনায় তিনটি উপাদান লক্ষণীয় ঃ

(১) রাজনৈতিক তথ্য; (২) রাজনৈতিক তথ্য প্রেরণ বা বণ্টনের বিশেষ পদ্ধতি ও (৩) গ্রহীতাকে একটি বিশেষ আচরণ পালনে বাধ্য করানোর ইচ্ছা। উদাহরণস্বরূপ এমন এক কথা ভাবা যেতে পারে যেখানে উন্নয়নের অভাবে স্থানীয় জনগণ নির্বাচনে ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এক্ষেত্রে হয়তো দেখা গেল যে রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচিত হলে এলাকার উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন বা স্থানীয় মানুষের দাবী ও অভিযোগ সরকারের কাছে তুলে ধরবেন। এ ধরনের প্রতিশ্রুতির ফলে এলাকার মানুষ তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে ভোট দিলেন। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক যোগাযোগ সার্থকভাবে ঘটল বলা চলে।

রাজনৈতিক যোগাযোগের উদ্ভব ও বিকাশে আভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপটের মতো আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের তাত্ত্বিক ও প্রক্রিয়াগত বিকাশের দুই বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে। আমাদের আলোচনার সীমিত পরিসরে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। তবে একথা বলা প্রয়োজন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক যোগাযোগ সংক্রান্ত গবেষণায় নতুনভাবে আলোকসম্পাত করা হয়। লাস্‌ওয়েল তাঁর পূর্বোল্লিখিত গবেষণায় দেখিয়েছেন যে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson)-এর চোদ্দ দফা কর্মসূচী (Fourteen Points) উদ্ভাবনের সময় থেকেই মিত্রশক্তি জার্মানীর বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রচারভিত্তিক মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ শুরু করে। অন্যদিকে জার্মানীও নিজের কায়দায় রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপন করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে জার্মান শাসকবর্গ একপেশে তথ্য প্রেরণের মাধ্যমে জনগণকে বোঝায় যে জার্মান যোদ্ধাদের যুদ্ধক্ষেত্রে দক্ষতার অভাবে এই পরাজয় আসেনি; এই পরাজয়ের কারণ মিত্রশক্তির মিথ্যা প্রচারে জার্মানীর বিভ্রান্তি।

আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একদিকে যেমন নাৎসী সম্প্রচার অব্যাহত থাকে অন্যদিকে ব্রিটিশ ও মার্কিনী গুপ্তচর সংগঠনগুলি ঐ সম্প্রচারের মধ্য দিয়ে নাৎসী সামরিক বাহিনীর গুপ্ত পরিচালনা সম্পর্কে হদিশ পাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। এভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাজনৈতিক যোগাযোগ এক নতুন রূপ পায়। বিষয়টি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যাক। আলেকজান্ডার জর্জ (Alexander George) তাঁর Propaganda Analysis গ্রন্থে দেখিয়েছেন, নিয়মিত নাৎসী সম্প্রচারে বর্ণিত জার্মান নেতাদের ক্রমানুসার, পূর্বতন ঘটনাসমূহের উল্লেখ, সম্প্রচারে বর্ণিত কোনও এক বিশেষ আদলের পরিবর্তে নয়া আদলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, প্রস্তুতি প্রবণতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে কীভাবে জার্মানীর দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ হদিশ করা হত। রাজনৈতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির বিশেষত্ব এখানেই যে এটি এমন এক পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে যখন তথ্য আদানপ্রদানে মুক্ত প্রবাহ থাকে না। এক্ষেত্রে 'নিহিত অর্থ' খুঁজতে হয় এমন এক পরিস্থিতিতে যখন কোনও রাজনৈতিক গোষ্ঠী (এক্ষেত্রে নাৎসী) একদিকে যোগাযোগ রক্ষা করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে সীমাবদ্ধতার জন্য সহজ স্বাভাবিকভাবে তথ্য সম্প্রচারও সম্ভব হয় না।

শীতল যুদ্ধ (Cold War)-এর আমলে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক ও রাজনৈতিক যোগাযোগ বিশেষজ্ঞগণ উপরোক্ত রাজনৈতিক যোগাযোগ পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছেন। যদিও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতির গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। কোনও রাষ্ট্রে শাসকবর্গ বিরোধীদের কাছে আপাত নিরীহ তথ্য আদানপ্রদান বিশ্লেষণে সচেষ্ট হয় বা যখন রাজনীতিবিদগণ কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রকাশ্য তথ্য আদানপ্রদানের মধ্যে দিয়েই 'নিহিত অর্থ' আদানপ্রদান করে। তখন এই পদ্ধতির বাস্তবায়িত হয়।

২৫.২.৩ সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা

আভ্যন্তরীণ স্তরেই হোক বা আন্তর্জাতিক স্তরেই হোক রাজনৈতিক যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রমাণ করে যে ঐ প্রক্রিয়ার কোনও অতি সরলীকৃত সংজ্ঞার বিপদ অনেক। প্রাথমিকভাবে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মূলে নিশ্চয় থাকে তথ্য আদানপ্রদান প্রক্রিয়া। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে রয়েছে নানা ধরনের জটিলতা। এই কারণেই যখন দুই রাজনীতিবিদ পারস্পরিক কুশল বিনিময় করেন, সেই আপাত সরল প্রক্রিয়ার মধ্যে চাপা থাকতে পারে নানা জটিলতা। ঐ প্রকাশ্য বিনিময়ের মধ্যেই থাকতে পরে নানা গুপ্ত সঙ্কেত।

এই বক্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায়, রাজনৈতিক যোগাযোগের অতি সরল সংজ্ঞার মধ্যে দিয়ে ঐ প্রক্রিয়ার জটিলতা ধরা পড়ে না। দু-একটি উদাহরণের মাধ্যমে বক্তব্যটি স্পষ্ট করা যেতে পারে। যেমন উল্লেখ করা হল যে রাজনৈতিক যোগাযোগের অতিসরল সংজ্ঞার মধ্যে দিয়ে রাজনীতিবিদ্‌দের 'স্বাভাবিক সংলাপের' অন্তর্নিহিত সঙ্কেত ধরা পড়ে না। আবার কোনও মন্ত্রীর কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়া ও সরকারের ওপর সেই কেলেঙ্কারির প্রভাবের মাধ্যমে যে রাজনৈতিক যোগাযোগ তৈরী হয় তাও ধরা পড়ে না কোনও অতি সরল সংজ্ঞায়। আবার, কোনও এক জনসভায় এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা সম্পূর্ণ নীরব থেকেও তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমে যে রাজনৈতিক যোগাযোগ ঘটাতে পারেন তাও ধরা পড়ে না কোনও অতি সরলীকৃত সংজ্ঞায়। আসলে সঙ্কীর্ণ অর্থে 'তথ্য'কে ব্যাখ্যা করলে, যে তথ্য এই নীরব রাজনীতিতে অশৃঙ্খ তা দৃষ্টির আড়ালে থেকে যাবে।

রাজনৈতিক যোগাযোগের সরলীকৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিপজ্জনক বলেই অন্য একটি প্রবণতা সম্পর্কেও কিছু রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ববিদ সাবধানতা অবলম্বন করেন। এই প্রবণতা হল রাজনৈতিক যোগাযোগ ও প্রচারকে সমার্থক করে তোলা। রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার বহু লক্ষ্যের একটি অবশ্যই প্রচার। এ বিষয়টি আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। কিন্তু এই লক্ষ্যকে 'একমাত্র' লক্ষ্য মনে করলে বিভ্রান্তি বাড়বে। যোগাযোগের অন্যান্য লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে দৃষ্টি আকর্ষণ, আগ্রহ সৃষ্টি ও প্রণোদন (motivation)। এই লক্ষ্যগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করে রাজনৈতিক যোগাযোগকে 'প্রচার সর্বস্ব' করে তোলার অর্থ ঐ জটিল প্রক্রিয়ার সামগ্রিকতা বদলে অংশবিশেষে গুরুত্ব দেওয়া।

২৫.৩ রাজনৈতিক যোগাযোগের মূল উপাদান

রাজনৈতিক যোগাযোগের মূল উপাদান রাজনৈতিক তথ্যের প্রসার **(dissemination)** ঘটে এক বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। রাজনীতিবিদদের বক্তৃতা, নির্বাচনী ইস্তাহার (manifesto), সরকারি সিদ্ধান্ত বা জননীতি সংক্রান্ত বিতর্ক প্রভৃতি রাজনৈতিক তথ্য প্রসারিত হয় রাজনৈতিক দল, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী, আইনসভা, দলীয় সম্মেলন বা রেডিও টেলিভিশনের সম্প্রচার মাধ্যমে। তবে এই ধরনের যোগাযোগ প্রক্রিয়া সংস্থানগতভাবে (structurally) রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশবিশেষ। এই প্রক্রিয়ার মূলে অবশ্য থাকে সেই প্রশ্নসমূহ যা লাসওয়েল রাজনীতি ও যোগাযোগের সম্পর্কের ভিত্তি বলে গণ্য করেন। কে কী মন্তব্য করেছে, কী ভাবে, কার উদ্দেশ্যে, কী ধরনের প্রভাবসহ? (Who says what, in what channel, to whom, with what effects?)

রাজনৈতিক যোগাযোগের এই প্রক্রিয়াগত বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে আমরা কাঠামোগত প্রেক্ষিতের আলোচনায় যাব।

২৫.৩.১ যোগাযোগ কাঠামো ঃ প্রকৃতি ও গুরুত্ব

আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে পাঁচটি কাঠামোর উল্লেখ করা যেতে পারে যার রাজনৈতিক তথ্য প্রসারের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে ঃ (১) অনানুষ্ঠানিক মুখোমুখি যোগাযোগ; (২) সাবেকি সামাজিক কাঠামো—যেমন পরিবার, ধর্মীয় গোষ্ঠী; (৩) রাজনৈতিক 'উৎপাদ' (output) কাঠামো—যেমন আইন বিভাগ ও আমলাতন্ত্র; (৪) রাজনৈতিক 'উপপাদ' (input) কাঠামো—যেমন, বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী; (৪) গণমাধ্যম।

অনানুষ্ঠানিক মুখোমুখি যোগাযোগের গুরুত্ব যে-কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই অনিবার্য। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের এই ধরণের কাঠামো কীভাবে উন্নতমানের যোগাযোগ প্রক্রিয়ার জন্ম দেয় তা নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। ইলিহু কাজ্ ও পল লাজারসফেল্ড (Elihu Katz and Paul Lazarsfeld) Personal Influence নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন অধিকাংশ ব্যক্তির ওপরই এধরনের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী বা প্রতিবেশীর মন্তব্য বা বিবৃতি মানুষের জ্ঞান, বিশ্বাস ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টিতে সহায়তা করে। সাধারণভাবে যেসব সমাজে আনুষ্ঠানিক কাঠামো দুর্বল যেসব ক্ষেত্রে এই ধরনের যোগাযোগই রাজনৈতিক

তথ্য আদানপ্রদান ও প্রত্যয় নির্মাণের একমাত্র পথ, তবে উন্নত আধুনিক সমাজেও এই ধরনের যোগাযোগের গুরুত্ব কিছু কম নয়। যদিও তা রাজনৈতিক যোগাযোগের একমাত্র ভিত্তি নয়। কাজ ও লাজারসফেল্ড দেখিয়েছেন যে কোনো ব্যক্তির রাজনৈতিক সচেতনতা ও মতামত অনেকাংশেই সৃষ্টি হয় কয়েকজন বিশেষ 'মতসৃষ্টিকারী নেতৃবৃন্দের' (Opinion leaders) মাধ্যমে যারা আমাদেরই "কাছের লোক"। ঐ বিশেষজ্ঞদ্বয়ের মতে, সামাজিক মর্যাদার অধিকারী ও মিশুকে প্রকৃতির কারণেই তারা মতামত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

'আধুনিক' রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সাবেকি সামাজিক কাঠামোয় গুরুত্ব অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা গেলেও এর প্রভাব প্রকৃতপক্ষে যথেষ্ট। যদিও সাবেকি সমাজে—যেমন আদিবাসী সমাজ—এই শ্রেণীর কাঠামোর উপস্থিতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। আদিবাসী সমাজ 'প্রধান' বা সর্দার অথবা বয়োবৃদ্ধদের সংগঠন (council of elders) অথবা পরিবর্ধিত পরিবার বা ধর্মীয় নেতারা সমাজ বা জাতিগোষ্ঠীর কাছে তথ্য প্রদান বা ব্যাখ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধভিক্ষুদের ভূমিকাও প্রমাণ করে আদিবাসী বা প্রাচীন রাষ্ট্রে ধর্মীয় নেতাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব। ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে মৌলবিদের রাজনৈতিক ভূমিকা বা ফিলিপিন্সের মতো রাষ্ট্রে ক্যাথলিক যাজক ও আবেদি গোষ্ঠীর ভূমিকাও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। মনে রাখতে হবে, এই বিশেষ কাঠামো উদ্ভূত রাজনৈতিক যোগাযোগ জাতীয় ঐক্য সৃষ্টিতে সাহায্যও করতে পারে বা বাধাও দিতে পারে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 'উৎপাদ' কাঠামোর ভূমিকাও অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে সরকারি সংগঠনের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হয়। আমলাতন্ত্রের কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ নীতি রূপায়ণের নানা নির্দেশ সংঘবদ্ধভাবে শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে পৌঁছে যায়। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই সরকার নামক 'সংগঠন' বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে ও সামাজিক সম্পদে সরলতা সৃষ্টি করে। নাগরিকদের সঙ্গে সরকারের 'জনসংযোগ'ও সম্ভব হয় ঐ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে বিচারবিভাগেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। জনগণের নানা অভিযোগের নিষ্পত্তি করে এই বিভাগ সরকার সম্পর্কে জনমনে বৈধতা তৈরি করে। অনেক ক্ষেত্রে সরকারি সংগঠনগুলি জনসাধারণের মধ্যে সাধারণ তথ্যও (general information) প্রদান করে। অন্যদিকে বিশেষ তথ্য ছাড়াও নানা ধরনের খবর (news releases) প্রকাশ্যে এনে সরকারি সংগঠনগুলি গণমাধ্যমের তথ্য আহরণের বড় সূত্র হিসেবে কাজ করে।

রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার 'উপপাদ' (input) কাঠামোর মধ্যে রাজনৈতিক দল ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ভূমিকাই প্রধান। প্রকৃতিগতভাবে এই ধরনের সংগঠন জনসাধারণের নানা দাবী/অভিযোগ ও স্বার্থের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিচিতি ঘটায়, যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল ও এই ধরনের গোষ্ঠী সরকারি বিরোধিতার সম্মুখীন না হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সেখানে এরা সাধারণ নাগরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সর্বোচ্চ স্তরের মধ্যে প্রয়োজনীয় অথচ বিরল সংযোগ ঘটাতে সমর্থ হয়। অন্যদিকে নেতৃবৃন্দের নানাবিধ কাজকর্ম সম্পর্কেও জনগণকে অবহিত করা আবার রাজনৈতিক দল ও সঙ্ঘবদ্ধ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীসমূহ জনগণের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করে নিজস্ব মতাদর্শ বা কর্মসূচী সমর্থন আদায় করে। এর মধ্যে দিয়ে জনগণের সচেতনতা ও সক্রিয়তা বৃদ্ধি হয়।

বিংশ শতাব্দীর শেষে ও একাবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে রাজনৈতিক যোগাযোগের যে বিশেষ কাঠামো প্রবল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠছে তা গণমাধ্যম। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকা, বই, সিনেমা গণমাধ্যমেরই বিভিন্ন রূপ। আলোচ্য কাঠামোগুলির মধ্যে গণমাধ্যমই হল বিশেষীকরণ (specialization) ও পৃথকীকরণের (differentiation) সার্থকতম উদাহরণ। এই কাঠামোর অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার ওপর। যথোপযুক্ত প্রযুক্তির সাহায্য পেলে গণমাধ্যম নানা বাধা এড়িয়ে বহু মানুষের কাছে তথ্য/বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম। ঐ কারণেই গণমাধ্যমের ব্যাপ্তি (mileage)-এর সঙ্গে অন্য কোনও মাধ্যমের তুলনা হয় না। সদিচ্ছা থাকলে শক্তিশালী গণমাধ্যমের উপস্থিতিতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব জনসাধারণের মধ্যে নানা বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ ও সচেতনতা বাড়াতে পারেন। গণমাধ্যমের মধ্য দিয়েই জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গী নির্ধারণ করা যায়। একইভাবে গণমাধ্যমের সাহায্যে তথ্য আদানপ্রদান হলে অবহিত (informed) জনগণ (public) নানাবিধ রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত জ্ঞাপন করতে পারে, এমনকি রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। ওয়াকিবহাল ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রয়োজনবোধে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও দেশবাসীকে পরিবর্তনের প্রয়োজন সম্পর্কে উৎসাহিত করতে গণমাধ্যমকে কাজে লাগাতে পারে। সুতরাং শাসকই হোক বা সাধারণ নাগরিকই হোক, প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক যোগাযোগের সুযোগ করে দিয়ে গণমাধ্যম রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণে বড় ভূমিকা পালন করার ক্ষমতা রাখে। এই কারণেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুক্ত রাজনৈতিক পরিমণ্ডল রক্ষা করতে মুক্ত গণমাধ্যমের ভূমিকাকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বর্তমান যুগকে বলা হয় গণমাধ্যমের যুগ। গণমাধ্যমের এই বিস্তৃতির ফলে রাজনৈতিক যোগাযোগে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটছে তা আমরা পরবর্তী অংশে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

এই সূত্রে বলা যায়, কোনও সমাজে বা রাষ্ট্রে উপরোক্ত কাঠামোসমূহ কতটা কার্যকরী হবে তা নির্ভর করবে ঐ সমাজ বা রাষ্ট্রে এই কাঠামোসমূহের স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণের মাত্রার ওপর। স্বাভাবিকভাবেই স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এই কার্যকারিতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় অনেক কম হবে। শাসকমণ্ডলীর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাত্রা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলে ঐ কাঠামোসমূহের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠবে। তবে একথাও ঠিক যে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেও কোনও এক মাত্রায় তথ্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যেমন আমরা জানি যে নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নিরাপত্তাগত কারণে সেনসর (censor) প্রথা সব দেশেই চালু আছে। এক্ষেত্রেও পরোক্ষভাবে 'তথ্যই ক্ষমতা' এই ধারণাটির গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

২৫.৩.২ যোগাযোগ প্রক্রিয়া ঃ রাজনৈতিক গতিশীলতা

অ্যামন্ড ও পাওয়েল (G. A. Almond and G. B. Powell) Comparative Politics গ্রন্থে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, ব্যবস্থা সক্ষমতা (system capability), নীতিপ্রণয়ন (rule formulation) ও স্বার্থ প্রত্যক্ষকরণ (interest articulation) প্রভৃতি প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক গতিশীলতা ব্যাখ্যা করেছেন। এক্ষেত্রে সামগ্রিক প্রক্রিয়াটিকে চারভাগে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা হয় ঃ (১) **সংরক্ষণ ও অভিযোজন ক্রিয়া ঃ রাজনৈতিক যোগাযোগ ও রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ** (Maintenance and Adaptation Function : Political Communication and Political Socializaiton); (২) **ব্যবস্থার সক্ষমতা ঃ**

যোগাযোগের প্রসার ও সামাজিক সচলতা (system capabilities : Expansion and Social Moblization); (৩) রূপান্তর ক্রিয়া ১ ঃ রাজনৈতিক যোগাযোগ ও নীতি প্রণয়ন (Conversion Functions : Pol. Communication and Rule Making); (৪) রূপান্তর ক্রিয়া ২ ঃ রাজনৈতিক যোগাযোগ ও স্বার্থপ্রত্যক্ষকরণ (Conversion Functions : Political Communication and Interest Articulation)। নীচে এই চারটি বিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হল।

আলোচনার পূর্ব সূত্র ধরে বলা যায় পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা চার্চ ইত্যাদির মতো ধর্মীয় সংগঠনের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিবর্গের রাজনীতি/রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা গড়ে ওঠে। এর মধ্যে দিয়ে যে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া চলে তা কোনও ব্যক্তিকে কোনও একটি বিশেষ বিষয় সম্পর্কে পরিচিত করে তুলতে পারে আবার কোনও একটি ধারণা ভেঙে নতুন ধারণার জন্ম দিতে পারে। এই ধরনের যোগাযোগ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া পশ্চিমি আধুনিক সমাজের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে সরল কারণ ঐ দেশগুলিতে কিছু ক্ষেত্র (যেমন ঃ উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের মধ্যে শ্রেণীবিভাজন) ব্যতীত তথ্যপ্রবাহ সাধারণভাবে সমজাতীয়। এই প্রক্রিয়া অনেক জটিল আকার ধারণ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যেখানে তথ্যপ্রবাহের বৈচিত্র্য অনেক বেশি। তবে যে-কোনও পরিস্থিতিতেই জাতীয় ঐক্য সৃষ্টিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের এই ভূমিকার সঙ্গে মতসৃষ্টিকারী নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক দল ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীরও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এই যোগাযোগ সামাজিকীকরণের 'ভাঙাগড়ার খেলা'ই নির্ধারণ করে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ বা অভিযোজনের মাত্রা।

২৫.৩.৩ ব্যবস্থার সক্ষমতা

কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাই আধুনিক যুগে 'তথ্য বিস্ফোরণের' (Info-explosion) হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে না। এর সঙ্গে রয়েছে অসংখ্য দাবী ও চাহিদা যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ঘটার সঙ্গেই সমাজের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী, জাতিগোষ্ঠী, আঞ্চলিক গোষ্ঠী, প্রভৃতি নিজস্ব চাহিদা প্রেরণে সচেতন ও সচেষ্ট হয়ে ওঠে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ক্ষেত্রে এই প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি কারণ এই দেশগুলির সাবেকিয়ানা (traditionalism) ও খণ্ডীকরণ (fragmentation) দূর করে প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের সচলতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়।

আসলে সামাজিক সচলতা অনেকাংশেই যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ার ফল। নগরায়ণ, সাক্ষরতা, প্রাচীন প্রথা—সম্পর্ক-বিশ্বাস-রীতিনীতির ধর্মীয় শাসন মুক্ত করা, কর্মসংস্থান—এ সবই জড়িয়ে আছে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ার সঙ্গে। এই ধরনের সচলতা যেমন একদিকে কাম্য, অন্যদিকে এর মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সক্ষমতাও পরীক্ষিত হয়। যদি নানা দাবী ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সামাজিক সচলতার মধ্যে দিয়ে বৃদ্ধি পেয়ে অনেক সময় এমন আকার নেয় যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা তা সামাল দিতে পারে না; এক্ষেত্রে নানা অস্থিরতা ও অসন্তোষ সমাজে দেখা দেবে যার মধ্যে দিয়ে ঐ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বড় চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হতে পারে। সমাজতত্ত্ববিদরা যাকে "ক্রমবর্ধমান আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপ্লব" (revolution of rising

expectations) বলেছেন তা প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে এভাবে এক উভয় সঙ্কটের মধ্যে ফেলে দেয়।

২৫.৩.৪ রূপান্তর ক্রিয়া

নীতি প্রণয়ন নির্ভর করে সিদ্ধান্তের ওপর। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আবার প্রয়োজন নির্ভুল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখন নীতি প্রণয়ন করবেন তখন স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ, জনসাধারণের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী, প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদ প্রভৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্যাদি তাদের কাছে থাকা জরুরি। তবে, তথ্য সরবরাহে সীমাবদ্ধতা ও বিকৃতির সম্ভাবনাও থেকে যায়। নানাবিধ কারণে তা ঘটতে পারে। প্রথমত ঃ একটি নির্দিষ্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শুধু একটি নির্দিষ্ট মাত্রাতেই তথ্য ব্যবহার (process) করতে পারে। দ্বিতীয়ত ঃ ব্যক্তিগত ইচ্ছা, আবেগ ও প্রবণতা ও অনেকক্ষেত্রে প্রশাসনিক প্রভাবে তথ্যের বিকৃতি ঘটতে পারে। বিশেষ করে যে ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা উচ্চপর্যায়ের কেন্দ্রীভূত সেসব ক্ষেত্রে এই সীমাবদ্ধতা ও বিকৃতির সম্ভাবনা বেশি। অন্যদিকে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে সেক্ষেত্রে এই ধরনের বিচ্যুতির সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম।

ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটলে সামান্য সংখ্যক শাসক ও উচ্চপদস্থ আমলার পক্ষে রাষ্ট্রের অজস্র দায়িত্ব সংক্রান্ত অসংখ্য তথ্য মনে রাখা ও সঠিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃবর্গের ক্ষমতা সম্পর্কে জনগণের শ্রদ্ধা থাকলেও কারও পক্ষেই সামরিক প্রযুক্তি, রাজনৈতিক কৌশল, মুদ্রাস্ফীতি, পরিবহন, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, শিল্পায়ন প্রভৃতি ভিন্ন চরিত্রের বিষয় সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যের ওপর নিজের দখল রাখা অসম্ভব। অন্যদিকে, বর্তমান যুগে বহু তথ্যের (technical) প্রকৃতির কারণে নেতৃবৃন্দের কাছে দুর্বোধ্য থেকে যায়। এ ছাড়াও আছে শাসক ও প্রশাসকদের নানা ধরনের অযৌক্তিক কাজকর্ম যা তথ্যবিকৃতিতে সাহায্য করে।

এলিট শাসকবর্গের ক্রিয়াকলাপ ও তার ফলান সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ও ব্যক্তিগত পর্যায় তথ্য আদানপ্রদানের ভূমিকা আগেই আলোচিত হয়েছে। এই ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই "জনগণের আওয়াজ" (vox populi) স্পষ্টভাবে শাসকদের কাছে পৌঁছে যায়। তবে এই ধরনের যোগাযোগ বিন্যাসের অন্য একটি দিকও লক্ষ্যণীয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় শাসকবর্গ এই জনসচেতনতা রুদ্ধ করতে সচেষ্ট হন। নানাভাবে এই কাজ করা যেতে পারে। প্রথমত ঃ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বহু ক্ষেত্রেই কার্যকারণগত সম্পর্কে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে শাসকগণ কোনও একটি নীতি গ্রহণের পেছনে প্রকৃত কারণ কী তা ব্যাখ্যা না করে সম্পূর্ণ অন্য কারণ তুলে ধরতে পারেন। দ্বিতীয়ত ঃ বর্তমান বিশেষীকরণের যুগে সরকারি কাজকর্ম বহু ক্ষেত্রে বিশেষীকৃত জ্ঞান কৌশলগত জটিলতার সঙ্গে জড়িত থাকে। এক্ষেত্রে কোনও সরকারি নীতি বা পদক্ষেপ মূল্যায়ন করাও সেই নাগরিকের পক্ষে সহজ হয় না। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণ নাগরিকের কাছে সরকারি বাজেটের এই ধরনের দুর্বোধ্যতার কথা বলা যেতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে তথ্যের অভাবে যোগাযোগ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। তৃতীয়ত ঃ অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণ শাসনব্যবস্থা ও ঐ ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকার ফলে কোনও

আগ্রহ বা সক্রিয়তা দেখায় না। সাধারণত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও নাগরিকদের মধ্যে মানসিক ব্যবধান বেশি হলে এ ধরনের নিস্পৃহতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে স্বার্থ প্রত্যক্ষকরণের কোনও তাগিদও চোখে পড়ে না। তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশে এই ধরনের পরিস্থিতি চোখে পড়ে।

২৫.৪ প্রযুক্তি বিপ্লব ও রাজনৈতিক যোগাযোগ

প্রযুক্তি বিপ্লবের যুগে রাজনৈতিক যোগাযোগ কী ধরনের পরিবর্তন ঘটছে, এ অংশে সে বিষয়ে আলোচনা করব।

বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনছে প্রযুক্তি বিপ্লব। পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে গণমাধ্যম—বিশেষভাবে বৈদ্যুতিন (electronic) গণমাধ্যম। বর্তমান জগতে রাজনৈতিক কর্মী (actors) ও সাধারণ নাগরিকের বহু ভূমিকা পালনে, বহু বিষয় অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে এবং সাধারণভাবে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বিশ্বায়নের যুগে গণমাধ্যমের এই প্রসার সম্পূর্ণভাবে না হলেও বহুলাংশে পরিসর (space) ও সময়ের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছে। এর কারণ বিশ্বায়নের মূলে বিশ্বব্যাপী সামাজিক সম্পর্কের এমন তীব্র অগ্রগতি যার মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানসমূহের যোগসূত্রই সাধিত হয় না, স্থানীয় ঘটনা ও দূরবর্তী ঘটনা একে অন্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

এক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রশ্নই শুধু নয়, জাতীয় সত্তা ও সাংস্কৃতিক সত্তা বিশ্বসংস্কৃতি ও স্থানীয় সংস্কৃতির প্রশ্নও জড়িত। যোগাযোগ প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের যোগসূত্র ও তার প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। উপগ্রহ যোগাযোগের মাধ্যমে যেমন বিভিন্ন স্থানের মধ্যে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে এবং তার ফলে আমাদের সময় ও পরিসরের তাৎপর্য সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে, ভৌগোলিক ও সময়গত পার্থক্য সত্ত্বেও যেমন আমরা বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সম্প্রচার 'সরাসরি' দেখি। বলা যেতে পারে, দূরবর্তী এলাকাগুলির মধ্যে নিকট সম্পর্ক স্থাপনে যা যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগান্তকারী পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সম্ভব হচ্ছে, তা আন্তর্জাতিক স্তরে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলছে। গণমাধ্যমে এক্ষেত্রে কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার ফলে রাজনৈতিক যোগাযোগের আলোচনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করা হয়েছে গণমাধ্যম-উদ্ভূত ঘটনা (Media event) 'মিডিয়া ইভেন্ট'।

'মিডিয়া ইভেন্ট' বড় মাপের ঘটনা যা সাধারণভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 'গ্রহীতা'দের জন্য গণমাধ্যম দ্বারা পরিকল্পিত ও রূপায়িত হয়ে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। মিডিয়া ইভেন্ট-এর গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী (symbolic), রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য 'সাধারণ' ঘটনা থেকে একে পৃথক করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ রাজপরিবারের বিবাহ অনুষ্ঠান (যেমন চার্লস-ডায়না বিবাহ), গুরুত্বপূর্ণ উদ্বোধন অনুষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় সৎকার (যেমন রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষেত্রে) বা শান্তিচুক্তির স্বাক্ষর ইত্যাদি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। উন্নত প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের সাহায্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা সকলেই এই ধরনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হতে পারি। ডি হ্যালিন ও পি ম্যানচিনি (D. Hallin and P. Mancini)-এর মতো প্রথম সারির গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা মিডিয়া ইভেন্টের

গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেছেন, এই ঘটনাগুলি সামাজিক ফারাক দূর করে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমাজের সদস্যদের কাছাকাছি আসতে সাহায্য করে।

আন্তর্জাতিক স্তরে 'মিডিয়া ইভেন্ট'-এর গুরুত্বও অস্বীকার করা যায় না। বিশেষজ্ঞরা যেমন দেখিয়েছেন, আশির দশকে যুক্তরাষ্ট্র-সোভিয়েত যুক্তরাজ্যের উচ্চতম পর্যায় অনুষ্ঠিত বৈঠকের গুরুত্ব যতটা না গৃহীত সিদ্ধান্তের কারণে ছিল তার থেকে অনেক বেশি ছিল যে মানবিকতার ভিত্তিতে ঐ বৈঠকগুলি অনুষ্ঠিত হয় তার জন্য। ঐ বৈঠকগুলি সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধারণা জন্মায় যে রাজনৈতিক শত্রুতা দূর করে বন্ধুত্বের বাতাবরণ তৈরিতে দীর্ঘ দিনের শত্রুদ্বয় বদ্ধপরিকর। এর মধ্যে দিয়ে 'দর্শক'রা এই বৈঠকগুলির রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন যার মধ্যে দিয়ে আবার ঐ বৈঠকগুলি বৈধতা অর্জন করে। সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসেবে ভারত-পাকিস্তানের বাস চলাচল (১৯৯৯) ও তার সরাসরি সম্প্রচার এই আলোকে দেখা যেতে পারে।

উচ্চমানের তথ্যপ্রযুক্তি এই ধরনের 'মিডিয়া ইভেন্ট'কে অনেক সহজে আন্তর্জাতিক রূপ দেয়। দূরবর্তী বিভিন্ন এলাকার বহু গ্রহীতা/নাগরিক এই 'ঘটনার' অংশগ্রহণ করে দর্শক হিসেবে পর্যবেক্ষক হিসেবে, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী হিসেবে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রনীতির প্রচার ও বৈধকরণে এই বিপুলসংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ ব্যবহার করা হয়। কাজ ও দয়ান্ (E. Katz and D. Dayan) Media Events গ্রন্থে বলেন —"কোনও ঘটনার সরাসরি সম্প্রচার ঐ ঘটনার সাফল্যের বিষয়ে প্রবল চাপ সৃষ্টি করে...এক্ষেত্রে ঐ ঘটনা শুধু সফল হলেই হবে না, এক বিশেষ সময়সীমার মধ্যে এই সাফল্য আসতে হবে।"

এক্ষেত্রে উল্লেখ উপরোক্ত গ্রন্থে লেখকদ্বয় 'মিডিয়া ইভেন্ট'-এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে জনমত, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কূটনীতি, পরিবার, ধর্ম, প্রভৃতি বিষয়ের ওপর এর প্রভাব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

অন্যদিকে, 'মিডিয়া ইভেন্ট'-এর সমালোচনাও জোরালোভাবে হচ্ছে। রাজনৈতিক যোগাযোগের আলোচনায় সমালোচনার গুরুত্বও কম নয়। সমালোচকের বক্তব্যকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, গণমাধ্যম এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে এক বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রাধান্য দেয়। এর ফলে আন্তর্জাতিক স্তরে এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর আধিপত্য কায়েম হয় ও বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুত্ব হারিয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, উন্নত যোগাযোগ প্রযুক্তির অধিকারী ও নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্রগুলিতে ঘটা ঘটনা বিশ্বজুড়ে যত সহজে যে মাত্রায় সম্প্রচারিত করা সম্ভব তা তুলনামূলকভাবে অনুন্নত প্রযুক্তির অধিকারী ও দুর্বল রাষ্ট্রের সীমানায় ঘটা ঘটনার ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তৃতীয়ত, 'মিডিয়া ইভেন্ট'-এর প্রবল প্রসার ও জনপ্রিয়তার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত ঘটনাপ্রবাহ চাপা পড়ে যায়। যেমন অতীতে যুক্তরাষ্ট্র-সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ বৈঠকের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে এই দুই রাষ্ট্রে মতানৈক্যের বিষয়গুলি মতৈক্যের জোরদার প্রচারে চোখের আড়ালে চলে যায়।

'মিডিয়া ইভেন্ট'-এর গুরুত্ব অলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞগণ এও মনে করেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে গ্রহীতাদের মধ্যে অন্যভাবে কল্পচিত্র (images) সম্প্রচার করেও নিজস্ব ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। 'অন্যভাবে' বলতে এখানে এমন এক সম্প্রচার পদ্ধতির কথা বলা হচ্ছে যেখানে কল্পচিত্র এক নিয়ন্ত্রিত যোগাযোগ প্রক্রিয়ার বিশেষ 'মোড়ক' (package)-এর অংশ হিসেবে উদ্ভূত হয় না। বরং এক্ষেত্রে কূটনৈতিক

প্রক্রিয়া ব্যাহত করতে পারে এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে গণমাধ্যমকে দূরে রাখা হয়। গণমাধ্যমের উপস্থিতি মানে কোনও কূটনৈতিক বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের বিব্রতকর প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া বা বৈঠকে আলোচিত বিষয়ের, 'অন্যরকম' বিশ্লেষণ হওয়া বা বহিরাগতদের বিতর্কে জড়িয়ে ফেলা। এই ধারণা থেকেই জন্ম নেয় এই বিশ্বাস যে গণমাধ্যম অতিরিক্ত নজর কূটনীতির অস্তিত্ব বিপন্ন করে। একারণেই অনেক কূটনৈতিক প্রক্রিয়া গণমাধ্যমের চোখের আড়ালে 'গোপনীয়তা' রক্ষা করে সংঘটিত হয়। তবে, এর ফলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। তথ্যবিপ্লবের যুগে একথা সর্বজনবিদিত যে রাজনৈতিক কর্মী ও জনগণের মধ্যে সংযোগ রক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা ক্রমাগত বাড়ছে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতেও গণমাধ্যমের ভূমিকা সামান্য নয়। অবশ্য দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও নাটকীয় পরিবর্তনের বদলে গণমাধ্যমের কাজ হয় নানা তথ্যকে দৃষ্টিগোচরে আনা, নতুন তথ্য সরবরাহ করা। জনমতকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণের পক্ষে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

২৫.৫ উপসংহার

রাজনৈতিক যোগাযোগের আলোচনা থেকে এ বিষয় স্পষ্ট যে এই প্রক্রিয়ার নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এর গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য এই গুরুত্ব বৃদ্ধির নেতিবাচক দিকও আছে। তবে গণমাধ্যমের প্রবল উত্থানের যুগে নাগরিক একদিকে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও অন্যদিকে গণমাধ্যমের 'লক্ষ্য' হয়ে উঠেছে। দু'পক্ষেরই দাবী তারাই জনগণ। নাগরিকের স্বার্থে কাজ করে। যদিও বাস্তব চিত্র এই যে দু'পক্ষেই নিজেদের স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট, বহুক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার দাবী এতই জোরালো হয়ে ওঠে যে জনগণের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সয়ানসন (D. Swanson)-এর মতো বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের মতো "দ্বিতীয় গণমাধ্যম-কেন্দ্রিক গণতন্ত্র"ও অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিককে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রকৃত অংশগ্রহণকারী হিসেবে না দেখে 'দর্শক' হিসেবেই গণ্য করা হয়। এই সমস্যার সমাধান তখন সম্ভব যখন জনসাধারণ রাজনৈতিক যোগাযোগের গুরুত্ব বুঝে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও গণমাধ্যমেরও ব্যবহার করে নিজেদের উপস্থিতি ও সক্ষমতা (capability) বাড়াতে ব্যবহার করবে। সাধারণ নাগরিকের সক্রিয় ভূমিকা বাস্তবায়িত হলে রাজনৈতিক যোগাযোগের পরিধি আরও বিস্তৃত হবে।

২৫.৬ অনুশীলনী

অতি সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

১। রাজনৈতিক যোগাযোগের মূল উদ্দেশ্য কী?

২। রাজনৈতিক যোগাযোগ সম্পর্কে হ্যারল্ড লাসওয়েলের বক্তব্য জানান।

স্বল্প পরিসরে উত্তর দিন ঃ

১। রাজনৈতিক যোগাযোগের সর্বসম্মত সংজ্ঞা নেই কেন?

২। 'মিডিয়া ইভেন্ট'-এর অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

বিশদভাবে উত্তর দিন ঃ

১। রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার উদ্ভব ও বিকাশ ব্যাখ্যা করুন।

২। রাজনৈতিক যোগাযোগ কাঠামোর প্রকৃতি ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

২৫.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। G. A. Almond and G. B. Powell : Comparative Politics (New Delhi), 1972, পরিচ্ছেদ ঃ "Communicative Function".

২। Michael Rush : Politics and Society (New York), 1992 পরিচ্ছেদ ঃ "Political Communication".

৩। David L. Shills ed. International Encyclopaedia of Social Science, Volumes 3+4, 1972, pp. 90-102.

একক ২৬ □ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ

গঠন

২৬.০ উদ্দেশ্য

২৬.১ প্রস্তাবনা

২৬.২ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ঃ সংজ্ঞা

২৬.৩ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ঃ বিশ্লেষকদের ভূমিকা

২৬.৪ অংশগ্রহন ঃ প্রধান নির্দেশকসমূহ

২৬.৪.১ লিঙ্গ

২৬.৪.২ শিক্ষা

২৬.৪.৩ ব্যক্তিগত জীবনধারা

২৬.৫ অংশগ্রহণ ঃ কাঠামোগত-পরিবেশগত দিক

২৬.৫.১ রাজনৈতিক ফলপ্রসূতা

২৬.৫.২ নীতি, সমাজ ও ধারণা

২৬.৬ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও গণতন্ত্র

২৬.৬.১ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

২৬.৬.২ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র

২৬.৬.৩ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র

২৬.৬.৪ অংশগ্রহণ ও এলিট তত্ত্ব

২৬.৬.৫ অংশগ্রহণ ও নিষ্ক্রিয়তা ঃ মতামতের খতিয়ান

২৬.৭ বৈদ্যুতিন গণতন্ত্র

২৬.৮ অনুশীলনী

২৬.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককের পরিশেষে আপনি যা জানতে পারবেন—

- রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অপরিহার্য ভূমিকা; রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সংজ্ঞা;
- রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সম্পর্কে লেস্টার মিলব্র্যাথসহ বিভিন্ন বিশ্লেষকের চিন্তাধারা;

- লিঙ্গ শিক্ষা, ব্যক্তিগত জীবনধারা, রাজনৈতিক ফলপ্রসূতা, নীতি-সমাজ-ধারণার বিস্তৃত আলোচনার ভিত্তিতে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মূল নির্দেশসমূহের পরিচয়;
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্র এবং সমাজতান্ত্রিক ধারণার প্রসঙ্গের অংশগ্রহণের প্রকৃত নির্ধারণ;
- রাজনৈতিক অংশগ্রহণের এলিট তত্ত্ব;
- অংশগ্রহণ ও নিষ্ক্রিয়তার আলোকে দুটি বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামতের খতিয়ান;
- রাজনৈতিক অংশগ্রহণের 'আধুনিকতম ধারণা'—বৈদ্যুতিন গণতন্ত্র যা নয়া প্রযুক্তির মাধ্যমে অংশগ্রহণের ধারণার উপর গড়ে উঠেছে।

২৬.১ প্রস্তাবনা

রাজনৈতিক যোগাযোগ সম্পর্কে আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায়, আমরা প্রত্যেকেই এক বিশেষ, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাস করে রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করি। তাতে আমাদের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ব্যবহার ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে নিজেদের আচরণের ধরন-ধারণে বৈচিত্র্য অনেক। কোনও কোনও ব্যক্তিকে রাজনীতিতে অত্যন্ত সক্রিয় হতে দেখা যায়; এদের মধ্যে কেউ রাজনৈতিক দলে যোগাদান করে, কেউবা নির্বাচনের সময়ে কোনও বিশেষ প্রার্থীর হয়ে প্রচারে সচেষ্ট হয়, কেউবা কোনও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকে। এদের মধ্যে কেউ রাজনীতির মাধ্যমে কোনও উচ্চ প্রশাসনিক পদে আসীন হন। অন্যদিকে বহু ব্যক্তি আছেন যারা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে থাকেন, এমনকি ভোটদানেও তারা আগ্রহ দেখান না।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ

সমাজবিজ্ঞানে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের গুরুত্ব কোথায়? এর উত্তরে প্রাথমিকভাবে বলা যেতে পারে, গণতন্ত্রই হোক বা অন্য বাবস্থাই হোক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ব্যতীত তা চলতে পারে না। আর এর মধ্যেই রয়েছে অংশগ্রহণের সূত্র। অন্যদিকে যে নাগরিক অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় সে অংশগ্রহণকারীদের তুলনায় কম ক্ষমতার অধিকারী যদিও অংশগ্রহণকারী মাত্রই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয় না, ও অংশগ্রহণ না করলেও ক্ষমতার ভাগী হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নষ্ট হয়।

বিশেষকরে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অধিকারকে ঐ ব্যবস্থার অন্যান্য মূল বৈশিষ্ট্য যেমন সম্মতি, দায়বদ্ধতা, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, জনগণের স্বাধিকার প্রভৃতি থেকে পৃথক করা যায় না। সাবেকি রাজতন্ত্রের যুগে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবশালী ও বিত্তশালীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপক প্রচলন ছিল। কিন্তু ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণকে গুরুত্ব দিয়ে গণতন্ত্রের প্রসার ঘটার ফলে নীতিগতভাবে প্রত্যেকেই এই অংশগ্রহণের অধিকার লাভ করেছে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণই সাধারণ নাগরিকের সেই মূল্যবান হাতিয়ার যার মাধ্যমে শাসকবর্গের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা বা প্রত্যাহার করা যায়, যার মাধ্যমে শাসককে শাসিতের প্রতি দায়বদ্ধ করে তোলা যেতে পারে।

মনে রাখতে হবে গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের নিবিড় সম্পর্ক (এই এককের ৩. ২. ৪. অংশে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য) সত্ত্বেও স্বৈরাচারী রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেও রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়া উপেক্ষিত নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্বৈরাচারী শাসক গণতান্ত্রিক শাসকের চেয়েও এই প্রক্রিয়ায় বেশি গুরুত্ব দেন। নানা ধরনের আলোচনা, মিছিল, জনসভা, জনসংগঠন ও অন্যান্য কার্যকলাপের মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসক নিজের প্রতি জনসমর্থন প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন। হিটলার, মুসোলিনী, ফ্রাঙ্কো, বা জিয়াউল হক প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এই প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। যদিও এই ধরনের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সঙ্গে গণতান্ত্রিক স্তরে ঐ প্রক্রিয়ার গুণগত পার্থক্য থেকেই যায়। স্বৈরতন্ত্রের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া কোনওভাবে জননীতির ওপর প্রভাব বিস্তার বা শাসকদের নির্বাচনে জনসাধারণকে 'প্রকৃত সুযোগ' দেয় না। বলা যায়, জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মিথ্যা ধারণা গড়ে তুলে শাসকবর্গের প্রতি সমর্থন আদায় করা ও তার মাধ্যমে শাসনের বৈধতা অর্জনই এই ধরনের নির্দেশিত অংশগ্রহণের (dictated participation)-এর মূল উদ্দেশ্য। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রক্রিয়াতে জনসমর্থনের নামে স্বৈরতন্ত্রকে মজবুত করা হয়।

২৬.২ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ঃ সংজ্ঞা

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এত প্রভাবশালী হলেও একে সংজ্ঞায়িত করা সহজ নয়। সাধারণভাবে এই প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা হয় এইভাবে ঃ **রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এমন স্বেচ্ছাধীন (Voluntary) প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজের শাসক নির্বাচনে ও জননীতি প্রণয়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা নেয়।** এক্ষেত্রে 'স্বেচ্ছাধীন' কার্যকলাপের ওপর জোর দিলে সমস্যা হয় এই যে বলপ্রয়োগ করে যে ধরনের 'অংশগ্রহণ'-এ বাধ্য করা হয় তা ঐ সংজ্ঞার বাইরে থেকে যায়। কোনও স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় এ ধরনের বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ রাজনীতির অত্যন্ত পরিচিত প্রথা। এ ধরনের সমস্যার কথা ভেবেই রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিশ্লেষকগণ এমন এক সংজ্ঞার সন্ধান করেন যার অন্তর্ভুক্তির ক্ষমতা বেশি। যেমন রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অর্থ হল জননীতি প্রণয়ন ও রূপায়ণে অংশগ্রহণ। এই প্রক্রিয়ায় নাগরিকেরা সেই ধরনের কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত যা সাধারণভাবে গণপ্রতিনিধিদেরও আমলা দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে চায়। এই প্রক্রিয়ার লক্ষ্য দু'ধরনের ঃ (১) সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের প্রভাবিত করে কোনও একটি বিষয় সম্পর্কে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিতে উদ্বুদ্ধ করা; (২) কোনও একটি গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা।

এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, **শুধুমাত্র সফল কার্যকলাপই রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার আওতায় পড়ে** না। অর্থাৎ উপরোক্ত লক্ষ্য দুটির কোনও একটি পূরণের অংশগ্রহণকারী ব্যর্থ হলেও বলা যাবে যে তারা ঐ প্রক্রিয়ায় সামিল হয়েছে। এক্ষেত্রে আরও মনে রাখা দরকার যে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ শুধুমাত্র বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গেই জড়িত থাকে না। আপাতদৃষ্টিতে নিষ্ক্রিয় এমন কিছু ক্রিয়াকলাপ আছে যার মধ্যে দিয়ে এই অংশগ্রহণ ঘটে থাকে। যেমন পরিবারের সদস্য, বা বন্ধু বা সহকর্মীরা সঙ্গে আলোচনায় কোনও সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করাকেও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলে গ্রহণ করতে হবে।

সাম্প্রতিককালে বিশেষজ্ঞরা রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার কয়েকটি নির্দেশ চিহ্নিত করেছেন। এর মধ্যে নির্বাচনে সরাসরি অংশগ্রহণ, নির্বাচন প্রচারে জড়িত থাকা, রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্যপদ, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর

সক্রিয় সদস্যপদ, জননীতি প্রণয়ন বা রূপায়ণে মিছিল, ধর্মঘট বা বিক্ষোভে অংশগ্রহণ, আইনভঙ্গ আন্দোলনে অংশগ্রহণ, সরকারি উপদেষ্টা কমিটির সদস্যপদ, বিভিন্ন ধরনের যৌথ নাগরিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ প্রভৃতি মূল নির্দেশক রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

২৬.৩ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ঃ বিশ্লেষকদের ভূমিকা

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বিশ্লেষণে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন লেস্টার মিলব্র্যাথ (Lester Milbrath)। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত Political Participation : How and why do people get involved in Politics? নামক বহু প্রশংসিত গ্রন্থে মিলব্র্যাথের এই প্রক্রিয়াকে শ্রেণীবিন্যস্ত (hierarchical) প্রক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনটি বিন্যাস গোষ্ঠীর উল্লেখ করে মিলব্র্যাথ বলেন, সমাজের কোনও সদস্যকেই এই তিন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ক্রমান্বয়ে তিনটি বিন্যাস/শ্রেণী হল যোদ্ধা (Gladiators), দর্শক (Spectators), নিষ্ক্রিয় (Apathetic)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের ক্ষেত্রে মিলব্র্যাথের বক্তব্য, ৬০% 'দর্শক' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। প্রথম গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সেই ধরনের অংশগ্রহণকারী যারা সরকারি বা দলীয় পদে আসীন বা ঐ পদপ্রার্থী, কোনও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সদস্য বা রাজনৈতিক প্রচারে সক্রিয়। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তারা যারা রাজনৈতিক বিতর্কে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে বা বিশেষ এক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন ও অন্যদের সমর্থন আদায় করে, এমনকি কোনও বিশেষ রাজনৈতিক প্রতীক (badge) ধরন করে তাদের রাজনীতির প্রকাশ ঘটান। তৃতীয় গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত সেই নাগরিকসমূহ যারা কোনোপ্রকারে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখান না। এই প্রসঙ্গে মিলব্র্যাথের ব্যাখ্যা, এই শ্রেণীবিন্যাসের মূলে আছে এক ধরনের 'অন্তর্নিহিত যুক্তি' যার মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ স্বাভাবিক বৃদ্ধি (progression) ঘটে। মিলব্র্যাথের দাবী কোনও এক বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি উচ্চতর শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হতে চাইলে সময়, শক্তি ও সম্পদ অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়, তবে প্রতি স্তরেই অন্তর্ভুক্ত সদস্যেরা প্রয়োজনীয় বোঝাপড়া (adjustment) করতে প্রস্তুত থাকেন। তবে মিলব্র্যাথের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য, বহুক্ষেত্রে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ব্যক্তিসমূহ (যেমন, 'যোদ্ধাগণ') অন্য গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের (যেমন, 'দর্শক') মতো আচরণে লিপ্ত থাকেন। মিলব্র্যাথের এই ধারণা অবশ্য পরবর্তী বিশেষজ্ঞদের সমালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। মিলব্র্যাথ অবশ্য ১৯৭৭ সালে **Political Participation**-দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু সমালোচনার উত্তর দেন।

পরবর্তীকালে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বিশ্লেষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন সিডনি ভার্বা (Sidney Verba), নর্মান নাই (Norman H. Nie) ও জে. কিম্ (J. Kim)-এর মতো খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞরা। প্রথম দুজনের **Participation in America** ও তিনজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টা The Modes of Democratic Participation ও Participation and Political Equality, এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সত্তরের দশকে লিখিত এই গ্রন্থত্রয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সংক্রান্ত গবেষণাকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

উপরোক্ত ত্রয়ীর গবেষণায় একটি বিষয় বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমত, সামান্য ব্যতিক্রম বাদে রাজনৈতিক অংশগ্রহণকারীগণ এক-একটি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। অংশগ্রহণ ও বিশেষীকরণ

(specialization)-এর সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভার্বা ও তাঁর সহকর্মীদ্বয় ভিন্নধারায় রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি ঘটান। এক্ষেত্রে প্রতিবাদকারী (protestors), সক্রিয় সমাজকর্মী (community activists) যারা স্থানীয় বিষয়ে আগ্রহী, দলীয় ও প্রচার কর্মী (party and campaign workers), যোগাযোগকারী (communicators), সংযোগকারী (contactors) যারা বিশেষ কোনও বিষয়ে রাজনীতিবিদ্ ও আমলাদের সঙ্গে সংযোগ রাখেন, নির্বাচক (voter) ও নিষ্ক্রিয় (inactive)। আবার উল্লেখ করতে হয়, প্রত্যেক শ্রেণীর অংশগ্রহণকারীই সংশ্লিষ্ট কর্মে বিশেষজ্ঞ। যেমন, 'যোগাযোগকারী'রা যোগাযোগ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নানা বিষয়ে, 'সমাজকর্মী'রা স্থানীয় বিষয়ে বা 'সংযোগকারী'রা রাজনীতিবিদ্ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষায় বিশেষভাবে 'শিক্ষিত'।

২৬.৪ অংশগ্রহণ ঃ প্রধান নির্দেশকসমূহ

এই পর্যায়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সমাজবিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে মানব আচরণের নানাবিধ সাধারণ (general) তত্ত্ব নির্মাণের মাধ্যমে বহু প্রাসঙ্গিক ঘটনা ব্যাখ্যা করতে সফল হলেও এখনও পর্যন্ত রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে ভিত্তি করে এধরনের কোনও সফল সাধারণ তত্ত্ব গড়ে ওঠেনি তবে তার অর্থ এই নয় যে ধারণাগতভাবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মতো জটিল ও ব্যাপক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এক্ষেত্রে ব্যক্তি/ব্যক্তিসমূহের 'আভ্যন্তরীণ' ও 'বাহ্যিক' অবস্থার দিকে নজর দিলে তারা অংশগ্রহণে আগ্রহ বা অনাগ্রহ ব্যাখ্যা করা সহজ হয়।

এই অংশে আমরা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের নির্ণায়ক হিসেবে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণ ব্যাখ্যা করব। কারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে এবং কেন করে? আমরা যে নির্ণায়কসমূহ উল্লেখ করব বাস্তবে তা সম্পৃক্তভাবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে প্রণোদিত (motivate) করে। যদিও আলোচনার সুবিধার্থে আমরা নির্ধারকগুলিকে পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করব। এই বিভাগের প্রথম অংশে আমাদের আলোচনা রাজনৈতিক অংশগ্রহণে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নির্ণায়কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। পরবর্তী অংশে আমরা ঐ প্রক্রিয়ার কাঠামোতে (structural) কারণসমূহ আলোচনা করব।

এবার রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার ব্যক্তিকেন্দ্রিক নির্ণায়কের ভূমিকা আলোচনায় লিঙ্গ (Gender), শিক্ষা (education), ও ব্যক্তিগত জীবনধারণ (life patterns)-র ভূমিকা উল্লেখ করা যাক।

২৬.৪.১ লিঙ্গ

সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সংক্রান্ত গবেষণায় 'লিঙ্গ পার্থক্য' (Gender difference) গুরুত্বপূর্ণ রাশি (variable) হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। নির্দিষ্টভাবে বলা যায়, **ভোটার আচরণ বিষয়ে গবেষণা মহিলা ও পুরুষের রাজনৈতিক প্রবণতার মধ্যে ফারাক প্রমাণ করেছে।** এই ফারাক ভোটদানের হার, দলীয় আনুগত্য জননীতি বিষয়ে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনৈতিক নীতি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভোটদানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পঞ্চাশের দশকে গবেষকরা লক্ষ্য করেন, সাধারণভাবে

পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের প্রবণতা হল দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। মহিলাদের ঐ ধরনের রাজনৈতিক রক্ষণশীলতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশ্লেষকদের বক্তব্য, ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন, দীর্ঘ আয়ু ও রাজনৈতিক সংগঠনে সক্রিয়তার অভাব ইত্যাদি কারণে মহিলাদের একধরনের প্রবণতা দেখা যায়।

পরবর্তীকালে গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে মহিলাদের রাজনৈতিক রক্ষণশীলতার ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। পাশ্চাত্য দুনিয়ার উন্নত দেশসমূহে সাধারণভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ও বিশেষভাবে উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক পদে মহিলাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে; অনেকক্ষেত্রে, যেমন নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন ইত্যাদি দেশে মহিলাদের অংশগ্রহণ পুরুষদের সমপর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন Human Development Report-এ এই মাত্রায় মহিলাদের অংশগ্রহণকে নারী সক্ষমতা (Women empowerment)-র প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করা হয়। যদিও ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, ইটালি, আয়ারল্যান্ড ও ফ্রান্সে মহিলাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী তুলনামূলকভাবে রক্ষণশীল। পশ্চিমের অন্যান্য দেশে, মহিলারা এই রক্ষণশীলতা কাটিয়ে উঠছেন। সাম্প্রতিককালের গবেষণায় এও দেখা গিয়েছে যে ডেনমার্ক, পশ্চিম জার্মানী, স্পেন, কানাডা প্রভৃতি দেশে নতুন প্রজন্মের মহিলারা পুরুষদের তুলনায় বেশি সংখ্যায় বাম দলের সদস্য হচ্ছেন।

উল্লেখ্য যে উপরোক্ত গবেষণাসমূহ সম্পূর্ণভাবেই পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির প্রবণতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের মতো উন্নতিশীল দেশগুলিতে মহিলা-পুরুষের ফারাক রাজনীতির বিভিন্ন স্তর ও ক্ষেত্রে বিদ্যমান। যে আর্থসামাজিক অবস্থায় এই দেশগুলিতে পিতৃতান্ত্রিক বিন্যাস টিকে থাকে, সেখানে ঐ অবস্থার আমূল পরিবর্তন না ঘটা পর্যন্ত রাজনৈতিক অংশগ্রহণে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা পিছিয়ে থাকবে।

২৬.৪.২ শিক্ষা

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিশ্লেষণে শিক্ষা দীর্ঘদিন যাবৎ গবেষকদের কাছে গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। ষাটের দশকের প্রথমে এক বহু আলোচিত গবেষণায় Almond and Verba (এ্যামন্ড ও ভার্বা) উল্লেখ করেন, শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে নাগরিকগণ "গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি"র শরিক হতে পারে। কিছু ব্যতিক্রম সত্ত্বেও সাধারণভাবে 'শিক্ষিত' নাগরিক 'অশিক্ষিত' নাগরিকের তুলনায় রাজনীতিতে বেশি মাত্রায় অংশগ্রহণ করে বলে মনে করা হয়। অবশ্য 'শিক্ষা'র কোনও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নাই। সেক্ষেত্রে এক দেশে 'শিক্ষা'র যা অর্থ অন্য দেশে তা নাও হতে পারে। এই ধরনের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গবেষকদের বক্তব্য, কোনও এক ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা (যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি) থাকলে রাজনীতির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আগ্রহ জন্মায় এবং স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে অংশগ্রহণের প্রবণতা বাড়তে থাকে। তবে পশ্চিমি দেশগুলোর ক্ষেত্রে এই ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হলেও উন্নতিশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে 'শিক্ষিত' ও 'অশিক্ষিতের' অংশগ্রহণের এই ফারাক নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। এক্ষেত্রে কারও বক্তব্য, তৃতীয় বিশ্বের দেশে 'অশিক্ষিত'-দের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। তবে এই ধরনের অংশগ্রহণের মাত্রা কী তা খুব স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়।

বর্তমানে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিশ্লেষণে শিক্ষার ভূমিকা নিয়ে নতুন চিন্তাভাবনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষায় মিলব্র্যাথ বর্ণিত 'যোদ্ধা (gladiator)-র ভূমিকায় কোনও নাগরিকের অবতীর্ণ হওয়া এর একমাত্র কারণ কিনা এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কোনও এক রাজনৈতিক সংগঠনের উচ্চপদে আসীন হতে উচ্চশিক্ষার বদলে 'সততা' বা আনুগত্য নির্দেশক হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে, আকর্ষণীয় ক্ষমতা (Charisma) বা কুশলতা (skill) বা নিছক অর্থবলে কেউ নেতা হওয়ার সাধারণ রীতিনীতির বাইরে গিয়ে নেতৃপদে আসীন হতে পারে।

২৬.৪.৩ ব্যক্তিগত জীবনধারা

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সংক্রান্ত আলোচনায় কোনও ব্যক্তির অতীত বা বর্তমান জীবনধারার সঙ্গে তার অংশগ্রহণের সম্পর্ক বিশেষ স্থান পায়। জীবনধারা কোনও ব্যক্তির অংশগ্রহণের মাত্রা কমাতে বা বাড়াতে পারে। যেমন, কারও বিবাহবিচ্ছেদ বা আত্মীয় বিয়োগের ফলে তার অংশগ্রহণের মাত্রা কমতে পারে। অন্যদিকে, শ্রেণী, পেশা, আয়, লিঙ্গ, ব্যয়, প্রভৃতি আর্থসামাজিক রাশির অংশগ্রহণের সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের কাছে গুরুত্ব পেয়েছে। সাধারণভাবে, সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ওপর গঠনমূলক ও পরিবর্তনকারী প্রভাব ফেলে। বয়সের প্রসঙ্গে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তথ্যের ভিত্তিতে লক্ষ্য করা গিয়েছে, পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাত্রা কমে যায়। তবে এক্ষেত্রে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করতে হবে। আবার জার্মানীর ক্ষেত্রে দেখা যায় অন্তত নাগরিকদের ভোটদানের ক্ষেত্রে 'বয়স' কোনও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে, নানা ধরনের প্রতিবাদী কাজকর্মের সঙ্গে কমবয়সী নাগরিকদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সাধারণভাবে একটা পর্যায় অবধি বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে, ও ঐ পর্যায়ের পর অংশগ্রহণের মাত্রা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে। তবে বেশ কিছু উন্নত পশ্চিমী দেশে বর্তমানে প্রবীণদের অত্যন্ত সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকা ব্যাপক হারে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রবীণদের নানা দাবী ও অভিযোগ কর্তৃত্বের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বহু পশ্চিমী দেশে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী। এই ধরনের গোষ্ঠীতে যোগ দিয়ে 'নিষ্ক্রিয়' প্রবীণেরা সক্রিয় হয়ে উঠছেন—এ ধরনের ঘটনা রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

২৬.৫ অংশগ্রহণ ঃ কাঠামোগত - পরিবেশগত দিক

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার কাঠামোগত/পরিবেশগত আলোচনায় আসা যাক। এই ক্ষেত্রে আলোচনাকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ক্রিয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ফলপ্রসূতা ও কাঠামোর ক্ষেত্রে নীতি, সমাজ ও ধারণার ভূমিকা।

২৬.৫.১ রাজনৈতিক ফলপ্রসূতা

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি বা হ্রাসে সংস্থান ক্রিয়া কার্যকারণগত সম্পর্ক সাম্প্রতিক গবেষণায় বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। কেন কিছু ব্যক্তি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সামিল হয় আর অন্যরা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা

পালন করে, কেন কিছু ব্যক্তি রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন সাধন সম্ভব অথচ অন্যরা মনে করে "আমরা" অংশগ্রহণের মাধ্যমে কোনও পরিবর্তনই ঘটতে পারে না? এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ফলপ্রসূতা (political efficacy)-র ধারণায় অলোকপাত করা জরুরি। রাজনৈতিক ফলপ্রসূতার ধারণার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আবেগ, বিশ্বাস, ও অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক উপাদান। কোন ব্যক্তি যখন সে মনে করে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তার সার্থকতা বা যথার্থতা আছে—অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে বলা যায়, কোনও ব্যক্তির যখন এই চেতনা থাকে যে সে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম এবং তার অংশগ্রহণের মাধ্যমে সে রাজনৈতিক পরিবর্তনে সাহায্য করতে পারে, তখন বলা যাবে ঐ ব্যক্তির রাজনৈতিক ফলপ্রসূতা রয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্য ঐ ব্যক্তি তার নিজস্ব সামাজিক গোষ্ঠীর লক্ষ্য পূরণের ক্ষমতা সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করে তাও গুরুত্বপূর্ণ। বহু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি ও তাঁর গোষ্ঠী স্থিতাবস্থার পরিবর্তন আনতে পারবেন এই ধারণা বা বিশ্বাসই তাঁর সক্রিয়তার ভিত্তি মূলে থাকে। আবার এ ধরনের মানসিকতার অভাব থাকলে কোন ব্যক্তির সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হয়ে ওঠা সম্ভব হয় না।

রাজনৈতিক ফলপ্রসূতার সঙ্গে অংশগ্রহণকারীর/নাগরিকের বিশ্বস্ততার (Trust)-এর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। এই সম্পর্ককে চার ভাবে দেখা যেতে পারে। (১) কোনও এক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই দুটি ঠিকমাত্রায় থাকলে সেই ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীরা ঐ ব্যবস্থার প্রতি প্রবল সমর্থন জ্ঞাপন করে মজবুত করে তোলে।

(২) নিম্নমানের বিশ্বাসের সঙ্গে নিম্নমানের রাজনৈতিক ফলপ্রসূতা যোগফলে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শুধুমাত্র নির্বাচনে ও সঙ্কটে নাগরিকদের বিরল অংশগ্রহণের আশ্বাস পায়।

(৩) নিম্নমানের রাজনৈতিক যথার্থতার সঙ্গে নিম্নমানের বিশ্বাস যোগ হলে অংশগ্রহণকারীরা ক্ষমতাসীন কর্তৃত্বের আমূল পরিবর্তন সাধনে ব্রতী হয়।

(৪) নিম্নমানের রাজনৈতিক যথার্থতা ও নিম্নমাত্রার বিশ্বাসের ফলে নাগরিকরা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নিস্পৃহ থেকে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে।

২৬.৫.২ নীতি, সমাজ ও ধারণা

এবার রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাত্রা নির্ণয়ে কাঠামোগত প্রেক্ষিতের আলোচনায় আসা যাক। যে-কোনও রাষ্ট্রেই রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক সে দেশের আইনব্যবস্থা। প্রত্যেক দেশেই কতকগুলি বিশেষ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বৈধতা ও অন্যান্য কতকগুলি রাজনৈতিক ক্রিয়া অবৈধ বলে ঘোষিত হয়। যদিও অবৈধ ঘোষিত হওয়ার কারণে কেউ ঐ ধরনের ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করে না ঘটনা এমন নয়। আমরা জানি, হিটলার শাসিত নাৎসী জার্মানীতে নাৎসীদের বিরোধিতা সম্পূর্ণভাবে আইনি ছিল। আবার, ঐ রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় ইহুদী হওয়ার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া ছিল আইন স্বীকৃত। আবার, চীনে তিব্বতের স্বাধীনতার দাবী অবৈধ ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও সেখানে ঐ দাবীতে মাঝেমধ্যেই রাজনৈতিক তৎপরতা দেখা যায়।

বৈধ ও অবৈধ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে 'সন্ত্রাসবাদ' অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ কখনোই বৈধ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের আওতায় আসে না, তবে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়

ক্ষমতাসীন নেতৃবর্গ কীভাবে সন্ত্রাসকে ব্যাখ্যা করে সে বিষয়টি। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, সাধারণভাবে যে ধরনের কার্যকলাপ 'সন্ত্রাসমূলক' বলে চিহ্নিত করা হয় কোনও বিশেষ সরকার সেই কার্যকলাপের প্রকৃতি সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করে। উদারহণস্বরূপ, বিরোধী রাজনীতিবিদদের হত্যার ক্ষেত্রে কর্নেল গদ্দাফির নেতৃত্বাধীন লিবিয় সরকারের বক্তব্য উল্লেখ করা যায়। এক্ষেত্রে ঐ সরকারের বক্তব্য, দেশে বা বিদেশের বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের দেশপ্রেমিক লিবিয়রাই হত্যা করছে। আবার, কোনও দেশে 'সন্ত্রাসবাদী'দের 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' বলে বর্ণনা করাও যথেষ্ট প্রচলিত। যদিও এক্ষেত্রে সরকার 'সন্ত্রাসবাদী'দের বিরোধিতা করতে সচেষ্ট থাকে।

অন্যদিকে, স্বীকৃত ও বৈধ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াও কোনও কোনও ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণের আওতায় পড়ে। এক্ষেত্রে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনও রাষ্ট্র আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বণ্টন করে। যে-কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন নির্বাচক নাগরিকের পছন্দ অনুসারে এই আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বণ্টিত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাগরিক এই অধিকার ব্যবহার করার সুযোগ পায়। ঐ কারণেই নির্বাচন রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা পরিচিত পদ্ধতি। তবে কথাও মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক দেশেই কারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে এ বিষয়ে নানা বাধানিষেধ রয়েছে, অপ্রাপ্তবয়স্ক—বিশেষ করে আঠারো বছরের কম নাগরিকরা—ভোটদানের অধিকার সাধারণভাবে পায় না ও অনেক ক্ষেত্রে কয়েদী বা দেউলিয়া বা মানসিক বিকারগ্রস্থ নাগরিক ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। 'সার্বজনীন ভোটাধিকার' আজ বহু প্রশংসিত বিষয় হলেও এই 'সার্বজনীনতা'র ইতিহাস দীর্ঘ নয়। পৃথিবীর বহু দেশে মহিলারা পুরুষদের বহু পরে ভোটাধিকার লাভ করেছে। এমনকি সুইজারল্যান্ডের মতো 'আধুনিক ও উন্নত' দেশেও নির্বাচনে মহিলারা সম্পূর্ণ ভোটাধিকার পান ১৯৭১ সালে। যদিও ভোটাধিকার থেকে মহিলাদের বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক প্রতিরোধ সংগঠিত করা হয় যাতে স্বাভাবিকভাবেই মহিলারা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। এক্ষেত্রে বলা যায় এক ধরনের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অধিকার অস্বীকার (এক্ষেত্রে ভোটাধিকার) করার ফলে অন্য ধরনের অংশগ্রহণের সুযোগ (এক্ষেত্রে আন্দোলন) তৈরি হয়ে যায়। বিশ্বের অন্যতম গণতান্ত্রিক দেশ যুক্তরাষ্ট্র মহিলাদের ভোটাধিকারের দাবীতে নানা আইন অমান্য আন্দোলন এই শতাব্দীর প্রথম ভাগেই সংঘটিত হতে থাকে, এর ফলে ১৯২৮ সালে একুশোর্ধ মহিলারা ভোটাধিকার পান। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে "কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধী" নির্বাচন পদ্ধতি বানানোর দাবীতে জোরদার রাজনৈতিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে আন্দোলনকারীদের বক্তব্য ছিল, আইনতঃ (বিশেষ করে ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনের ফলে) সামানাধিকারের সুযোগ থাকলেও নানা ধরনের শর্ত (যেমন, কঠিন স্বাক্ষরতা পরীক্ষা) আরোপ করা বাস্তবে কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়েরর নাগরিকদের অধিকার হরণ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে হয়, নির্বাচন সংক্রান্ত আইন কীভাবে নাগরিকের অংশগ্রহণের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, ঠিক কোন ধরনের নির্বাচন প্রক্রিয়া রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করতে পারে সে বিষয়ে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে দীর্ঘদিন বিতর্ক চলছে। এই প্রসঙ্গে মরিস্ ডুভার্জার (Maurice Duverger), ভিকি র‍্যানডাল (Vicky Randall), বা কার্সটিন বার্কম্যান (Karstin Barkman)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ সামাজিক কাঠামোর মাধ্যমে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও ভোটদাতাদের আচরণ সংক্রান্ত গবেষণায় ওই চিন্তাধারা বেশি প্রচলিত, ঐ সীমানার বাইরেও এর প্রচলন সম্প্রতি

দেখা যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে গবেষকরা লক্ষ্য করেন, শ্রেণী, ধর্ম, লিঙ্গ অথবা জাতিগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য এক বিশেষ ধাঁচের ও বিশেষ মাত্রার অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় কী ভূমিকা পালন করে। যেমন বিশেষজ্ঞরা লক্ষ্য করেছেন, যুক্তরাজ্যের মতো পশ্চিমী কিছু দেশে মধ্যবিত্তশ্রেণীর তুলনায় শ্রমিকশ্রেণীর সদস্যরা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে অনীহা বেশি দেখায়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই পার্থক্যের মূলকারণ এই দুই শ্রেণীর সমাজ-ভিত্তিক অবস্থানগত ফারাক (resource position discrepancy)। এক্ষেত্রে 'সমাজ' বলতে শুধুমাত্র অর্থ নয়, রাজনৈতিক কুশলতা ও রাজনৈতিক তথ্যকেও বোঝানো হচ্ছে।

ধারণাগত প্রেক্ষিতের সমর্থক যারা তারা বিশ্লেষণ করেন অধিপতি বিশ্বাস কাঠামো (dominant beliefs structure) কীভাবে রাজনৈতিক রুচি (preference) ও রাজনৈতিক আচরণ গঠনে সাহায্য করে। দুভাবে এই বিশ্বাস কাঠামো প্রভাব বিস্তার করতে পারে। প্রথমত, এক বিশেষ ধরনের বিশ্বাসধারা নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিরুৎসাহ করতে পারে। যেমন, নারীবাদীরা মনে করেন, পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মহিলাদের ক্ষেত্রে 'গৃহিণী' বা 'শিশু পরিচারিকা'র বাইরে কোনও ভূমিকা গ্রাহ্য করা হয় না। এর ফলে, রাজনীতির বৃহত্তর আঙিনায় মহিলাদের সক্রিয় ভূমিকা হওয়া 'অনুমোদিত' হয় না। এর মধ্যে দিয়ে সমাজে এক বড় ধরনের প্রভেদ তৈরি হয় ঠিকই কিন্তু ঐ বিশেষ বিশ্বাস কাঠামোর মধ্যে মহিলাদের এই প্রান্তীকরণ অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে মনে করা হয়।

২৬.৬ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও গণতন্ত্র

গণতন্ত্র সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ও প্রয়োগের সঙ্গে অংশগ্রহণের সম্পর্ক আলোচনা করা জরুরি। সাধারণভাবে, গণতন্ত্র অর্থে এমন এক প্রক্রিয়ার কথা ভাবা হয় যার মাধ্যমে 'সচেতন' তথ্য সমৃদ্ধ ও চিন্তাশীল নাগরিকসমূহ যুক্তিনিষ্ঠভাবে নির্বাচন প্রার্থীদের মধ্যে এক বা তার বেশি প্রার্থীকে প্রতিনিধি রূপে নির্বাচিত অথবা বাতিল করে। তবে বাস্তবের সঙ্গে এই ধারণার ফারাক অনেক। যদিও বর্তমান জগতে গণতন্ত্র সম্বন্ধে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী বিরল, অংশগ্রহণও 'প্রকৃত' গণতন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে বিতর্কের প্রভাব নেই। লক্ষ্যণীয় এই যে গণতন্ত্র সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরে এমনকি নগর রাষ্ট্রের আমলেও আলোচিত হয়ে আসছে। প্রশ্নগুলির কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

(১) গণতন্ত্রের অর্থ কী? (২) 'বহু'র শাসনের ধারণাকে কীভাবে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়? (৩) 'প্রকৃত' গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত কি নাগরিকদের সক্রিয় ভূমিকা পালন? (৪) এই জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাবে—প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ, নিয়মিত/অনিয়মিত কীভাবে? (৫) গণতন্ত্রে রাজনৈতিক এলিটের ভূমিকা কী? (৬) নাগরিকদের কাছে রাজনৈতিক এলিটের দায়বদ্ধতা কীভাবে নিশ্চিত করা যাবে?

২৬.৬.১ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের ধারণার এক বড় অংশ জুড়ে আছে শাসনব্যবস্থায় নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ও স্থায়ী অংশগ্রহণের প্রশ্ন। প্রাচীন গ্রীক নগররাষ্ট্র (যেমন এথেন্স)-ই হোক বা আধুনিক যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্য বা সুইট্জারল্যান্ডের স্থানীয় সরকারি সংগঠনসমূহই (local govt. institutions) হোক, নাগরিক অংশগ্রহণের ঐ ধারণা বরাবরই

গুরুত্ব পাচ্ছে। যদিও তার অর্থ এই নয় যে এ ধরনের 'প্রত্যক্ষ' ও 'স্থায়ী' অংশগ্রহণ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। আবার, বহু চর্চিত 'এথেনীয় গণতন্ত্র'র মডেল বাস্তবায়িত করার অন্য বিপদও আছে। মনে রাখতে হবে, গ্রীকযুগে এথেন্সের 'গণতান্ত্রিক' পরিমণ্ডলে নারী ও ক্রীতদাসের অংশগ্রহণের প্রশ্নই ছিল না। প্রত্যক্ষ ও স্থায়ী অংশগ্রহণের অসুবিধা অনেক। এক্ষেত্রে জনসংখ্যার বিপুল স্ফীতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। বর্তমান যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই জনস্ফীতির দরুন ব্যাপক আকার শাসনকার্যে নাগরিকের প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়।

মজার বিষয় হল, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণভিত্তিক গণতন্ত্রের বাস্তব রূপায়ণ অসম্ভব মনে হলেও বর্তমানে এর বাস্তবায়নের বিক্ষিপ্ত চেষ্টা চোখে পড়ে। এই আলোচনার শেষ অংশে আমরা 'বৈদ্যুতিন গণতন্ত্র' (Electronic democracy) সম্পর্কে আলোচনা করব। এই বৈদ্যুতিন গণতন্ত্র'র ধারণা কিন্তু প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ধারণারই 'সর্বাধুনিক' রূপ। অন্যদিকে, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ধারণা বা তত্ত্বের মধ্যেও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

২৬.৬.২ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র

বর্তমান যুগে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমুখী গণতন্ত্রের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এ ধরনের গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ণে নির্বাচন অবশ্যই বড় ভূমিকা পালন করে। নির্বাচন পদ্ধতির রকমফের ঘটলেও বিশ্বের যে রাষ্ট্রে নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি বাছাই করা হয় সেখানেই নির্বাচন পদ্ধতির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য (common features) লক্ষ করতে হয়। প্রথমত, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকৃত ক্ষেত্র থেকে নাগরিকদের ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রের মধ্যে অন্তত, কিছুটা দূরত্ব; এক্ষেত্রে অবশ্য নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকৃত ক্ষেত্রে নির্বাচকদের হয়ে কাজ করেন; দ্বিতীয়ত, সরকারের প্রতিটি বা অধিকাংশ স্তরে জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে নির্বাচনের ব্যবস্থা; এক্ষেত্রে রাজনৈতিক এলিটবর্গের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতেও এই নির্বাচনের প্রতীকী ও প্রকৃত গুরুত্ব রয়েছে। তৃতীয়ত, প্রতি ক্ষেত্রেই এই বিশ্বাস রয়েছে যে নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক উত্তরাধিকার দলও গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত করা সম্ভব। চতুর্থত, এই বিশ্বাস ও বর্তমান যে নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সীমাবদ্ধভাবে হলেও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় এবং এর মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি ও নির্দিষ্টভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি সমর্থন গড়ে তোলা সম্ভব।

প্রতিনিধিত্বমুখী গণতন্ত্রের ধারণাগত ও প্রক্রিয়াগত স্তরে রাজনৈতিক স্বাধীনতার ধারণা সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায়। এই ধাঁচের গণতন্ত্রের সমর্থকেরা মনে করেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতার শর্ত ব্যতীত গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে পড়ে। তবে মনে রাখতে হবে, ভোটদানের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতার মধ্য দিয়ে নাগরিকের অংশগ্রহণের সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় না। নির্বাচনের ভোটদানকারীদের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের গুণগত মান বা সার্থকতা সম্পর্কে বিশেষ আলোকপাত করে না। উদারবাদী চিন্তাবিদ্‌রা যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তিরূপে ভোটদানের অধিকারকে গুরুত্ব দেন, তখন তারাও স্বীকার করেন যে শুধুমাত্র এর ভিত্তিতেই কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে 'গণতান্ত্রিক' আখ্যা দেওয়া ঠিক পদক্ষেপ নাও হতে পারে।

২৬.৬.৩ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র

মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের চিন্তাধারায় বিকশিত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদভিত্তিক উদার গণতন্ত্রের প্রকৃতিগত পার্থক্য বহু আলোচিত বিষয়। তবুও এই স্বল্প পরিসরে এই বিকল্প গণতন্ত্রের বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন।

সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় পুঁজিবাদভিত্তিক গণতন্ত্রকে সামন্ততান্ত্রিক যুগের রাজনৈতিক বিন্যাসের থেকে 'উন্নততর' ব্যবস্থা বলে গণ্য করা হলেও এই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠান বা রীতিনীতির 'সীমাবদ্ধতা' ও 'আনুষ্ঠানিকতা'র দিকেও এক্ষেত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। একারণেই যুক্তি দেওয়া হয় যে অসম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে উদার গণতন্ত্র যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলে তা সংশ্লিষ্ট শোষণ ও নিষ্পেষণের পরিমণ্ডলে কখনোই বাস্তবায়িত হতে পারে না। এই কারণেই ব্যক্তিস্বাধীনতার সুযোগসুবিধা সমাজের অধিপতিশ্রেণীর সদস্যরা ভোগ করেন; অন্যদিকে, নিষ্পেষিত জনগণের কাছে এই রাজনৈতিক স্বাধীনতা 'ফাঁপা প্রতিশ্রুতি'-তে পর্যবসিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই যে 'সার্বজনীন নির্বাচন'-এর বিষয় আমরা পূর্বাংশে আলোচনা করলাম সেই প্রক্রিয়ায় জন-অংশগ্রহণের ব্যাপারটি এই বিকল্প চিন্তাধারায় **মেকি অংশগ্রহণ** (pseudo-participation) বলে বর্ণনা করা হয়।

অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ইতিহাসে সর্বপ্রথম শাসনব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের অংশগ্রহণ সম্ভব হয়। সমাজতন্ত্র তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে নতুন উৎপাদন ব্যবহার মধ্যে নিজস্ব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। শোষণমুক্ত শ্রমিকশ্রেণী ব্যক্তিমালিকানা বর্জিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিন্যাসের মাধ্যমে "প্রকৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতা"র স্বাদ পায়। চূড়ান্ত পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পথেই জন্ম নেবে সাম্যবাদী সামাজিক স্বশাসন যার মধ্যে জনগণের শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এক নতুন মাত্রা লাভ করে। এ পর্যায়ে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হলে রাজনীতির চিরাচরিত ভূমিকাও লুপ্ত হবে।

২৬.৬.৪ অংশগ্রহণ ও এলিট তত্ত্ব

সনাতনী এলিট তত্ত্বের প্রবক্তাদের গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রধান আপত্তি এই যে এই প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক শ্রেণীবিন্যাস (hierarchy) ব্যাহত হয়। রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে এলিট তত্ত্বের মূলতত্ত্ব এই ঃ ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর শাসন শুধুমাত্র কাম্য নয়, অবশ্যম্ভাবীও বটে। **এলিট তত্ত্বের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে তিন প্রবক্তার নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত—গিটানো মস্কা (Gaetano Mosca), ভিলফ্রেড প্যারেটো (Vilfred Pareto) ও রবার্টো মিচেল (Roberto Michel)-এর নাম।** নিজেদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণভাবে এক না হলেও এরা এ বিষয়ে সহমত পোষণ করতেন যে 'প্রতিনিধিমুখী-গণতন্ত্র' এক অত্যন্ত "বিপজ্জনক" ধারণা।

মস্কা, প্যারেটো ও মিচেল-এর বক্তব্য বাস্তব রাজনীতিতে বিপজ্জনক প্রয়োগের সম্মুখীন হয় যখন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে ইতালির ফ্যাসিবাদী শাসকেরা এই 'এলিট তত্ত্বের' মাধ্যমে নিজেদের অগণতান্ত্রিক শাসনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়। সম্ভবত অভিজ্ঞতার কারণেই মস্কা পরবর্তীকালে জনপ্রতিনিধিমুখীনতার সমর্থনে বলেন, এর ফলে অন্তর্মুখী ও অতিসন্তুষ্ট শাসকবর্গের মধ্যে বহুতত্ত্বের চেতনা

আসবে ও এই চেতনা কাম্য। প্রসঙ্গত শুমপিটার মনে করেন, এই প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা যায়; শুমপিটার মনে করেন, এই প্রতিযোগিতা রাজনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

তবে এলিট তত্ত্বের সঙ্গে পরবর্তীকালে যাঁর নাম জড়িয়ে যায়, তিনি সি-রাইট মিলস্ (C-wright Mills)। তাঁর The Power Elite গ্রন্থে রাইট মিলস্ মূলত মার্কিন সমাজের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে 'ক্ষমতাগোষ্ঠী'র প্রবল উপস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। রাইট মিলসের মতে, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য শিল্পোন্নত সমাজে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ব্যক্তিদের নিয়েই এই ক্ষমতাগোষ্ঠী গঠিত হয়। এক্ষেত্রে সামরিক বাহিনী ও বেসরকারি সংগঠনে আসীন উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও রাইট মিলস এই গোষ্ঠীর সদস্য রূপে চিহ্নিত করেন। তবে রাইট মিলসের বক্তব্য মূল সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের পদ ব্যতীত শাসনব্যবস্থার অন্যান্য ক্ষেত্রে 'মধ্যবর্তী পর্যায়'-এর কর্মচারী ও জনসাধারণ নির্বাচন ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকতে পারে কিন্তু ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় শিল্পোন্নত সমাজে বণ্টনের প্রকৃতি বিশ্লেষণে পরবর্তীকালে কিছু প্রভাবশালী তাত্ত্বিক বড় ভূমিকা পালন করেন। এদের মধ্যে রবার্ট ডাল (Robert Dahl) তাঁর Who Governs ও Polyarchi Participation and Opposition গ্রন্থদ্বয়ে উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার হতাশজনক চিত্র তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে ডাল বা সমসাময়িক তাত্ত্বিকগণ সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে দেখান কীভাবে কিছু ধরনের অংশগ্রহণ কাঠামোগতভাবে গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলের আওতায় আনা হয় এবং কিছু ধরনের অংশগ্রহণ কাঠামোগতভাবেই ঐ পরিমণ্ডলের বাইরে থেকে যায়।

২৬.৬.৫ অংশগ্রহণ ও নিষ্ক্রিয়তা ঃ মতামতের খতিয়ান

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নাগরিকের নানা মাত্রায় অংশগ্রহণের প্রবণতা থাকলেও যে-কোনও রাষ্ট্র বা সমাজে নিষ্ক্রিয় নাগরিকের সংখ্যা যথেষ্ট; অনেকক্ষেত্রে তারই সংখ্যাধিক্য। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে দু-ধরনের মত লক্ষ্য করা যায়। একদল বিশেষজ্ঞ মনে করেন, সার্বজনীন অংশগ্রহণ সম্ভবও না, কাম্যও না। এদের মূল বক্তব্য ঃ

(১) রাজনৈতিক সচেতনতাহীন নারী-পুরুষের অংশগ্রহণের সার্থকতা নেই কারণ নিস্পৃহ অংশগ্রহণকারীদের নিজের ও সমাজের স্বার্থ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা নেই।

(২) রাজনীতিতে প্রত্যেককে অংশগ্রহণ করতে হবে—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে শুধুমাত্র ভোটারের সংখ্যা বাড়িয়ে কোনও লাভ হয় না। আবার, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকের রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকারও স্বীকৃতি পাওয়া উচিত।

(৩) ব্যাপক জন-অংশগ্রহণের সুবিধার সঙ্গে অসুবিধাও রয়েছে। রাজনৈতিকভাবে অতি-সক্রিয় জনসাধারণের উপস্থিতিতে অতিমাত্রায় বিরোধ—বিতর্ক ও অস্থিরতা দেখা দেয়। নিষ্ক্রিয় জনগণের উপস্থিতিতে শাসনব্যবস্থায় এক ধরনের নমনীয়তা আসে যার মধ্যে দিয়ে শাসকদের সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়।

অন্যদিকে নিষ্ক্রিয়তাকে যারা বিপজ্জনক মনে করেন তাদের বক্তব্য ঃ

(১) যারা অংশগ্রহণ করতে পারে না তাদের স্বার্থের সঠিক প্রতিনিধিত্ব হয় না। এক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় নাগরিকদের উপেক্ষা করলে জনমত গঠনে তাদের কোনও ভূমিকা থাকে না, ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার জীবনীশক্তি ও দুর্বল হতে থাকে।

(২) ব্যাপক নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিলে শাসকদের মধ্যেও আগ্রাসন, দুর্নীতি ও স্বৈরাচারের প্রবণতা দেখা যায়।

(৩) অংশগ্রহণের মাধ্যমেই আমরা নিজেদের জ্ঞানবৃদ্ধি করতে পারি, নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে অবহিত হই ও কীভাবে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা চলছে সে সম্বন্ধেও সজাগ হই।

২৬.৭ বৈদ্যুতিন গণতন্ত্র

বর্তমান যুগে নয়া প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি হচ্ছে, একথা সর্বজনবিদিত। আরও নির্দিষ্টভাবে বলা যায়, 'নয়া প্রযুক্তি' (তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি)-র মাধ্যমেই বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। তবে যা, সচরাচর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না তা হল এই প্রযুক্তি বিপ্লবের মধ্যে নিহিত রাজনীতি পুনরধিকারের প্রচেষ্টা। গত দু'দশকে এই পুনরধিকারের প্রয়াস নানা ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠছে। এই প্রয়াসের অন্যতম মূল বিষয় (রাজনৈতিক) অংশগ্রহণ। বৈদ্যুতিন গণতন্ত্রের ধারণা সম্ভবত এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও বিতর্কিত প্রয়াস।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক বৈদ্যুতিন নগরসভা (electronic town meeting) বা বৈদ্যুতিন মতদান (electronic referendum) বিশ্বব্যাপী ব্যবহারের মাধ্যমে এই বিশেষ ধরনের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া গড়ে তোলার কল্পনা করা হয়। একটি কম্প্যুটার আনুষঙ্গিক প্রযুক্তির সাহায্যে বিশ্বের কোনও প্রান্ত থেকে অন্য যে-কোনও প্রান্তে তথ্য ও বক্তব্য প্রেরণ বা গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে আমরা সকলেই নিজেদের সচেতনতা বাড়াতে পারি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় আমাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারি—এই যুক্তিই বৈদ্যুতিন গণতন্ত্রের ভিত্তি। এক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার প্রবক্তারা প্রযুক্তির 'নিরপেক্ষ' চরিত্রের ওপর জোর দিয়ে বলেন, "এই "নিরপেক্ষতার ফলে যারা ক্ষমতাসীন ও যারা বিরোধী উভয় দলই প্রযুক্তিকে সমান ব্যবহার করতে পারেন। গণতন্ত্রের মূল চালিকা শক্তিই যদি চিন্তাভাবনা বা মতামতের মুক্ত প্রবাহ হয় সেক্ষেত্রে প্রযুক্তির অসামান্য ক্ষমতা ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই এই বাধাহীন আদানপ্রদান সম্ভব।" বলা যায়, বৈদ্যুতিন গণতন্ত্রের ধারণার মধ্যে দিয়ে একদিকে "তথ্যই ক্ষমতা" ও অন্যদিকে, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ধারণা নতুন রূপ পায়।

তত্ত্বগতভাবে দেখলে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্যের ব্যাপক প্রসারের মধ্যে দিয়ে নাগরিকেরা তথ্য-সমৃদ্ধ হয়ে নানাবিধ উপায়ে পরস্পর মত বিনিময় করবে, এ ধারণা যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক। কিন্তু বাস্তবে বৈদ্যুতিন গণতন্ত্রের ব্যাপক রূপায়ণ সহজ নয়। পশ্চিম বিশ্বের উন্নত দেশগুলির প্রযুক্তিবিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্বে, এমনকি তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম রাষ্ট্রসমূহেও, এধরনের বিপ্লবের ভিত্তিতে বৈদ্যুতিন গণতন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন সম্ভব—এই ধারণাই একদেশদর্শিতার দোষে দুষ্ট। আবার, বৈদ্যুতিন গণতন্ত্রের

ধারণার মধ্যে এলিট দৃষ্টিভঙ্গীও উপেক্ষা করা যায় না। বিশ্বের বহু দেশে যেখানে নাগরিকেরা মানব উন্নয়নের বিচারে নিম্নস্তরে অবস্থান করছে সেখানে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রক্রিয়া মানবমুখীনতাকে উপেক্ষা করে প্রযুক্তির উপর অতিনির্ভরশীলতা মানেই অধিকাংশ নাগরিকের অংশগ্রহণের অধিকার হরণ।

২৬.৮ অনুশীলনী

অতিসংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

১। রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে কী বোঝেন?

২। অংশগ্রহণ সংক্রান্ত এলিট তত্ত্বের প্রবক্তাদের নাম কী?

সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

১। লেস্টার মিলব্র্যাথ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

২। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সম্পর্কে কী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়?

বিশদভাবে উত্তর দিন ঃ

১। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রধান নির্দেশকসমূহ উদাহরণসহযোগে ব্যাখ্যা করুন।

২। রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করুন।

২৬.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। L. Milbreth and M. Goel : Political Participation, (Chicago), 1977.

২। D. L. Silhed : International Encyclopoedia of Social Sciences, Vol. 11 and 12, 1972, pp. 252-265.

৩। A. H. Birch : The Concepts and Theories of Modern Democracy (London), 1993.

৪। B. Axford et al. (eds) Politics : An Introduction, (দ্রষ্টব্য ঃ Political Participation) (London), 1997.

একক ২৭ □ রাজনৈতিক দল

গঠন

২৭.০ উদ্দেশ্য

২৭.১ প্রস্তাবনা

২৭.২ রাজনৈতিক দলের উদ্ভব

২৭.৩ শ্রেণীবিভাজন

২৭.৩.১ সাম্প্রতিক প্রবণতা

২৭.৪ কার্যকলাপ ও ভূমিকা

২৭.৪.১ প্রতিনিধিত্বকরণ ও অর্থসংগ্রহ

২৭.৪.২ নেতৃত্ব ও ভুক্তিকরণ

২৭.৪.৩ সংহতি ও বৈধকরণ

২৭.৪.৪ যোগাযোগ ও সচলতা

২৭.৪.৫ নীতি ও বিষয় উপস্থাপন

২৭.৪.৬ সরকার গঠন

২৭.৫ রাজনৈতিক দলের সীমাবদ্ধতা

২৭.৫.১ আভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা

২৭.৫.২ বাহ্যিক সীমাবদ্ধতা

২৭.৬ উপসংহার

২৭.৭ অনুশীলনী

২৭.৮ গ্রন্থপঞ্জী

২৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককের নিম্নলিখিত অংশে আপনি যা জানতে পারবেন—

- রাজনৈতিক দলের তাৎপর্য ও নেতিবাচক চিত্র।
- রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তত্ত্বায়ন—বিশেষভাবে মিচেলের "আয়রন ল অব অলিগার্কি"।
- রাজনৈতিক দলের বৈচিত্র্য বিশ্লেষণে শ্রেণীবিভাজনের ভূমিকা।

- রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ ও ভূমিকা।
- রাজনৈতিক দলের আভ্যন্তরীণ বাহ্যিক সীমাবদ্ধতা।

২৭.১ প্রস্তাবনা

"রাজনৈতিক দল"-এর ধারণা এক বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে উদ্ভব হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিনিধিত্বমূখী প্রতিষ্ঠান ও ভোটাধিকার ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক প্রসারলাভ করে। প্রথমদিকে এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত ছিল সেই সংগঠনসমূহ যেগুলি সরকারি পদ লাভের লক্ষ্যে এক বা একাধিক রাজনৈতিক দলের সহযোগে 'নির্বাচন প্রতিযোগিতায়' যোগ দিত। অবশ্য পরবর্তীকালে "রাজনৈতিক দল"-এর ধারণা পরিবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নয় এমন সংগঠনও রাজনৈতিক দল বলে গণ্য হতে থাকে। যেসব ক্ষুদ্র রাজনৈতিক সংগঠন যাদের রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের সম্ভাবনা কম, এমনকি নির্বাচন বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠনও, রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

বর্তমান যুগে যে-কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি এতই স্বাভাবিক যে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বর্জিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কথা চিন্তা করাই যায় না; যদিও রাজনৈতিক দলের সম্বন্ধে জনগণের ধারণা অনেক ক্ষেত্রেই সদর্থক নয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাবী, পাল্টা দাবী ও বাগাড়ম্বরের (rhetoric) মধ্যে দিয়ে প্রাত্যহিক রাজনীতির যে চিত্র ফুটে ওঠে তা অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ নাগরিকের পছন্দসই নয়। রাজনৈতিক দল মতাদর্শ ও নিয়মানুবর্তিতার নামে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অনেক ক্ষেত্রে জনগণের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, এমন ধারণা আজ সাধারণ নাগরিকদের মনে বদ্ধমূল হয়ে উঠছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলের নানা সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটির সুযোগ নিয়ে ঐ সংগঠনকে "বিপজ্জনক" বা "অসফল" আখ্যা দিয়ে স্বৈরাচারী শাসকেরা রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা ও গুরুত্ব খর্ব করার চেষ্টা করে।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে আধুনিক গণতন্ত্রের সঙ্গে গণরাজনৈতিক দলসমূহের উত্থান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই সমাজের চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটে। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে একে স্বার্থ গ্রন্থীকরণ (interact aggregation) ও স্বার্থ প্রকটীকরণ (interest articulation) প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যথেষ্ট স্বীকৃতি পায়। জনসমর্থনের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে রাজনীতিবিদদের কাছে রাজনৈতিক দল বড় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরবর্তী আলোচনায় বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

২৭.২ রাজনৈতিক দলের উদ্ভব

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হলেও মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় বিংশ শতাব্দীতে এর উদ্ভব হয়। আবার, সৌদি আরবের মতো কয়েকটি দেশে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব না থাকলেও বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই জনমুখী রাজনৈতিক দল ট্রেড ইউনিয়ন বা গণমাধ্যমের মতো অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করে। আধুনিক

রাজনৈতিক দল বহুসংখ্যক সদস্য ও অসংখ্য সমর্থনের মাধ্যমে আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দেয়। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই শতাব্দীর শুরুতে দুই প্রভাবশালী তাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে রাজনৈতিক দলের উত্থান গুরুত্বপূর্ণ হলেও এই সংগঠনের গণমুখীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়। অস্ট্রোগস্কি (M. I. Ostrogoski) ও মিচেল (R. Michel) এ বিষয়ে সহমত পোষণ করেন যে আধুনিক রাজনৈতিক দলে গণতান্ত্রিক ও জন-অংশগ্রহণমূলক গুণাবলীর থেকে আমলাতান্ত্রিক প্রভাব বেশি। মিচেলের এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য, কোনও রাজনৈতিক দল নিজস্ব সংগঠনে যত জনকে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সামিল হতে সুযোগ দেয়, তার চেয়ে বেশিসংখ্যক সদস্যকে ঐ প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা হয়। মিচেলের মতে, রাজনৈতিক দলের এই পদ্ধতির মধ্যে দিয়েই তৈরি হয় "আয়রন ল অব্ অলিগার্কি" (Iron Law of Oligarchy)-র নীতি যার মাধ্যমে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির স্বার্থ দ্বারা দলের আভ্যন্তরীণ কাঠামো ও কার্যকলাপ পরিচালিত হয়। জার্মান সোশাল ডেমোক্র্যাটিক দলের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মিচেল লক্ষ্য করেন যে সদস্যদের বদলে কয়েকজন উচ্চকাঙ্ক্ষী নেতৃবৃন্দের লক্ষ্যপূরণের হাতিয়ার হয়ে ওঠে রাজনৈতিক দল। যদিও সমালোচকেরা মনে করেন যে মিচেলের তত্ত্ব একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট, তবু তাঁর উল্লিখিত 'নীতি' একটি বিষয়ে রাজনৈতিক দলের বিশ্লেষকদের স্বজাগ করে তোলে ঃ যে-কোনও উপায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও পদলাভের জন্য রাজনৈতিক দলের প্রচেষ্টা। গবেষকরা তথ্য সহকারে প্রমাণ করেছেন, রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের লক্ষ্যে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই মতাদর্শের ক্ষেত্রে বোঝাপড়া করতে কুণ্ঠিত হয় না।

২৭.৩ শ্রেণীবিভাজন

রাজনৈতিক দলের চরিত্রগত ভিন্নতার কারণেই রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে দীর্ঘদিন ধরে ঐ সংগঠনের শ্রেণীবিভাজন তৈরি করবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যদিও একই সঙ্গে এই যুক্তিও পেশ করা হয় যে এই ধরনের শ্রেণীবিভাজনের মাধ্যমে খুব সীমিত মাত্রাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা বণ্টনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

শ্রেণীবিভাজনের ক্ষেত্রে ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী মরিস ডুভার্জার (Mourice Durverger) পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। ডুভার্জার তাঁর Political Parties নামক গ্রন্থে নির্বাচন ও সংসদীয় ব্যবস্থার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংসদীয় প্রক্রিয়া-বহির্ভূত রাজনৈতিক দলের পার্থক্য নিরূপণ করেন। একইভাবে কতকগুলি বিশেষ নির্দেশকের ভিত্তিতে তিনি গণমুখী দল (mass party) ও কর্মীমুখী দল (cadre party)-এর মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পান। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য, প্রথম শ্রেণীভুক্ত দল প্রত্যক্ষ সমর্থন গ্রন্থীকরণ, নিরবচ্ছিন্ন অংশগ্রহণ, সাংগঠনিক স্থিরতা, নির্বাচনের চাহিদার তুলনায় দলীয় স্বার্থে গুরুত্ব প্রদান প্রভৃতি শর্তের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। ডুভার্জার অবশ্য মনে করতেন, আধুনিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কর্মীমুখী দলের বিলুপ্তি ঘটবে।

ডুভার্জারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও বহু উল্লিখিত শ্রেণীবিভাজন নিম্নরূপ ঃ ককাস্ (caucus); ব্রাঞ্চ (branch), সেল (cell), ও মিলিশিয়া (militia), রাজনৈতিক দলের মূল সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে এই শ্রেণীবিভাজন করে ডুভার্জার এর প্রকৃতিগত পার্থক্য ব্যাখ্যা করেন। ককাস হল সে ধরনের রাজনৈতিক দল যা অস্থায়ী কমিটি, উপদল (coteric) বা চক্রীদল (clique)-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়; ব্রাঞ্চ সাধারণভাবে

স্থানীয় সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত দল; সেল মূলত পেশাভিত্তিক (যেমন শ্রমিক বা কৃষক) সমর্থনের ওপর গড়ে ওঠা দল; মিলিশিয়া সশস্ত্র সংগঠনভিত্তিক দল।

দুর্ভাজার অবশ্য এক বিকল্প শ্রেণীবিভাজনের উল্লেখ করেন যেখানে নিম্নলিখিত আদলের রাজনৈতিক দলের সন্ধান পাওয়া যায়। ক্যাথলিক বা ক্রিশ্চান ডেমোক্র্যাটিক দল যা উদার ও সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের মধ্যবর্তী পর্যায়ে অবস্থান; শ্রমিক দল যা ট্রেড ইউনিয়ন ও সহযোগিতামূলক মনোভাবের ভিত্তিতে পরিচিত; কৃষিমুখী (agrarian); প্রাচীন ও প্রাগৈতিহাসিক দল যা সশস্ত্র নিরাপত্তাবাহিনী, বা সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের ভিত্তিতে সামরিক নেতাদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে।

পরবর্তীকালে জিওভানি সার্তোরি (Giovanni Sartori) তাঁর Parties and Party Systems গ্রন্থে ও কয়েকটি আনুষঙ্গিক প্রবন্ধে সংখ্যার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাজনের ওপর গুরুত্ব দেন। এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁর নির্মাণে একদলীয়, বহুদলীয় ও পরমাণুজাতীয় (atomistic) দলীয় ব্যবস্থা স্থান পায়। 'পরমাণুজাতীয়' বলতে সার্তোরি এখানে এক পরিস্থিতির উল্লেখ করেন যেখানে কোনও একটি রাজনৈতিক দল অন্য রাজনৈতিক দলের ওপর কোনও উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে না। সার্তোরি অবশ্য কালক্রমে তাঁর প্রথম শ্রেণীবিভাজনের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, বুদ্ধিদীপ্ত শ্রেণীবিভাজনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সংখ্যা নয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার ওপরও জোর দিতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি একটি সাত স্তরবিশিষ্ট শ্রেণীবিভাজন করেন যার স্তরগুলি নিম্নরূপ ঃ একদলীয় অধিপতি (hegemonic) দলীয়; প্রাধান্যপূর্ণ (pre-dominent) দ্বি-দলীয়; মাত্রাবদ্ধ (moderate) বহুদলীয়; চূড়ান্ত (extreme) বহুদলীয়; পরমাণুজাতীয়।

প্রথমক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে একটি দলের কবলে থাকে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অন্য দলের উপস্থিতি থাকলেও তা একটি বিশেষ দলের বশবর্তী হয়ে থাকে। তৃতীয় ক্ষেত্রে চরম সংখ্যাধিক্যের খাতিরে একটি বিশেষ দল শাসন করে। মাত্রাবদ্ধ বহুদলীয় পরিস্থিতিতে তিন থেকে পাঁচটি দল গুরুত্ব পায়; চূড়ান্ত বহুদলীয় ব্যবস্থায় এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ছয় থেকে আট; সর্বশেষ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা হয় দশ থেকে কুড়ি বা তার বেশি।

সার্তোরির দুধরনের শ্রেণীবিভাজনের দ্বারা লা পালোম্বরা (Joseph La Palombora) ও ওয়েইনার (Myron Weiner) তাদের Political Parties and Political Development নামক গ্রন্থে এক নতুন ধরনের শ্রেণীবিভাজন করেন। প্রতিযোগিতামুখী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এই দুই তাত্ত্বিক চারটি মূল প্রবণতা উল্লেখ করেন ঃ অধিপতি মতাদর্শগত (hegemonic ideological); অধিপতি বাস্তবমুখী (hegemonic pragmatic); পরিবর্তনশীল মতাদর্শগত (turnover ideological); পরিবর্তনশীল বাস্তবমুখী (turnover pragmatic)।

এক্ষেত্রে অধিপতি বলতে সেই প্রবণতার উল্লেখ করা হচ্ছে যেখানে পরিবর্ধিত সময়ের মধ্যে কিছু দল বা গোষ্ঠীর হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে। 'পরিবর্তনশীল' বলতে সেই অবস্থা বোঝানো হচ্ছে যেখানে বারংবার শাসকদল বা শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন ঘটে। 'বাস্তবমুখী' হল সেই অবস্থা যেখানে প্রথম পরিস্থিতির ক্ষেত্রে দ্রুতগতিতে শাসকবর্গের পরিবর্তন ঘটে।

রাজনৈতিক দলের শ্রেণীবিভাজনের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিকদের মধ্যে কোনও মতৈক্য নেই। অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাজনের প্রচেষ্টা বিষয়টিকে আরও জটিল করে তোলে। তবে এসত্ত্বেও এধরনের শ্রেণীবিভাজন রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সাধারণভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ধারণে সাহায্য করে।

২৭.৩.১ সাম্প্রতিক প্রবণতা

রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত সমকালীন তত্ত্বায়নে শ্রেণীবিভাজনের থেকে মডেল নির্মাণে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এই প্রসঙ্গে চারটি গুরুত্বপূর্ণ মডেল উল্লেখ করা হল ঃ

(১) **অনুন্নত আনুগত্যের মডেল** (Undeveloped Loyalty model) ঃ এক্ষেত্রে দল সমর্থকদের কাছ থেকে উচ্চমাত্রার আনুগত্য ও অবিচ্ছিন্ন সমর্থন দাবী করে। বিশেষ করে নেতাদের সমর্থনের ক্ষেত্রে ও নির্বাচনের সময় এই মাত্রায় আনুগত্য প্রকাশ জরুরি হয়ে পড়ে। তবে এক্ষেত্রে আনুগত্যের কোনও রাজনৈতিক বা অন্যান্য সুযোগসুবিধার সম্পর্ক নেই।

(২) **উন্নত আনুগত্যের মডেল** (Developed Loyalty Model) ঃ এক্ষেত্রে সমর্থকদের কাছে দলের আনুগত্যের দাবীর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে পদোন্নতি ও নানা ধরনের সম্পদভিত্তিক ও রাজনৈতিক সুযোগসুবিধার প্রশ্ন।

(৩) **উন্নত অনানুগত্যের মডেল** (Developed Non-Loyalty Model) ঃ এধরনের মডেল বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ, যেখানে বিভিন্ন রাজ্য ও অঞ্চলের মধ্যে জটিল সম্পর্ক আছে, যেখানে প্রাসঙ্গিক এক্ষেত্রে দলীয় আনুগত্য তুলনামূলকভাবে দুর্বল; অন্যদিকে, উন্নত আমলাতন্ত্র ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়।

(৪) **অনুন্নত অনানুগত্যের মডেল** (Undeveloped Non-Loyalty Model) ঃ এক্ষেত্রে দল হয় খুবই দুর্বল অথবা অস্তিত্ববিহীন। যেসব রাষ্ট্রে এই মডেল প্রাসঙ্গিক সেখানে রাষ্ট্র ও পৌর সমাজের (Civil Society) মধ্যে পার্থক্য থাকে না; অন্যদিকে প্রাচীন সাংস্কৃতিক-সামাজিক আনুগত্যের প্রচন্ড প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারীরা পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের নানা সুযোগসুবিধা দিয়ে ব্যাপক দুর্নীতির জন্ম দেয়।

২৭.৪ কার্যকলাপ ও ভূমিকা

রাজনৈতিক দলের উৎপত্তি ও সাংগঠনিক যৌক্তিকতার মূলে আছে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন ও রক্ষার লক্ষ্য। সাধারণভাবে রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) নীতিভিত্তিক কর্মসূচীর মাধ্যমে রাজনৈতিক মতাদর্শ চিহ্নিতকরণ; উন্নয়ন ও প্রচার;

(২) নির্বাচন প্রচার ও দলীয় সংগঠনের সাহায্যে জনসমর্থন তৈরি করা;

(৩) সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের গ্রন্থীকরণ ও প্রত্যক্ষকরণ;

(৪) দলে এলিটবর্গের সদস্যপদ বৃদ্ধি;

(৫) সরকার গঠন।

তবে মনে রাখতে হবে, কোনও রাজনৈতিক দল উপরোক্ত কার্যকলাপের প্রত্যেকটিতে সমান গুরুত্ব নাও দিতে পারে। যেমন জনসমর্থনের অভাবে সরকার গঠনের লক্ষ্য কিন্তু রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপের আওতার বাইরে থেকে যেতে পারে। অন্যদিকে 'বিপ্লবী দল' সরকারি ক্ষমতালাভকে কার্যকলাপের তালিকা থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিতে পারে।

কোনো রাজনৈতিক দলের ভূমিকা নির্ধারণ করতে ঐ দলের নিজস্ব সাংগঠনিক ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিক কারণেই রাজনৈতিক দলের ভূমিকা সম্পর্কে খুব নির্দিষ্ট মাত্রায় আলোচনা সহজ নয়। তবে এক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রের উল্লেখ করে রাজনৈতিক দলের সাধারণ ভূমিকা সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও জয়লাভ ঃ স্পষ্টতই কোনও রাজনৈতিক দলের সাফল্যের চূড়ান্ত পরীক্ষা ও লক্ষ্য হল নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও জয়লাভ। সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে জয়ী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব সরকার গঠনের সুযোগ পেয়ে দলীয় নীতি বাস্তবায়নের সুযোগ পায়।

এক্ষেত্রে আগ্রহী রাজনৈতিক দলসমূহকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর অবিছিন্ন সমর্থন আদায় করতে হয়। ভারতবর্ষের সমকালীন রাজনীতিতে কোনও রাজনৈতিক দল এই বৃহত্তর সমর্থন আদায় করতে ব্যর্থ হচ্ছে বলে জোটসরকারের শাসন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে এই বৃহত্তর সমর্থন আদায়ে সাফল্যের মাত্রার সঙ্গে রাজনৈতিক স্থিরতা-অস্থিরতার যোগ আছে।

বর্তমান যুগ জনমানসে রাজনৈতিক দল সম্পর্কে ধ্যানধারণা নির্ধারণ করতে গণমাধ্যম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রস্তুতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নানা কল্পচিত্রের (image) মাধ্যমে জনগণের মনে এক ধারণা গড়ে ওঠে যা নির্বাচনে ঐ দলের সাফল্যের সঙ্গে জড়িত। ঐ কারণে রাজনৈতিক দলগুলির নতুন ভোটারকে আকর্ষণ করা বা জনস্বার্থ সম্পর্কিত নতুন বিষয়ের দিকে নজর দিয়ে নিজেদের বক্তব্য ও কল্পচিত্রের পরিবর্তন ঘটাতে সচেষ্ট হয়। সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়ার ফলে নির্বাচকদের যে সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে তা রাজনৈতিক দলগুলিকে এ বিষয়ে আরও সচেতন করে তুলেছে।

২৭.৪.১ প্রতিনিধিত্বকরণ ও অর্থসংগ্রহ

রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক অংশগ্রহণের কেন্দ্রবিন্দু। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই এক বা একাধিক নির্দিষ্ট স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। এই স্বার্থ সংগঠিত শ্রমিক বা কৃষক অথবা বিশেষ ধর্মীয় সংগঠন বা ব্যবসাবাণিজ্যকারী সংগঠন বা পরিবেশবাদী সংগঠনের স্বার্থ হতে পারে। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই সমাজের ব্যাপক ভেদাভেদ সম্পর্কে সচেতন এবং সে কারণেই তারা কয়েকটি নির্দিষ্ট আর্থসামাজিক বিষয়কে তুলে ধরে সংগঠনকে ঘিরে সমর্থন নিশ্চিত করতে চায়। তবে যে সমাজে স্বৈরাচারের প্রভাব বেশি সেখানে রাজনৈতিক দল নিষ্পেষণের সম্মুখীন হয়, সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের এই ভূমিকা পালন সম্ভব হয় না।

এই বিশেষ ভূমিকার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে রাজনৈতিক দল সামাজিক বিভাজনকে আইনি-সাংবিধানিক কাঠামোর ভিত্তিতে একটি প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। এর ফলে এই বিভাজন বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছে সমাজে অস্থিরতা তৈরি করতে পারে না। যদিও মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে বলা হয় বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলি এভাবে সামাজিক বিভাজনকে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজে নিহিত শ্রেণীবৈষম্যই শুধু টিকিয়ে রাখে না, এক ধরনের স্থিতাবস্থা বজায় রেখে বিপ্লবের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে।

অন্যদিকে, এরকম দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় যেখানে রাজনৈতিক দল সমাজে বিরোধ বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। জনসাধারণের সমর্থন আদায়ের জন্য কোনও দল সমাজে নিহিত বিভাজন টিকিয়ে রাখতে চাইতে পারে। জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমকে মূলধন করে দুই দেশের যুদ্ধের সময় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বিরোধকে

ব্যবহার করে ক্ষমতায় থাকতে চাইছে—এ উদাহরণ বিরল নয়। ভারত-পাক যুদ্ধের সময় ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের ভূমিকা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দেখা যায়, ক্ষমতাসীন দল একটি বিশেষ বিরোধকে প্রবল গুরুত্ব দিয়ে নিজস্ব গুরুত্ব জাহির করার চেষ্টা করে।

প্রতিনিধিত্বকরণের সঙ্গে অর্থ সংগ্রহের প্রশ্নটি জড়িত। যুক্তরাষ্ট্র বা জার্মানিতে রাজনৈতিক দলগুলি কিছু মাত্রায় রাষ্ট্র থেকে অর্থসাহায্য পায়। তবে সাধারণভাবে দল তার সমর্থকদের অর্থসাহায্য, সদস্যপদের চাঁদা ও বিশেষ করে শিল্পজগৎ ও ট্রেড ইউনিয়নের অর্থসাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। নির্বাচনের বিপুল ব্যয় ও আনুষঙ্গিক প্রচারে এই অর্থ সংগ্রহ বিশেষ জরুরি হয়ে পড়ে। তবে এই অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে সহজেই বিতর্কিত ও সমালোচিত করে তোলে।

২৭.৪.২ নেতৃত্ব ও ভুক্তিকরণ

বিভিন্ন রাজনৈতিক পদে আসীন হওয়ার সুযোগ শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলের সাহায্যেই পাওয়া যায়। যদিও রাজনৈতিক দলকে অবলম্বন করে উচ্চপদপ্রাপ্তি সহজ প্রক্রিয়া নয়। নানা উত্থানপতনের মধ্যে দিয়ে ঐ পদে আসীন হওয়া সম্ভব। সাধারণভাবে, স্থানীয় স্তরে রাজনৈতিক জীবন শুরু করে দলীয় সংগঠনের নানা ধাপ পেরিয়ে উচ্চপদপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করতে হয়।

রাজনৈতিক দলকে জোসেফ শ্লেসিঙ্গার (Joseph Schlesinger)-এর মতো তাত্ত্বিকরা "নেতা উৎপাদনকারী সংগঠন" (Leader producing organisation) বলে অভিহিত করেছেন। উচ্চকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা রাজনৈতিক দলের এই ক্ষমতায় আকর্ষিত হয়ে দলের নেতৃত্বে স্থান পেতে চায়। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলে 'প্রকৃত নেতা'র সন্ধান পাওয়া কঠিন হয়; দলে নেতৃপদের জন্য প্রতিযোগিতা না থাকলে প্রকৃত নেতাকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না।

কোনও রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের অবদান নির্ধারণ করতে দু'শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের উল্লেখ করতে হয়। একদিকে থাকেন জননেতাগণ যারা সরকারি পদে দলের প্রার্থী হন; অন্যদিকে থাকেন সাংগঠনিক নেতৃবৃন্দ যারা দলের সংগঠনের কাজে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেন। যদিও কিছু ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি এই দুই ধরনের নেতৃত্ব দেন; সাধারণভাবে (বিশেষ করে কম্যুনিস্ট দলে) এই শ্রেণীবিভাজন মেনে চলা হয়।

ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়া রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ও ক্ষমতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। সাধারণভাবে সমর্থক ও নির্বাচন প্রার্থী ভুক্তিকরণ "উন্মুক্ত" প্রক্রিয়া হলেও গবেষকরা দেখেছেন, রাজনীতিবিদদের এক বড় অংশ সক্রিয় রাজনীতির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পরিবারবর্গ থেকে আসে।

২৭.৪.৩ সংহতি ও বৈধকরণ

সমাজ বা রাষ্ট্রের ভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী স্বার্থ রক্ষার্থে রাজনৈতিক দল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনসাধারণের নিষ্ক্রিয়তা, দূরত্ব ও হতাশা সামগ্রিকভাবে কাম্য নয়। সমাজের নানা স্তর থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত রাজনৈতিক দল ও ধরনের ভিন্নতা ও বিরোধিতাকে গুরুত্ব দিয়ে নিজস্ব নীতি নির্ধারণ করতে পারে। নতুন আন্দোলনে (যেমন শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন) সংগঠিত করে কোনও বিশেষ মতামতকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়াও রাজনৈতিক দলের পক্ষে সম্ভব। সমাজের নানা গোষ্ঠী ও তার নিজস্ব চাহিদা বা দাবীকে গুরুত্ব না দিলে ঐ গোষ্ঠী সাংবিধানিক

রীতি-নীতির বাইরে গিয়ে দাবী পূরণের "বিপজ্জনক" পদক্ষেপ নিতে পারে। বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগী শক্তিগুলিকে ও সংশ্লিষ্ট মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষা করতে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ থেকেই আসে বৈধকরণের প্রশ্ন।

দলীয় ব্যবস্থা ও নিজস্ব নেতৃত্বের বৈধকরণে রাজনৈতিক দলকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। যে-কোনও রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বকে এমন নীতি প্রণয়ন করতে হয় যা সদস্যদের এবং সম্ভাব্য সমর্থকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়। এদের সম্মতি অর্জন করতে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে নানা বিষয়ে সমঝোতা করতে হয়। যেমন, দলের স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও সমর্থকদের মধ্যে বা তৃণমূল স্তরের কর্মী ও উচ্চস্তরের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলে এ ধরনের সমঝোতা প্রয়োজন হয়। যদিও অনেক ক্ষেত্রে এই মতপার্থক্য এমন তীব্র আকার ধারণ করে যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে দল বিভক্ত হয়ে যায়। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। এক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিকের চোখে দল বৈধতা জাগায়। আবার নির্বাচনী দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ রাজনৈতিক দল নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিজস্ব মতাদর্শের সঙ্গে সম্পর্কহীন বা বিরোধী নীতি প্রণয়ন করে জনসমর্থন আদায়ের মাধ্যমে বৈধকরণে সক্রিয় হয়।

২৭.৪.৪ যোগাযোগ ও সচলতা

ব্যাপক সমর্থন যোগাড় করা ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক দলের পক্ষেও 'অতিসহজ' কাজ নয়। মিচেলের বক্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায়, অধিকাংশ রাজনৈতিক দলেই সামান্য সংখ্যক দলীয় কর্মী উচ্চপর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; এ ধরনের কেন্দ্রীভবন অনেক ক্ষেত্রে দলকে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। আবার জনসমর্থন রাজনৈতিক দলের প্রধান হাতিয়ার। সাধারণভাবে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা ব্যক্তি রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইলেও নানা বিষয়—যেমন, শ্রেণী, জাত, জনগোষ্ঠী—জনসমর্থনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। আধুনিক রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণভাবে দাবী করে, দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অংশগ্রহণ প্রয়োজন যদিও 'প্রতিনিধিত্বকরণ' ও 'সচলতার' প্রকৃতি সম্পর্কে মতানৈক্য থাকার ফলে 'মুক্ত অংশগ্রহণ'-এর যুক্তি বাস্তবায়িত হয় কিনা তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতিতে বিশ্বাসী দলগুলি সর্বদাই দাবী করে সমর্থকদের মতামত ও দাবী প্রতিফলিত করাই তাদের "মূল লক্ষ্য"। এক্ষেত্রে নেতাদেরও বক্তব্য, তারা সর্বদা তৃণমূল স্তরের সমর্থকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে নীতি পরিচালনা করেন।

গণসচলতার বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশ্য, বিরোধী মতাবলম্বীদের নিজেদের লক্ষ্যের প্রতি আকর্ষণ করে তাদের 'সমর্থন' আদায় করা। এক্ষেত্রে দলের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিশেষ করে অন্যায় অবিচার ও বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন হতে হয় এবং যথেষ্ট প্রচারের মাধ্যমে ঐ বিষয়গুলি সম্ভবধে জনসাধারণকেও সচেতন করতে হয়। বলা বাহুল্য, এই বিশেষ ক্ষেত্রে গণমাধ্যম বিশাল ভূমিকা পালন করে।

২৭.৪.৫ নীতি ও বিষয় উপস্থাপন

রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক দায়িত্বের মধ্যে একটি হল নীতি নির্ধারণ ও রূপায়ণ। নীতির সঙ্গে সমাজের বৃহত্তর বিরোধের গভীর সম্পর্ক রয়েছে; রাজনৈতিক দলের মতাদর্শগত অবস্থানও নির্বাচকদের ঐ দলের নীতি

সম্পর্ক রয়েছে; ধ্যানধারণা দ্বারা অনেকাংশে নির্ধারিত হয়। নানা দাবী, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ধ্যানধারণার মিল নেই কোনও দলের নীতি গড়ে ওঠে যদিও তত্ত্বগতভাবে প্রতিটি দলের নিজস্ব মূল্যবোধেরও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতে পারে। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই নিজের মতাদর্শের ভিত্তিতে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে বলে দাবী করে।

নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দলীয় নেতৃবৃন্দকে দলের সদস্যদের বক্তব্যের দিকে নজর দিতে হয়। নির্বাচন কর্মসূচী তৈরির ক্ষেত্রে ঐ কারণেই দলের আভ্যন্তরীণ সংগঠনের মধ্যে নানা খসড়া ইস্তাহার, নথিপত্র সম্প্রসারিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ ও রূপায়ণে দলীয় সংগঠনের বাইরে এসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বুদ্ধিজীবী বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সাহায্য নেওয়া হয়। তবে চূড়ান্ত পর্যায়ে দলের নেতৃবৃন্দই এ বিষয়ে শেষ কথা বলে। ভারতবর্ষে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে নজর দিয়ে বলা যায়, জোট সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দলের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচী (Common minimum programme) তৈরি করা বাস্তবিকই এক দুরূহ কাজ।

২৭.৪.৬ সরকার গঠন

নির্বাচন জয়ের সর্বোচ্চ পুরস্কার সরকার গঠনের সুযোগ। বাস্তবে সম্ভব হোক, বা না হোক অধিকাংশ রাজনৈতিক দলেরই উদ্দেশ্য বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা পরিবর্তিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতায় এসে নিজস্ব লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনা করা। রাজনৈতিক দলের এই চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিতর্কের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে যখন কিছু দল 'যেন-তেন-প্রকারেণ' সরকার গঠনের লক্ষ্যে পৌঁছতে 'সুস্থ রাজনীতি'র মূল উপাদান মতাদর্শ জলাঞ্জলি দেয়।

২৭.৫ রাজনৈতিক দলের সীমাবদ্ধতা

বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক দলের প্রবল প্রতিপত্তি দেখে জনমনে এই ধারণা তৈরি হয় যে রাজনৈতিক দল তার সদস্য ও নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে সমাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলে সমাজ পরিবর্তনের বড় হাতিয়ার হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক দলের ক্রমবর্ধমান প্রভাব অস্বীকার না করেও বলা যায় যে দলীয় কার্যকলাপ ও প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে ঐ সংগঠনকে কিছু সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়। এই সীমাবদ্ধতাকে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। আভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা দলের নিজস্ব সংগঠন ও কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত। বাহ্যিক সীমাবদ্ধতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বৃহত্তর রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক পরিমণ্ডল।

২৭.৫.১ আভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা

প্রায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই কাঠামো ও কার্যকলাপের প্রকৃতি বিপুল সংখ্যক জনগণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষায় নানা সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। যেমন, যে মতাদর্শের ভিত্তিতে একটি দল গঠিত হয় সেই মতাদর্শ প্রত্যেক নাগরিকের কাছে আকর্ষণীয় হবে না, এটাই স্বাভাবিক। যদিও বর্তমান যুগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের অগ্রগতির ফলে দলীয় নেতৃবৃন্দ লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে, কিন্তু দলের বক্তব্য কতজনের কাছে বোধগম্য বা বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে এ বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

কোনও রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ বা নীতি প্রকৃতপক্ষে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গী বা আচরণ কতটা পরিবর্তন করতে পারে সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদিও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ জনসাধারণের "হৃদয় ও মন জয়" করে তাদের চিন্তাভাবনার পরিবর্তন করেছেন বলে দাবী করেন, বাস্তবে এই দাবী সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। জওহরলাল বা ইন্দিরা গান্ধীর মতো প্রভাবশালী নেতারা তাদের ক্ষমতাবলে নানা প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন করলেও জনসাধারণের নিজস্ব বিশ্বাস বা ধ্যানধারণার পরিবর্তন করতে পেরেছিলেন কিনা তা বোঝা সহজ নয়।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জনগণের ওপর রাজনৈতিক দলের প্রভাব কমে বলে কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন। উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থার সচেতন নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিক দলের প্রচার ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার নাও করতে পারে।

২৭.৫.২ বাহ্যিক সীমাবদ্ধতা

বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ধারার ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরি করে। যেমন, রুশ বিপ্লবের পর যে ধাঁচের (কম্যুনিস্ট) দল সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্ষমতায় আসে তার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা ও আনুষঙ্গিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিস্তর ফারাক। আবার যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিদলীয় ব্যবস্থার সঙ্গে ব্রিটেনের দ্বিদলীয় ব্যবস্থার সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যের বেশি।

অনেক ক্ষেত্রে কোনও একটি বিশ্বের দলীয় ব্যবস্থার অনুকরণ করতে গিয়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক সংস্কৃতির পার্থক্য অনুকরণকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। ব্রিটিশ শাসনমুক্ত বেশ কিছু রাষ্ট্র এই ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছে। আসলে যে ধরনের জাতিগোষ্ঠী, ধর্ম ও অঞ্চল ভিত্তিক পার্থক্য এই দেশগুলিতে (যেমন, নাইজেরিয়া) যে ভিন্নজাতীয় (heterogenous), ভঙ্গুর (fragile) রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করেছে। তার সঙ্গে ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে এক পঙ্‌ক্তিতে রাখা যায় না।

সামাজিক বিভাজন অবধারিতভাবে রাজনৈতিক দলে প্রতিফলিত হয়। দেশে ধর্মের প্রবল প্রভাবই শুধু নয় বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিরোধ থাকলেই বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন দলের উদ্ভব হয়। শুধু ইউরোপেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দেখা গেছে, যে সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর যথেষ্ট উপস্থিতিও প্রভাব, সেখানে শ্রমিক দলের বা সমাজতান্ত্রিক দলের উদ্ভব হয়েছে।

অন্যদিকে সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটলে তা বিশেষ রাজনৈতিক দলের বৈধতা কমিয়ে আনতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পূর্ব জার্মানী, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, রোমানিয়া, পোল্যান্ড প্রভৃতি পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের পক্ষে জনগণের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব রক্ষা করা যে কঠিন হয়ে পড়ে, তার একটি কারণ হল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহে ভোগ্যপণ্যের ব্যাপক প্রসার ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জনমানসে এর ক্রমবর্ধমান প্রভাব। যেমন এক্ষেত্রে গবেষকরা দেখিয়েছেন; নিকটবর্তী পশ্চিম জার্মানী থেকে টেলিভিশনের মাধ্যমে ভোগ্যপণ্যের ক্রমাগত সম্প্রচার কীভাবে পূর্ব জার্মানীর জনগণকে তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক দল সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে।

২৭.৬ উপসংহার

রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা করা যেতে পারে। যুক্তির বিস্তার যাই হোক না কেন, রাজনৈতিক দল একটি মানবসংগঠন এই অর্থে যে এটি মানুষেরই সৃষ্টি। সুতরাং এই সংগঠনের ক্ষমতা সম্পর্কে অতিমাত্রায় আশা বা সম্পূর্ণ হতাশা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এই বিশেষ সত্যটি মনে রাখা প্রয়োজন।

২৭.৭ অনুশীলনী

অতি সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

১। 'ককাস' ও 'ব্রাঞ্চ' বলতে কী বোঝেন?

২। রাজনৈতিক দলকে "নেতা উৎপাদনকারী সংগঠন" বলা হয় কেন?

সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

১। মিচেল বর্ণিত "আয়রন ল অব্ অলিগার্কি" বলতে কী বোঝেন?

২। রাজনৈতিক দলের সীমাবদ্ধতা কী কী?

বিশদভাবে উত্তর দিন ঃ

১। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

২। রাজনৈতিক দলের শ্রেণীবিভাজনের বিভিন্ন ধারা ব্যাখ্যা করুন।

২৭.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। M. Duverger : Political Parties (London), 1964.

২। R. Rose : Do Parties Make a Difference? (London), 1984.

৩। J. Blondal : Votero, Parties and Leaders (London), 1963.

৪। D. L. Sill (ed.) : International Encyclopedia of Social Sciences, 1972, Vols. 11 + 12, 1972, pp. 428-453.

৫। J. Blondel (ed.) : Comparative Government, (Harmondsmith), 1975. দ্রষ্টব্য : রাজনৈতিক দলের ওপর লিখিত প্রবন্ধগুলি।

৬। B. Axford ed.al. (eds.) : Politics : An Introduction, (London), 1997, দ্রষ্টব্য : "Political Parties".

একক ২৮ □ রাজনৈতিক অংশগ্রহণকারী গোষ্ঠী

গঠন

২৮.০ উদ্দেশ্য

২৮.১ প্রস্তাবনা

২৮.২ গোষ্ঠী রাজনীতি ঃ ঐতিহাসিক সূত্র

২৮.৩ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী

২৮.৪ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ঃ শ্রেণীবিভাজন

২৮.৫ ক্ষমতার নির্দেশক

২৮.৫.১ অর্থ

২৮.৫.২ সদস্যপদ

২৮.৫.৩ মতাদর্শ ও লক্ষ্য

২৮.৫.৪ জনমানসে ধারণা

২৮.৬ উপসংহার

২৮.৭ অনুশীলনী

২৮.৮ গ্রন্থপঞ্জী

২৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককের নিম্নলিখিত অংশে আপনি যা জানতে পারবেন—

- গোষ্ঠী রাজনীতি সংক্রান্ত তত্ত্বায়নের ঐতিহাসিক সূত্র। এক্ষেত্রে পশ্চিমি তত্ত্ববিদদের মধ্যে চিন্তাধারার পার্থক্য।
- স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রকৃতি।
- স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাজন।
- স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ক্ষমতার নির্ণায়ক।

২৮.১ প্রস্তাবনা

রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর আলোচনার সঙ্গে বেশ কিছু ব্যাপক ধ্যান-ধারণা ও সেই বিষয়ে নানা দৃষ্টিকোণ জড়িয়ে থাকে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি মূল উপাদন রাজনৈতিক গোষ্ঠীসমূহ হলেও

এ সম্পর্কে সর্বজনগ্রাহ্য কোনও তত্ত্ব নির্মাণ সম্ভব হয়নি। বৈচিত্র্যের কারণেই কোন সর্বসম্মত 'গোষ্ঠীতত্ত্ব' বা 'গোষ্ঠী মডেল'-এর মাধ্যমে রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস ভ্রান্ত বলে মনে করা হয়। তবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গোষ্ঠীর ভূমিকা নিয়ে মতৈক্য থাকলেও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা একমত যে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি বুঝতে হলে গোষ্ঠীসমূহের ভূমিকাকে কোনওভাবে অস্বীকার করা যায় না। একারণেই সমাজবিজ্ঞানে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী/স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রকৃতি ও কার্যকলাপের ওপর বহু গবেষণা হয়েছে। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পরে এই ধরনের গবেষণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসমূহ বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে শুরু হয়। লক্ষ্যণীয় যে, যে দেশে সরকার-বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই দেশগুলিই রাজনৈতিক গোষ্ঠী সংক্রান্ত চর্চাসমূহ বিশ্লেষকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়।

২৮.২ গোষ্ঠী রাজনীতি ঃ ঐতিহাসিক সূত্র

পাশ্চাত্য চিন্তাজগতে সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার ওপর গোষ্ঠীর প্রভাব নিয়ে আলোচনার 'ঐতিহ্য' বহুদিনের। শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মতো সনাতনী দার্শনিকরাও গোষ্ঠীসমূহের রাজনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। বর্তমান যুগে এই গোষ্ঠীসমূহের সংখ্যা, ভিন্নতা ও জটিলতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নানা পর্যায়ে নানা মাত্রায় শ্রমবিভাজন, আত্মনির্ভরতা, দরকষাকষির রীতিনীতি, যোগাযোগের ধারা, এই জটিলতা বৃদ্ধি করেছে। যে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিরোধ ও সরকার বহির্ভূত সংগঠনের বৈধতা যথেষ্ট, সেখানে গোষ্ঠী রাজনীতির আদল তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট, যে রাষ্ট্রে এ ধরনের বিরোধিতা ও সরকারি সংগঠন সম্পর্কে সহিষ্ণুতা কম, সেখানে গোষ্ঠী রাজনীতির জটিলতা বেশি। আবার, অনুন্নত বা উন্নতিশীল দেশসমূহেও এই জটিলতার মাত্রা বেশি বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী গোষ্ঠীসমূহের সমকালীন বৌদ্ধিক বিশ্লেষণে এক ধারাবাহিকতার সন্ধান পাওয়া যায়। ধারাবাহিকতার গোড়াপত্তন করেন ইংরেজ ও পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশ বিশেষ করে জার্মান বহুত্ববাদী তাত্ত্বিকগণ। রাষ্ট্রের সর্বময়তা ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রবণতার বিরুদ্ধে এই ধারা গড়ে ওঠে। এই ধারার প্রবক্তাদের বক্তব্য, রাষ্ট্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হলেও বৈধ ক্ষমতার ওপর এর একক আধিপত্য থাকতে পারে না। এই ধারার পথিকৃৎ হলেন জার্মান পণ্ডিত গিয়ের্ক (Gierke)। বিসমার্ক অনুপ্রাণিত জার্মান জাতীয়তাবাদের গুরুত্ব স্বীকার করেও গিয়ের্ক মনে করতেন যে রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীকেও গুরুত্ব দিতে হবে। গিয়ের্কের বক্তব্যেরই প্রতিফলন ঘটে ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানী মেইটল্যান্ড (Meitland)-এর তত্ত্বে। মেইটল্যান্ডও মনে করতেন, রাষ্ট্র অতিমাত্রায় ক্ষমতাশালী হলে সমাজের পক্ষে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রবণতা হবে, সুতরাং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অধিকমাত্রায় বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

গিয়ের্ক ও মেইটল্যান্ডের ধারার পরবর্তীকালে কোল (G.D.H. Cole) ও ল্যাস্কি (Harold Laski) রাষ্ট্রক্ষমতা ও এই ক্ষমতার সঙ্গে পুঁজিবাদের সংযোগ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমাজে গোষ্ঠীরাজনীতির গুরুত্বের ওপর জোর দেন। অন্যদিকে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য থাকলেও জার্মান দার্শনিক গ্লামপ্লোয়িজ (Glamplwicz) ও সিমেল (Zimmel) সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে গোষ্ঠীসমূহের ভূমিকার ওপর জোর দেন। এই ধারার বিশ্লেষকরা পরবর্তীকালে মার্কিন গোষ্ঠীবিশেষজ্ঞদের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন।

তবে গোষ্ঠী রাজনীতি ও আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে সবচেয়ে পরিচিত বিশ্লেষক আর্থার বেন্টলি (Arthur Bently)। যদিও এক্ষেত্রে বেন্টলির সহকর্মী জন ডিউয়ি (John Dewey)-র নামও উল্লেখ করা যেতে পারে তবে ১৯০৮ সালে বিখ্যাত গ্রন্থ (The Process of Government)-এ বেন্টলি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গোষ্ঠীবর্গের ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে এক "সুসংহত অনুসন্ধান" করতে সমর্থ হন। গঠনমূলক সমালোচনার ভিত্তিতে লিখিত এই গ্রন্থে বেন্টলি গতানুগতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণের রীতি-নীতির বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ' করেন। দৃষ্ট মনের আচরণের মাধ্যমেই একমাত্র রাজনীতি বিশ্লেষণ সম্ভব—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে বেন্টলি গোষ্ঠীক্রিয়ার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সরকারের কাজকর্মের মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই গোষ্ঠীভিত্তিক প্রক্রিয়াকে বেন্টলি "আদান-প্রদান" (transactions)-এর ধারণার সঙ্গে যুক্ত করেন। তবে ঐ গ্রন্থে বেন্টলি "আদান-প্রদান" সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দেননি।

বেন্টলি গোষ্ঠী রাজনীতির "বৃহত্তর প্রক্রিয়ার" ওপর জোর দিলেও, পরবর্তীকালে রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বিশ্লেষণে চাপসৃষ্টিকারী/স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কেন্দ্রবিন্দুতে আসে, ফলে বৃহত্তর প্রক্রিয়ার বদলে এক নির্দিষ্ট বা সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আলোকপাত করা শুরু হয়। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ জননীতি বা একটি বিশেষ গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ সংগঠন বা কার্যকলাপের ওপর গুরুত্ব দিয়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গোষ্ঠীসমূহের ভূমিকা আলোচিত হতে থাকে।

২৮.৩ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী) যে স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে তা আরও জোরদার করতে বা অন্তত অপরিবর্তিত রাখতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে ঐ গোষ্ঠী (সমূহ) সমাজ সংগঠন সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর কোনও একটি বিশেষ অংশ বাস্তবায়িত করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান কায়েম করতে চায়। **বর্তমান যুগে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর গুরুত্ব এতই বেড়েছে যে বলা হয় এদের সংখ্যা ও প্রভাব বৃদ্ধির ফলে রাজনীতি এক বৃহত্তর প্রক্রিয়া থেকে একক বিষয় (Single issue)-ভিত্তিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হচ্ছে।** রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এই স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ভূমিকা নিয়েও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অনেকে মনে করেন, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রবল উপস্থিতির কারণে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রের ক্ষয় হয়। অন্যদিকে এ যুক্তিও দেওয়া হয় যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মান উন্নয়নে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক চরিত্র বড় ভূমিকা পালন করে। তবে এ বিষয়ে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই মতৈক্য পোষণ করেন যে সমাজে বিভাজন ও জটিলতা বৃদ্ধির কারণে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সংখ্যা ও প্রভাব বহুলাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২৮.৪ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ঃ শ্রেণীবিভাজন

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীকে মূলত দুভাগে ভাগ করা যায় : (১) বিভাগীয় বা শাখা গোষ্ঠী (Sectional Group); (২) প্রচারকারী গোষ্ঠী (Promotional Group)।

প্রথম শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সমাজের একটি বিশেষ অংশের স্বার্থ রক্ষা করতে ও বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট থাকে। এই শ্রেণীর গোষ্ঠী সর্বদা সংগঠনের সদস্যদের মর্যাদা ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন থাকে; এ কারণেই এই ধরনের গোষ্ঠীতে সদস্যদের গুরুত্ব অসীম। এক্ষেত্রে কনফেডারেশন অব্ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি বা সি.আই.টি.ইউ. বা আই.এন.টি.ইউ.সি.'র মতো বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শ্রেণীর মধ্যে সেই পেশাদারী গোষ্ঠীকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায় যা সদস্যদের অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট পেশার রীতি-নীতি ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায়। এক্ষেত্রে ডাক্তার, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ারদের নিজস্ব গোষ্ঠীসমূহকে উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে।

প্রচারকারী গোষ্ঠী শুধুমাত্র নিজস্ব সদস্যদের স্বার্থরক্ষার মধ্যে কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখে না। কোনও ক্ষেত্রে একটি বিশেষ বিষয় (যেমন, ক্রেতার অধিকার প্রতিষ্ঠা) লক্ষ্যপূরণে এরা সচেষ্ট নয়; কখনওবা সামগ্রিকভাবে নীতিবোধ জাগ্রত করে সমাজের মান উন্নয়নে (যেমন, নারী নির্যাতন বিরোধিতা বা পরিবেশ সংরক্ষণ বা পৌর স্বাধীনতা রক্ষা) এই শ্রেণীর গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রথম ক্ষেত্রে ক্রেতা সুরক্ষা সমিতি এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পি.ইউ.সি.এল/পি.ইউ.ডি.আর-এর উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে।

মতপ্রচারকারী গোষ্ঠী কখনও বিপুল জনসমর্থন লাভ করে সামান্য সংখ্যক সদস্য-অধ্যুষিত স্বার্থগোষ্ঠী থেকে বৃহত্তর সামাজিক গোষ্ঠী/সংগঠনে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে পশ্চিমি দুনিয়ার 'গ্রীনপিস্' (Green peace) নামক পরিবেশবাদী গোষ্ঠীর প্রামাণ্য উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে ঐ সংগঠন আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে নিয়েছে।

২৮.৫ ক্ষমতার নির্দেশক

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ক্ষমতার মাত্রা অনেকাংশেই নির্ভর করে ঐ গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর সম্পর্কের প্রকৃতির ওপর। স্বাভাবিকভাবেই ঐ কাঠামোয় গুরুত্ব পায় এমন গোষ্ঠীর বৈধতা বেশি; এ ধরনের গোষ্ঠীর বক্তব্যও "সঠিক যোগাযোগের" কারণে গুরুত্ব পায়। ভারতবর্ষের প্রসঙ্গে এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রভাবশালী ট্রেড ইউনিয়নের উল্লেখ করা যায়। অন্যদিকে, রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্বহীন গোষ্ঠী মূলস্রোতে স্বীকৃতি না পাওয়ার কারণে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। তবে যে-কোনও গোষ্ঠীকেই ক্ষমতাশালী বা ক্ষমতাহীন করতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় :

২৮.৫.১ অর্থ

অর্থ মানেই ক্ষমতা নয়; তবে যথেষ্ট সম্পদশালী গোষ্ঠীর পক্ষে সরকার ও জনসাধারণের কাছে নিজস্ব বক্তব্য পৌঁছে দেওয়া সহজ হয়। বর্তমান যুগে রাজনীতিতে প্রচারমুখীনতা গুরুত্ব পাওয়ার ফলে অর্থের প্রয়োজন ও গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৮.৫.২ সদস্যপদ

সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বা নীতি প্রণয়নকারীদের কাছে গোষ্ঠীর বক্তব্য পৌঁছে দিতে ঐ গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা, বিশেষ করে সক্রিয় সদস্যদের সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ। এক ধরনের মূল্যবোধ, নীতি ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সদস্যরা সংখ্যায় বেশি হলে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর দাবীকে সরকার সহজে উপেক্ষা করতে পারে না।

২৮.৫.৩ মতাদর্শ ও লক্ষ্য

কোনও গোষ্ঠীর মতাদর্শ সরকারি চিন্তাভাবনার পরিপন্থী হলে ঐ গোষ্ঠীর ক্ষমতা যেমন কমার সম্ভাবনা থাকে তেমনি কোনও গোষ্ঠীর মতাদর্শ সরকারের কাছে বিপজ্জনক মনে না হলে সে গোষ্ঠীর ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বোঝাপড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

২৮.৫.৪ জনমানসে ধারণা

কোনও গোষ্ঠীর ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে যদি ঐ গোষ্ঠী সম্পর্কে জনমানসে সাধারণভাবে এক সদর্থক ধারণা থাকে। সাধারণত যে গোষ্ঠী জনসাধারণের কাছে ক্ষমতা পায় সরকারও সে গোষ্ঠীর বক্তব্য উপেক্ষা করতে পারে না। অন্যদিকে, কোনও গোষ্ঠী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা থাকলে সে গোষ্ঠীর ক্ষমতা ও গুরুত্ব কমে যায়।

২৮.৬ উপসংহার

রাজনীতিতে গোষ্ঠীসমূহের অংশগ্রহণের সঙ্গে বহুত্ববাদের প্রত্যক্ষ যোগের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যুক্তি হল, সমাজে নানা গোষ্ঠীর মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে গোষ্ঠীগুলি রাজনীতিতে এক ধরনের "প্রয়োজনীয় বৈচিত্র্য" ও গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল তৈরিতে সাহায্য করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপস্থিতির ফলে কোনও এক বিশেষ স্বার্থ বা গোষ্ঠী আধিপত্য জারি করতে পারে না, ফলে ঐ ব্যবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা হয়। আবার এই ভারসাম্য এমন হয় না যার ফলে প্রত্যেক গোষ্ঠীই সমানভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত নয়া দক্ষিণপন্থী (New Right) চিন্তাধারা অনুসারে বলা হয়, সরকারি নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া সরকার, মালিকগোষ্ঠী ও ইউনিয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; অন্য গোষ্ঠীসমূহের এই ত্রিমুখী কাঠামোয় যোগ দেওয়ার "ক্ষমতা নেই"। সুতরাং বলা যেতে পারে, রাজনৈতিক গোষ্ঠী রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম বিতর্কিত উপাদান।

২৮.৭ অনুশীলনী

অতি সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

১। গোষ্ঠীরাজনীতি বিশ্লেষণে যে-কোনও চারজন পথিকৃতের নাম উল্লেখ করুন।

২। আর্থার বেন্টলি প্রণীত গ্রন্থের নাম কী?

সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

১। রাজনৈতিক অংশগ্রহণকারী গোষ্ঠী সম্পর্কে গিয়র্ক ও মেইটল্যান্ডের বক্তব্য কী?

২। গোষ্ঠী রাজনীতিকে বেন্টলি কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

বিশদভাবে উত্তর দিন ঃ

১। বিভাগীয় ও মতপ্রচারকারী গোষ্ঠীর প্রকৃতি বর্ণনা করুন।

২। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ক্ষমতার নির্দেশসমূহ উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা করুন।

২৮.৮ উপসংহার

১। D. L. Sillsed : International Encyclopedia of Social Sciences, Vols. 11 + 12, 1962, pp. 241-245.

২। A. Grant : The American Political Process (Dartmouth), 1994.

৩। G. A. Almond and G. B. Powell, Jr. : Comparative Politics (New Delhi), 1972, pp. 74-79.

একক ২৯ □ রাজনৈতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ

গঠন

২৯.০ উদ্দেশ্য

২৯.১ প্রস্তাবনা

২৯.২ রাজনীতিক পরিবর্তন ও রাজনীতিক উন্নয়ন

২৯.৩ রাজনীতিক উন্নয়ন আলোচনার পটভূমি

২৯.৪ রাজনীতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ

২৯.৫ রাজনীতিক উন্নয়নের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ

২৯.৫.১ রাজনীতিক উন্নয়ন বিষয়ে **Almond**-এর দৃষ্টিকোণ

২৯.৫.২ রাজনীতিক উন্নয়ন সম্পর্কে **Lucian Pye.**

২৯.৬ ভারতে রাজনীতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ

২৯.৭ উপসংহার

২৯.৮ অনুশীলনী

২৯.৮ গ্রন্থপঞ্জী

২৯.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে—

- রাজনীতিক পরিবর্তনের সাথে রাজনীতিক উন্নয়নের পার্থক্য।
- আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া এবং রাজনীতিক উন্নয়নের সাথে এর সম্পর্ক।
- রাজনীতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণগুলি কী?
- ভারতে রাজনীতিক উন্নয়নের ধারাটি কেমন?

২৯.১ প্রস্তাবনা

সমাজতত্ত্ব চর্চার সমৃদ্ধি ও বিশেষীকরণের ফলে এর নানা শাখা গড়ে উঠেছে, যেমন অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্ব, রাজনীতিক সমাজতত্ত্ব, সাংস্কৃতিক সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি। এইসব নানা শাখার সমাজতত্ত্ব সমাজ জীবনের বিশেষ বিশেষ দিকের গতিপ্রকৃতি, উন্নয়ন-পরিবর্তন বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে থাকে। অর্থনীতিক সমাজতত্ত্ব, যেমন সমাজের আর্থিক উন্নয়ন-পরিবর্তন বিষয়ে আলোচনায় আগ্রহী তেমনি রাজনীতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন

প্রক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা রাজনীতিক সমাজতত্ত্বের অন্যতম উপজীব্য। তবে মনে রাখা দরকার 'পরিবর্তন' ও 'উন্নয়ন' নামক ধারণা দু'টি সমার্থক তো নয়ই, বরং তা স্পষ্টতই পৃথক পৃথক অর্থের সূচক। তাই রাজনীতিক পরিবর্তন ও রাজনীতিক উন্নয়ন বিষয় দু'টি ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে আলোচিত হয়।

এই প্রসঙ্গে আধুনিকীকরণ (modernization) নামক ধারণাটিও বিশেষ উল্লেখ্য। আধুনিকীকরণ বলতে সাধারণভাবে বোঝায় এমন এক সামাজিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে—নগরায়ণ, শিল্পায়ন, গণসংযোগ ব্যবস্থার বিকাশ-বিস্তার ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে এবং একযোগে ঘটানো। ফলে সমাজের সাবেকি জীবনধারার বদলে এক প্রবল আত্মবিশ্বাসী ও গতিশীল জীবনধারার সূচনা করে।

রাজনীতিক উন্নয়নের ধারণাকে ঘিরে অবশ্য বিশ্লেষকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য যথেষ্ট। রাজনীতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার চারিত্রলক্ষণ নিয়ে তাই সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা মতানৈক্য বর্তমান। তবে কয়েকটি সাধারণ লক্ষণের বিষয়ে তাদের ঐকমত্যও লক্ষ্যণীয়। এইসব সাধারণ লক্ষণগুলির নিরিখেই ভারতীয় রাষ্ট্রজীবনে রাজনীতিক উন্নয়নের প্রসঙ্গটি এখানে আলোচিত হল।

২৯.২ রাজনীতিক পরিবর্তন ও রাজনীতিক উন্নয়ন

'পরিবর্তন' ও 'উন্নয়ন' শব্দ দু'টি আপাতভাবে সমার্থক মনে হলেও বিশদ বিশ্লেষণে ও দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করা যায়। পরিবর্তন মূলত একটি ঘটনা বা ক্রিয়া; যার ফলে সমাজে কোনও-না-কোনও রকমের রূপান্তর চোখে পড়ে। উন্নয়ন হল একটি প্রক্রিয়া, এক গতিশীল প্রক্রিয়া। উন্নয়নের অর্থ অবশ্যই এক ধরনের পরিবর্তন; কিন্তু তাই বলে যে-কোনো পরিবর্তনই 'উন্নয়ন' বলে বিবেচিত হয় না। রাজনীতিক বিধিব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক বিশেষ ইতিবাচক বিকাশ বা সমৃদ্ধিকেই কেবল রাজনীতিক উন্নয়ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, রাজনীতিক পরিবর্তন যতটা মূল্যমান-নিরপেক্ষ, রাজনীতিক উন্নয়ন কিন্তু তা নয়। উন্নয়নের মধ্যে অগ্রগতি বা প্রগতির ধারণা নিহিত। রাজনীতিক বিধিব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানিক বিন্যাসের পূর্বতন সরলমাত্রিক (linear) স্তর থেকে বিশেষীকৃত (diversified) সমৃদ্ধতর স্তরে উত্তরণের প্রক্রিয়াকেই রাজনীতিক উত্তরণ বলে অভিহিত করা যায়। অর্থাৎ যা ছিল তার চেয়ে কতটা ভালো হল, কী পরিমাণ অগ্রগতি হল সেটাই এখানে আসল বিবেচ্য। এর ফলে সমাজের সাবেকি গঠন ও জীবনধারা ভেঙে গিয়ে নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়।

উপরন্তু, রাজনীতিক পরিবর্তন যতখানি সহজে অনুধাবনযোগ্য ও স্বীকৃত, রাজনীতিক উন্নয়ন ততখানি সহজে অনুধাবনযোগ্য নয় এবং তাকে ঘিরে বিরোধ-বিতর্কও রীতিমতো প্রবল। কোনও এক ব্যাপক গণবিক্ষোভের মাধ্যমে অথবা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটি দেশের শাসক পরিবর্তন হলে তাকে রাজনীতিক পরিবর্তন বলে স্বীকার করতে কারুরই কোনও আপত্তি থাকবে না। কিন্তু রাজনীতিক উন্নয়ন কথাটির মধ্যে মূল্যমানের প্রশ্ন জড়িত বলেই কোনও রাজনীতিক ব্যবস্থায় যে রূপান্তর প্রক্রিয়ার সূচনা হয় তা, উন্নয়ন বা অবনয়ন এ নিয়ে মতভেদ ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

উন্নয়নের সাথে যেহেতু সমৃদ্ধি ও উত্তরণ ইত্যাদি মূল্যমানসূচক ধারণা সম্পৃক্ত তাই স্বভাবতই একে ঘিরে নানা দৃষ্টিভঙ্গীগত বিষমতা ও বিতর্ক বর্তমান। তাই 'উন্নয়ন' ধারণাটির কোনও সুনির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা নির্ধারণ সম্ভব নয়। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রাজনীতিক উন্নয়নের ধারণাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। উদারনীতিক গণতন্ত্রবাদী চিন্তাবিদ্ ও মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদ্দের মধ্যে এ বিষয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রবল

মতপার্থক্য বর্তমান। এমনকি উদারনীতিবাদী চিন্তাবিদ্‌রাও ভিন্ন ভিন্ন বিশ্লেষণ-প্রেক্ষিত থেকে উন্নয়নের প্রসঙ্গটিকে বিচার করেছেন। তবু সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, সমাজের সাবেকি জীবনধারা ও আর্থ-সামাজিক পটভূমি যখন জটিলতর বিভাজন-বিন্যাস ক্রম-রূপান্তরিত হয় তার এই জটিলতাজাত সঙ্কট ও দাবীদাওয়া সমাধানে সক্ষম অধিক কার্যকর ও বিশেষীকৃত রাজনীতিক কাঠামো ও ব্যবস্থার বিবর্তনকেই রাজনীতিক উন্নয়ন নামে অভিহিত করা যায়।

২৯.৩ রাজনীতিক উন্নয়ন আলোচনার পটভূমি

রাজনীতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত ধারণার উদ্ভব ও ঐ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে। সদ্যবিগত বিশ শতকের মধ্যভাগে যখন বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি দ্রুত বিপর্যয়ে হীনবল হয়ে পড়ে এবং বিশ্বের নানা প্রান্তে বিশেষত এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের নানা দেশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে ব্যাপক ও সংহত অগ্রগতির প্রয়াস শুরু করে; সদ্য স্বাধীন এইসব দেশের কর্ণধার ও পরিকল্পনাবিদ্‌রা উন্নয়নের নানা প্রকল্প ও প্রতিরূপ পরীক্ষামূলকভাবে উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। ফলত এই সময় উন্নয়ন বা বিকাশের ধারণাগত আলোচনা অর্থবহ হয়ে ওঠে। সুতরাং বলা যায়, রাজনীতিক উন্নয়ন বা বিকাশের ধারণাটি প্রধানত এইসব অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ ও জাতির পরিপ্রেক্ষিতেই অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বিশ শতকের পাঁচের দশকে মার্কিন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বের দ্বিমেরুকেন্দ্রিক ঠাণ্ডাযুদ্ধের যে বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব থেকে তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন দেশগুলি মুক্ত হতে পারে নি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বিরূপতা ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ সম্পর্কে আগ্রহ সত্ত্বেও এই দেশগুলির উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এক বিচিত্র টানাপোড়েন অনিবার্য হয়ে ওঠে। পশ্চিমী শিল্প-প্রযুক্তির ধাঁচে অর্থনৈতিক উন্নয়নের তাগিদকে অগ্রাহ্য করা গেল না। আর এই ধারায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের দরুন সমাজে বেশ কিছু মাত্রায় শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও আনুষঙ্গিক সামাজিক রূপান্তর ঘটল। এইরকম আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের পটভূমিতে অনিবার্য হয়ে উঠলো রাজনীতিক রূপান্তর ও উন্নয়ন। তাই তৃতীয় বিশ্বের এইসব উন্নয়নেচ্ছু দেশগুলির উপর নানা সমীক্ষা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার দায়ভার প্রথমদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অপেক্ষা সমাজবিদ্যা ও অর্থবিদ্যার উপরই বেশি বর্তেছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মনোযোগের বিষয়টি হল এইসব উন্নয়নকামী দেশের আর্থিক ও সামাজিক পরিবর্তনধারার পাশাপাশি রাজনীতিক উন্নয়ন বা রূপান্তর কীভাবে, কতখানি এবং কোন্ পথে সাধিত হয়েছে? বলা বাহুল্য, উন্নয়নশীল দেশগুলি উন্নয়নশীলতার বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করে; তেমনি এদের উন্নয়নের ধারাও সমগোত্রীয় নয়। আবার সব দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তর রাজনীতিক রূপান্তরের সাথে সাযুজ্য বজায় রাখেনি। আর এইসব কারণেই রাজনীতিক উন্নয়নের প্রেক্ষিত থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নতুন এক আলোচনা শাখার উদ্ভব ঘটেছে যাকে 'তুলনামূলক রাজনীতি' নামে অভিহিত করা হয়।

২৯.৪ রাজনীতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ

আধুনিকীকরণ বলতে সাধারণভাবে বোঝায় এমন এক সামাজিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া যার ঘনিষ্ঠ অনুষঙ্গ হল নগরায়ণ, শিল্পায়ন, যন্ত্রায়ন ইত্যাদি বাহ্য প্রক্রিয়া। এইসব বাহ্যিক প্রক্রিয়াগুলির সাথে যুক্তিবাদী

ভাবধারা, ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা ইত্যাদি ভাবগত উপাদান যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয় এক সার্বিক আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া যাকে কেউ কেউ ইউরোপীয় আধুনিকতার প্রতিরূপ বলে মনে করেন। আর রাজনীতিতে এই আধুনিকীকরণের প্রতিফলন ঘটে উদারনীতিবাদী ভাবধারা, প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া-পদ্ধতির মাধ্যমে।

ঔপনিবেশিক পর্বে সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের প্রয়োজনে এইসব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সমাজ-অর্থনীতির স্তরে আধুনিকতার বাহ্য প্রক্রিয়াগুলির সূত্রপাত হয়েছিল, যদিও সেইসব প্রক্রিয়া ছিল খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বেও দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চেতনায় মুখ্য প্রবণতাই ছিল এইসব শুরু হওয়া প্রক্রিয়ার প্রান্তিক কিছু পরিমার্জনাসহ সেগুলিকে সংহত ও ত্বরান্বিত করা। ঔপনিবেশিক শোষণ-লুণ্ঠনে জীর্ণ সমাজ-অর্থনীতির পুনর্গঠন ও দ্রুত অগ্রগতি বা উন্নয়নের লক্ষ্যে সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ণধাররা পশ্চিমী ধাঁচের শিল্পপ্রযুক্তি, নগরায়ণ ইত্যাদি আধুনিকীকরণের বাহ্য প্রক্রিয়াগুলিকে অনুসরণ করেছেন। সমাজ-অর্থনীতিতে এই আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া সামাজিক ও অর্থনীতিক উন্নয়নের পদক্ষেপ হিসেবেই গণ্য হয়ে আসছে। আর রাজনীতিক আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া প্রতিভাত হয় কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে, যেমন ঃ (ক) রাজনীতিক আধুনিকীকরণের মাধ্যমে শাসন ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সাবেকি গোষ্ঠী, জাতি, ধর্ম কিংবা পরিবারভিত্তিক শাসনের অবসান ঘটে। তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিক কর্তৃত্ব। (খ) রাজনীতিক আধুনিকীকরণের ফলে দেশের রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পায়। (গ) আধুনিকীকরণের ফলে রাজনীতিক কাজকর্মে বিভক্তিকরণ (differentiation) ও বিশেষীকরণ (specialization) ঘটে। (ঘ) রাজনীতিক আধুনিকীকরণের প্রভাবে রাজনীতিতে প্রতিনিধিমূলক ও দলভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে ওঠে এবং বৃদ্ধি পায় নানা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। (ঙ) আধুনিকীকরণের প্রভাবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নানা সংযোগ-মাধ্যমের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

মনে রাখা দরকার যে, ইউরোপে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার সূত্রপাতে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল সংস্কার আন্দোলন, স্বৈরতন্ত্রবিরোধী গণবিপ্লব, শিল্পবিপ্লব ইত্যাদি। সমাজের রাজনীতিক স্তরে এই আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া জন্ম দিয়েছিল গণতান্ত্রিক আদর্শ, শুরু করেছিল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানসমূহের। তাই ইউরোপীয় ধারার আধুনিকীকরণ সমাজ-অর্থনীতিতে যেমন নগরায়ণ, শিল্পায়ন বা যন্ত্রায়নের সূচনা করেছে তেমনি রাজনীতিতে গড়ে তুলেছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও রীতিনীতি, নৈর্ব্যক্তিক আমলাতন্ত্রের প্রশাসনিক বিধিব্যবস্থা, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, কৌমকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার বদলে আধুনিক সিভিল সোসাইটির বিকাশ ইত্যাদি। তৃতীয় বিশ্বের নানা দেশের সমাজ-অর্থনীতিতে যেমন নগরায়ণ, শিল্পায়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্তার ইত্যাদি বহির্লক্ষণ প্রত্যক্ষ করা যায় তেমনি আনুষ্ঠানিকভাবে কোথাও কোথাও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান-পদ্ধতি ইত্যাদিও পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু পশ্চিমী আধুনিকতার সাথে তৃতীয় বিশ্বের এই আধুনিকীকরণকে সমগোত্রীয় বা সমধর্মী মনে করা সমীচীন নয়। সমাজবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, ইউরোপে মধ্যযুগীয় সাবেকি ঐতিহ্যের ক্রমিক অপসারণের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে এক পূর্ণাঙ্গ আধুনিক সমাজ। সেখানে চিরাচরিত বিশ্বাসের স্থান নিয়েছে যুক্তি, কর্তৃত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দায়বদ্ধতা, উৎপাদনকে সচল করেছে উদ্ভাবনী ক্রিয়াকলাপ, গোষ্ঠীগত ক্ষুদ্র আনুগত্যের জায়গায় জেগেছে জাতীয় মর্যাদাবোধ আর ব্যক্তি-মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে সবকিছুর কেন্দ্রে।

অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে আধুনিকতা সাবেকি সমাজের অন্তঃস্থল থেকে গড়ে না উঠে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদী শক্তির দ্বারা উপর থেকে আরোপিত। তাই এখানে সাবেকি ঐতিহ্যের অবসানের বদলে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক কৌতুকময় মিশ্রণ ঘটে যাকে সমাজবিজ্ঞানীরা 'ঐতিহ্যের আধুনিকীকরণ' (Modernization of tradition) বলে অভিহিত করেন। এখানে ব্যক্তি কদাচিৎ গোষ্ঠীর ওপরে স্থান করে নিতে পারে; যুক্তির আঘাতে বিশ্বাসের ভিত্তিমূল দুর্বল হতে সময় লাগে অনেক। পুরানো উৎপাদন ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করে নতুন প্রযুক্তি দিয়ে তার শক্তিবৃদ্ধি ঘটানো বেশ কঠিন কাজ। অনেকাংশে পশ্চিমের অনুকরণেই আধুনিকতা আসে।

ফলত পশ্চিমী আধুনিকতা যে ধরনের ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিমানস গঠনের সহায়ক, তৃতীয় বিশ্বের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার ধারায় সমজাতীয় ব্যক্তিমানস সৃষ্টি হতে পারে না। Daniel Larner, David Macclcland, Everett Hagen, Alex Inkeles প্রমুখ লেখকরা আধুনিক মানুষের (Modern Man) যে চারিত্রলক্ষণের কথা বলেছেন তার হদিশ তৃতীয় বিশ্বের আধুনিক সমাজে তেমন সহজলভ্য নয়।

২৯.৫ রাজনীতিক উন্নয়নের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, রাজনীতিক উন্নয়ন বিষয়ক ধারণাগত ও তত্ত্বগত আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে তৃতীয় বিশ্বের অর্ধোন্নত বা উন্নয়নেচ্ছু দেশগুলির উন্নয়নমূলক প্রয়াসের প্রসঙ্গে। তবে, প্রধানত অগ্রসর পশ্চিমী দেশগুলির অভিজ্ঞতার আলোকে রাজনীতিক উন্নয়নের ধারণাগত প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছে। মুখ্যত, কাঠামো-কার্যগত তত্ত্ব বা ব্যবস্থাজ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিত থেকে রাজনীতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত নানা বিশ্লেষণ ও একাধিক মডেল তুলে ধরেছেন Edward Shils, Lucian Pye, Samuel Huntington, Daniel Larner, David Apter, Almond ও Powell প্রমুখ বহু সমাজবিজ্ঞানী।

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, রাজনীতিক জীবনধারা, কাঠামো-কার্যাবলী ও প্রক্রিয়ার সাবেকি সরল পর্যায় থেকে জটিলতর, বিশেষীকৃত আধুনিক পর্যায়ে উত্তরণকেই রাজনীতিক উন্নয়ন নামে অভিহিত করা যায়। একথাও মনে রাখা দরকার যে রাজনীতিক উন্নয়ন হল সরকার প্রভাবিত ও পরিকল্পিত সুচিন্তিত পরিবর্তনের কার্যক্রম ও তার আনুষঙ্গিক ধারা।

রাজনীতিক উন্নয়নের পশ্চিমী আলোচকরা মূলত এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন যে, পশ্চিমী শিল্পোন্নত দেশগুলিই বিশ্বের অনগ্রসর ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সামনে রাজনীতিক উন্নয়নের মানদণ্ড স্থাপন করেছে যা তারা সচেতন বা অসচেতনভাবে অনুসরণ করে চলে। এই প্রত্যয়ে স্থিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে Karl Deutsch, Daniel Larner, Edward Shils এবং Rostow ও Pye-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই চিন্তাবিদ্‌রা প্রায় সকলেই রাজনীতিক উন্নয়নশীলতার অন্যতম প্রধান চারিত্রলক্ষণ হিসেবে রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় জনগণের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণকে চিহ্নিত করেছেন। Rostow ও Pye-এর মতে, রাজনীতিক উন্নয়নের লক্ষ্য হল জাতীয় ঐক্য ও রাজনীতিক অংশগ্রহণের পরিসরের বিস্তৃতিসাধন। Edward Shil-ও রাজনীতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হিসেবে রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় জনগণের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের বিষয়টিকে চিহ্নিত করেছেন।

অন্যদিকে Everett Hagen, Eisenstadt, G.A. Almond প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনীতিক উন্নয়নের বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মূল প্রতিপাদ্য হল, বিকাশমান দেশের আর্থ-সমাজিক রূপান্তর প্রক্রিয়ার ফলে সমকালীন সমাজজীবনে যে জটিলতা ও সমস্যাদির সৃষ্টি হয় তাকে সক্রিয়ভাবে মোকাবিলা করতে রাজনীতিতে যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো ও প্রক্রিয়া পদ্ধতি গড়ে ওঠে তাকে রাজনীতিক উন্নয়ন বলে অভিহিত করা যায়। Hagen যেমন রাজনীতিক উন্নয়ন বলতে বুঝিয়েছেন "growth of institutions & practices that allow a political system to deal with its own fundamental problems more effectively". তেমনই একই জাতীয় মন্তব্য করে Eisenstadt রাজনীতিক উন্নয়নকে বলেছেন "the ability of a political system to sustain continuously new types of political demands & organisations". রাজনীতিক উন্নয়ন সম্পর্কে প্রায় হুবহু একই সুরে কথা বলেছেন Alfred Diament.

তবে রাজনীতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিচার-বিশ্লেষণের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণের কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপরোক্ত আলোচনায় দেবার চেষ্টা করা হলেও দু'টি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টিকোণকে আরও একটু বিশদভাবে দেখা যেতে পারে।

২৯.৫.১ রাজনীতিক উন্নয়ন বিষয়ে Almond-এর দৃষ্টিকোণ

Gabriel Almond বর্তমান বিশ্বের রাজনীতিক ব্যবস্থাসমূহকে ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক—প্রধানত এই দু'টি ভাগে ভাগ করলেও এ দুইয়ের মধ্যবর্তী একটি পরিবর্তনশীল পর্যায়ের (Transitional) ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই বিভাজন প্রয়াস যে বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে তা হল, একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সমস্যাবলীর মোকাবিলার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থা অপেক্ষা আধুনিক ব্যবস্থা অধিকতর 'দক্ষ'। রাজনীতিক ব্যবস্থায় দক্ষতা বা 'সামর্থ্য' বলতে বিদ্যমান পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে কার্য সম্পাদনের প্রক্রিয়াকে বোঝায়। Almond-এর মতে, রাজনীতিক ব্যবস্থার এই দক্ষতা বা সামর্থ্য তিনটি পর্যায়ের কার্যাবলীর দ্বারা যাচাই হয়—(ক) রূপান্তর প্রক্রিয়া সম্পর্কিত কার্যাবলী, (খ) পরিচালনা সম্পর্কিত কার্যাবলী ও (গ) অভিযোজনমূলক কার্যাবলী।

Almond ও Powell বর্তমান বিশ্বের রাজনীতিক উন্নয়নধারাকে বিচার করতে গিয়ে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াগুলির উপর। এদের বিশ্লেষণে রাজনীতিক উন্নয়নের চারটি মূল সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে : (১) রাষ্ট্রিক গঠন (State building), (২) জাতিগঠন (Nation building), (৩) রাজনীতিক অংশগ্রহণ (Political Participation) এবং (৪) বণ্টন ও কল্যাণসাধন (Distritution & Welfare)।

রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রিক ও প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য নতুন নতুন কাঠামো গড়ে তোলা এবং প্রচলিত কাঠামোগুলির মধ্যে বিভক্তিকরণ ও বিশেষীকরণের ব্যবস্থা করাই হল রাষ্ট্রগঠন। সাবেকি রাষ্ট্রব্যবস্থা সরলমাত্রিক সংগঠন ও প্রশাসনিক পরিকাঠামোর দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু ঐসব দেশের আর্থসামাজিক পটভূমিতে ধীরে ধীরে যেসব রূপান্তরজাত জটিল সমস্যাদির সৃষ্টি হয় তার সমাধানের প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় স্তরে

নানা বিশেষীকৃত সংগঠন ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে উঠতে থাকে। সাবেকি সমাজের ঐতিহ্যবাহী সংগঠনসমূহের কর্তৃত্বের প্রান্তসীমাতেও রাষ্ট্রীয় প্রাধিকার প্রসারিত হয় এইসব নবোদ্ভূত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। তাই রাষ্ট্রগঠনের এই প্রক্রিয়াকে অনেকে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ (Institution Building) বলেও অভিহিত করেন।

রাজনীতিক উন্নয়নের আর এক পরিপূরক দিক হল জাতিগঠন। সাবেকি সমাজের জনসমষ্টির মধ্যে জাতিগত সংহতি দুর্বল ও শিথিল। ব্যক্তির জাতিগত আনুগত্য-চেতনার চেয়ে জ্ঞাতিগোষ্ঠীগত, কৌমগত বা সম্প্রদায়গত আনুগত্য চেতনা প্রবলতর হয়। লক্ষ্যণীয় হল, রাষ্ট্রগঠন ও জাতিগঠন প্রক্রিয়া পরস্পরের পরিপূরক হলেও উভয়ের মধ্যে সমান সাযুজ্য বহু সময়েই রক্ষিত হয় না।

রাজনীতিক উন্নয়নের আর এক প্রায় অনিবার্য বিশেষত্ব হল রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রক্রিয়ায় ব্যাপক সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি। নানা রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও স্বার্থগোষ্ঠী ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণ তাদের রাজনীতিক অংশগ্রহণের দাবী জোরদার করে তোলে। এইসব দাবীদাওয়ার চাপে সরকারও বাধ্য হয় রাজনীতিক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে ও তাকে সম্প্রসারিত করতে।

আর রাজনীতিক অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির সাথে সাথেই আর্থিক, সামাজিক ও রাজনীতিক সুযোগসুবিধার অপেক্ষাকৃত সুষম বণ্টন ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্র নানা কল্যাণধর্মী কর্মসূচী ও প্রকল্প গ্রহণে আগ্রহী হয়, অথবা বাধ্য হয়।

২৯.৫.২ রাজনীতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে Lucian Pye

রাজনীতিক উন্নয়নের প্রসঙ্গে Lucian Pye-এর ধারণা পরিচিতি লাভ করেছে উন্নয়নের লক্ষণগুচ্ছ (Development Syndrome) নামে। উন্নয়নের প্রধান লক্ষণগুলিকে চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি যে তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন সেগুলি হল সমতা (Equality), সামর্থ্য (Capacity) এবং বিভক্তিকরণ (Differentiation)।

রাজনীতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ এবং রাজনীতিক কাজকর্মের সাথে সমাজের বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার বিষয়টিকেই অধ্যাপক Pye সমতা বলে উল্লেখ করেছেন। একেই সক্রিয় নাগরিকতা (Active Citizenship) বলে অভিহিত করা হয়। রাজনীতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এমন এক রাজনীতিক সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে যেখানে সাবেকি সমাজের বিভেদ-বৈষম্যের বদলে আইনগত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজনীতিক উন্নয়নের দ্বিতীয় চারিত্রলক্ষণ হিসেবে যে সামর্থ্যের কথা বলা হয়েছে তার সহজ অর্থ হল পরিবর্তমান সমাজ-অর্থনীতিক বাস্তবতাকে মোকাবিলা করার, নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করার সক্ষমতা। উন্নয়নশীল রাজনীতিক ব্যবস্থার এই সক্ষমতা সৃষ্টি হয় রাজনীতিক কাঠামোর নতুন নতুন বিভাজনের মাধ্যমে। অর্থাৎ, কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই সক্ষমতার বিচার করা যায়। তাই অধ্যাপক Pye-এর মতে, সরকারের কাঠামোসমূহের কার্য সম্পাদনের উপর রাজনীতিক ব্যবস্থার সামর্থ্য নির্ভর করে।

রাজনীতিক উন্নয়নের তৃতীয় চারিত্রলক্ষণ হল বিভাজনকরণ বিশেষীকরণ। (Differentiation Specialization)। অনগ্রসর অর্থনীতি থেকে অগ্রসর শিল্পোন্নত অর্থনীতিতে উত্তরণের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান শ্রমবিভাগের যে ভূমিকা উন্নয়নশীল রাজনীতিক ব্যবস্থায় কর্মগত বিভক্তিকরণ ও কর্মগত বিশেষীকরণের ভূমিকাও সমতুল। একটি অনগ্রসর রাষ্ট্রব্যবস্থা ক্রমিক অগ্রগতির পথে এগোতে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে বিভক্তিকরণ ও কর্মগত বিশেষীকরণের অনিবার্যতাকে এড়াতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সতর্কবাণীটি উচ্চারণ করে অধ্যাপক Pye বলেছেন, উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সমতা, সামর্থ্য, ও বিভক্তিকরণের যে ত্রিমাত্রিক লক্ষণগুচ্ছ, তারা যে পরস্পরের সাথে নিশ্চিতভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ তা নয়; বরং ঐতিহাসিকভাবে এগুলির মধ্যে রীতিমতো টানাপোড়েন বর্তমান। ("In recognising these three dimensions of equality, capcity & differentiation as lying at the heart of the development process we do not mean to suggest that they necessarily fit easily together. On the contrary, historically the tendency has been that there are acute tensions between the demands for cquality, the requirements for capacity & the process of great differentiation".)

২৯.৬ ভারতে রাজনীতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ

অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মতো ভারতেও আধুনিকীকরণ ও রাজনীতিক উন্নয়নের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে ঘনিষ্ঠ। ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতে ঔপনিবেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডকে ঘিরে আধুনিক নগর-জীবনের সূচনা হয়; সীমিত মাত্রায় হলেও সূত্রপাত হয় আধুনিক ধারার শিক্ষাসংস্কৃতি ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার, শুরু হয় প্রযুক্তি প্রয়োগের বিক্ষিপ্ত প্রসার। আধুনিক সড়ক পরিবহন, রেলপথের প্রচলন, ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক বিধিব্যবস্থার প্রসার, মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে দেশী-বিদেশী ভাষার সংবাদপত্রের প্রকাশ ইত্যাদি আমাদের সাবেকি সমাজ, অর্থনীতিতে ধীরে ধীরে নানা রূপান্তর সাধন করতে থাকে; জন্ম নেয় নতুন নতুন সামাজিক শক্তি; শুরু হয় সমাজ-রাজনীতিক চেতনায় নানা আন্দোলনের ধারা।

ঔপনিবেশিক পর্বের এইসব আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া ও তার থেকে উদ্ভূত আর্থ-সামাজিক রূপান্তর শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী চেতনাকে প্রসারিত ও বেগবান করেছে। তবে মনে রাখা দরকার যে, এই জাতীয়তাবদী চেতনা ইউরোপীয় ধারার আধুনিকতাকে গ্রহণ ও আত্মস্থ করতে শুধু অপারগই ছিল না, অনেক ক্ষেত্রে অনিচ্ছুকও ছিল। সাবেকি ঐতিহ্যের ক্রমিক অবলুপ্তির মধ্য দিয়ে আধুনিকতার বোধন ঘটেনি এখানে; বরং ঘটেছে সাবেকি ঐতিহ্যের আধুনিকীকরণ (modernization of tradition)—যার মধ্যে অনেক আপাত-অসঙ্গতি ও স্ববিরোধিতা রীতিমতো প্রবল।

এরই পাশাপাশি স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনীতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে বিচার করা যেতে পারে। ঔপনিবেশিক পর্বে জাতীয়তাবাদী বিচার করা যেতে পারে। ঔপনিবেশিক পর্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী যেটুকু সীমিত রাজনীতিক অংশগ্রহণের সুযোগ ভারতীয়দের দিয়েছিল তা আধুনিক শাসনপ্রণালী ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে দেশীয় উচ্চবর্গীয়দের কিছু পরিমাণে অভিজ্ঞ ও দক্ষ করে তুলেছিল।

স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরে এই এলিট সম্প্রদায় রাজনীতিক উন্নয়নের ধারাকে প্রধানত উদারনীতিবাদী মতাদর্শের প্রেরণায় এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়াসী হয়। ভারতীয় সমাজে বাস্তবের উপযুক্ত অথচ আধুনিক জাতি গঠনের সহায়ক একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্বেষণ এজন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। বিপুল বৈচিত্র্যে ভরা ভারতের সমাজ-অর্থনৈতিক জীবনধারায় এক বহুত্ববাদী প্রতিনিধিমূলক প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস ও বিধিব্যবস্থা ছিল প্রায় অপরিহার্য। Almond-কথিত রাষ্ট্রগঠনের ও জাতিগঠনের কথা মাথায় রেখেই ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দ ১৯৪৯-এর শাসনতন্ত্রে বিশদভাবে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানিক বিন্যাস ও জাতীয় সংহতি বৃদ্ধির সম্ভাব্য প্রকল্পগুলির সন্নিবেশ ঘটান। এর ফলে স্বাধীন ভারতবর্ষে রাজনীতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের ব্যাপকতর অংশগ্রহণের সুযোগ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বলা বাহুল্য ক্রমপরিবর্তমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা থেকে উদ্ভূত নতুন নতুন দাবীদাওয়া ও সঙ্কটগুলির মোকাবিলার ভারতীয় রাজনীতিক ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে তার সামর্থ্যের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে। মনে করা হয়, এই সামর্থ্য বা দক্ষতা অর্জিত হয়েছে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমাগত বিভক্তিকরণ ও বিশেষীকরণের মাধ্যমে।

২৯.৭ সারাংশ

তুলনামূলক রাজনীতি চর্চায় এবং রাজনীতিক সমাজতত্ত্বের আলোচনায় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রাজনীতিক উন্নয়নের প্রশ্নটি। আপাতভাবে সমার্থক মনে হলেও 'রাজনীতিক পরিবর্তন' ও 'রাজনীতিক উন্নয়ন' দু'টি ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে। সমস্ত রাজনীতিক পরিবর্তন রাজনীতিক উন্নয়ন বলে বিবেচিত হয় না।

রাজনীতির উন্নয়নের সাথে আধুনিকীকরণের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বস্তুত, ইউরোপীয় ধাঁচের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের বহু অনগ্রসর রাষ্ট্র-রাজনীতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। রাজনীতিক উন্নয়নধারার কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ এইসব দেশের রাজনীতিক ব্যবস্থায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

রাজনীতিক উন্নয়নকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজতাত্ত্বিকরা আলোচনা করলেও কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা অনেকেই বলেছেন। রাজনীতিক কর্মকাণ্ডে এবং বিশেষত সরকারি সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক গণ-অংশগ্রহণ, রাজনীতিক বিধিবিধানের সমতা, ক্রমপরিবর্তমান সমাজের নতুন নতুন দাবীদাওয়া, দ্বন্দ্বসংকট ইত্যাদি সমাধানে রাষ্ট্রব্যবস্থার দক্ষতা বা সামর্থ্য এবং রাজনীতিক কাঠামোর সাংগঠনিক বিভক্তিকরণ ও কর্মগত বিশেষীকরণ বৃদ্ধি—রাজনীতিক উন্নয়নের সাধারণ লক্ষণ বলে স্বীকৃত।

২৯.৮ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

১। রাজনীতিক পরিবর্তন ও রাজনীতিক উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য কী?

২। রাজনীতিক উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনার পটভূমি ব্যাখ্যা করুন।

৩। আধুনিকীকরণ ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

৪। 'ঐতিহ্যের আধুনিকীকরণ' ধারণাটি কী?

৫। রাজনীতিক উন্নয়ন বিষয়ে Almond-এর দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করুন।

৬। রাজনীতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে Lucian Pye-এর মতামত আলোচনা করুন।

৭। ভারতের রাজনীতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া বিষয়ে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।

২৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। G. A. Almond & G. B. Powell : Comparative Politics

২। Ali Ashraf & L. N. Sharma : Political Sociology

৩। J. C. Johari : Comparative Politics

৪। Samuel Huntington : Political Order in a Changing Society

৫। মৃণালকান্তি ঘোষদস্তিদার : রাজনীতিক সমাজবিজ্ঞান

একক ৩০ □ রাজনীতিক পরিবর্তন ও বিপ্লব

গঠন

৩০.০ উদ্দেশ্য

৩০.১ প্রস্তাবনা

৩০.২ রাজনীতিক পরিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তন

৩০.৩ রাজনীতিক পরিবর্তনের কারণ (উৎস)

৩০.৩.১ রাজনীতিক পরিবর্তনের উৎসগত উপাদানসমূহ

৩০.৪ রাজনীতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা

৩০.৪.১ প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র, অভ্যুত্থান

৩০.৪.২ বিপ্লব

৩০.৫ রাজনীতিক পরিবর্তন : মতাদর্শের ভূমিকা

৩০.৬ সারাংশ

৩০.৭ অনুশীলনী

৩০.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে—

- রাজনীতিক পরিবর্তনের সাথে সামাজিক পরিবর্তনের পার্থক্য।
- রাজনীতিক পরিবর্তনের প্রধান উৎসগুলি কী?
- রাজনীতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা।
- রাজনীতিক পরিবর্তন হিসেবে বিপ্লবের প্রকৃতি ও তাৎপর্য।
- রাজনীতিক পরিবর্তনে মতাদর্শের ভূমিকা।

৩০.১ প্রস্তাবনা

সামাজিক রূপান্তরের মতোই রাজনীতিতেও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের এক বিরামহীন প্রক্রিয়া বর্তমান। রাজনীতির এই গতিশীল পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার মূলে আছে সমাজের পরিবর্তমান আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক

পরিস্থিতি। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজের নানা আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়া হিসেবেই রাজীনতিতে প্রতিনিয়ত নানা পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটে বা ঘটানো হয়। সমাজের এই পরিবর্তমান আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিস্থিতির অন্তর্ভুক্ত বিষয় বা উপাদানগুলো বহু ও বিচিত্র। যেমন, আর্থনীতিক উৎপাদনধারার পরিবর্তন, প্রযুক্তিগত কলাকৌশলের পরিবর্তন, জনসংখ্যাগত ও অভিবাসনগত (migration) পরিবর্তন, নগরায়ণ জনিত পরিবর্তন, নতুন নতুন সামাজিক শ্রেণীসমূহের উদ্ভবগত পরিবর্তন, শিক্ষাসংস্কৃতি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যবসা বা নিয়োগগত পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের ভারসাম্যের পরিবর্তন ইত্যাদি। এই সমস্ত নানা পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে রাজনীতিক সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া, রাজনীতির সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানগত বিন্যাস ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াগুলির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই পরিবর্তনের বা রূপান্তরের রূপ, প্রক্রিয়া ও প্রকরণ, বলা বাহুল্য, সবক্ষেত্রে একরকম নয়। রাজনীতিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া কখনো যেমন ক্রমিক সংস্কারপন্থী কখনো তা আবার আমূল সংশোধনপন্থী ও আকস্মিক; কখনো যেমন সীমিত বা খণ্ডিত কখনোবা তা ব্যাপক; কখনো যেমন তা শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক কখনো তা আবার সহিংস ও রক্তক্ষয়ী।

বিপ্লব, বলা বাহুল্য, এক বিশেষ ধরনের সমাজ-রাজনীতিক পরিবর্তন যার প্রক্রিয়া-প্রকরণ অন্যান্য ধারার পরিবর্তন থেকে মূলত এবং স্পষ্টতই স্বতন্ত্র। এই পরিবর্তন আমূলপন্থী ও চরমপন্থী তো বটেই, এবং সেই কারণেই এর ব্যাপ্তি ও গভীরতা সমাজজীবনকে অনেক বেশি মাত্রায় উৎক্ষিপ্ত ও আলোড়িত করে। রাজনীতিক পরিবর্তন হিসেবে বিপ্লবের এই স্বতন্ত্রময় প্রকৃতি ও ভূমিকার জন্য বিপ্লব সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাত্ত্বিকরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিপ্লবের প্রকৃতি ও তাৎপর্য পর্যালোচনা করেছেন।

৩০.২ রাজনীতিক পরিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তন

সমাজ ও রাজনীতি পরস্পর-নিরপেক্ষ তো নয়ই, বরং উভয়ে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। এই পারস্পরিক সাপেক্ষতাই রাজনীতিক সমাজতত্ত্ব (Political Sociology)-র কেন্দ্রীয় ধারণা।

সমাজ বলতে সাধারণভাবে বোঝায় কোনও জনগোষ্ঠীর সদস্যদের পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে-ওঠা নিবিড়, বিচিত্র ও জটিল সম্বন্ধজাল। স্বভাবতই এই জটিল সম্বন্ধজাল থেকে জন্ম নেয় কিছু প্রয়োজনীয় কাঠামো বা প্রতিষ্ঠান এবং আনুষঙ্গিক বিধিব্যবস্থা। মানুষের গতিশীল জীবনধারায় এই পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার যেমন পরিবর্তন ঘটে তেমনি পরিবর্তন ঘটে এইসব কাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট বিধিব্যবস্থার। সামগ্রিকভাবে একটি জনগোষ্ঠীর এই সমুদয় রূপান্তরকেই আমরা সামাজিক পরিবর্তন বলে অভিহিত করতে পারি।

সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপকে আর একভাবে কেউ কেউ বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। মানবদেহের অভ্যন্তরে অবিরাম নানা রাসায়নিক রূপান্তর বা metabolism ঘটে, ফলশ্রুতিতে মানুষের আকৃতি-প্রকৃতিতে নানা পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তেমনি সমাজদেহের অভ্যন্তরে যে অবিরাম নানা পরিবর্তন ঘটে চলে তাকে Social metabolism বা সমাজদেহের রাসায়নিক রূপান্তর বলা যেতে পারে।

রাজনীতি হল সমাজের সুসংগঠিত ও বৈধতাপূর্ণ কর্তৃত্বকাঠামো ও তার প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসের সাথে সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা। স্বভাবতই সংশ্লিষ্ট সমাজ-অর্থনীতির পটভূমিকে বাদ দিয়ে কোনও রাজনীতি—অর্থাৎ এই বৈধতাপূর্ণ কর্তৃত্ব-কাঠামোর বিন্যাস ও বিধিব্যবস্থাকে ও তার গতিপ্রকৃতিকে যথার্থভাবে অনুধাবন করা যাবে না। অন্যদিক থেকে বলা যায়, রাজনীতি ও রাজনীতিক পরিবর্তন অনিবার্যভাবেই সমাজ-অর্থনীতির সাথে ও তার পরিবর্তন-প্রবাহের সাথে অন্বিত। কিন্তু রাজনীতিক পরিবর্তন দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে যত নিবিড়ভাবেই সম্পর্কিত হোক না কেন রাজনীতিক পরিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তন দু'টি সমার্থক ধারণা নয়। সমগ্র সমাজজীবনকে একটি ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করলে রাজনীতিকে ঐ ব্যবস্থার 'উপব্যবস্থা' (Sub-system) বলে ধরা যেতে পারে।

৩০.৩ রাজনীতিক পরিবর্তনের কারণ (উৎস)

রাজনীতিক অন্তর্নিহিত সত্তাটি প্রোথিত আছে মানবসমাজের দ্বন্দ্ব সংঘাতময় পটভূমিতে। মানবসমাজের সুদূরতম অতীত থেকে অত্যাধুনিক কাল পর্যন্ত কোনও কালেই এই দ্বন্দ্বময় পটভূমির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি। (মার্ক্স-কথিত আদিম সাম্যবাদী সমাজ সম্পর্কেও বিতর্কের অবকাশ বর্তমান)। আর এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় সামাজিক পটভূমি ও তৎসংশ্লিষ্ট আধিপত্য-অধীনতার প্রশ্নগুলি—যা সমাজে রাজনীতি নামক প্রক্রিয়া-প্রকরণের জন্ম দিয়েছে—এক চিরন্তন প্রবাহ হিসেবে সমাজে টিকে আছে। এই দিক থেকেই রাজনীতিকে সমাজের অন্তর্গত এক বিরামহীন স্রোত হিসেবে গণ্য করা যায়। তার অর্থ অবশ্যই এ নয় যে এই স্রোতের ধারাবদল ঘটেনি। বরং প্রকৃতি সত্যটি হল, এই স্রোতের ধারাবদল ঘটেছে ইতিহাসের নানা পর্যায়ে, নানাভাবে এবং এগুলোই বিভিন্ন মানবসমাজের ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। এককথায় তাই, রাজনীতি আর সমাজের চলমানতা পরস্পরকে নিয়ন্ত্রিত করে। রাজনীতির এই পরিবর্তনশীল ধারা নানা সামাজিক ও আর্থনীতিক উপাদানসমূহের ব্যাপক সমাহারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত। ("Political change is intricately related to a wide Spectrum of social & economic factors"—Davies & Lewis : Models of Political Systems) । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনও সমাজে যখন শিল্পায়ন, নগরায়ণ, শিক্ষার বিস্তার, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ইত্যাদি প্রক্রিয়া ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে তখন তার প্রতিক্রিয়ায় নতুন মূল্যবোধ, প্রত্যাশা ও নতুন নতুন দাবীদাওয়া জন্ম নেয় আর এইসব প্রত্যাশা ও দাবীদাওয়াগুলির মোকাবিলায় এবং তার সাথে সঙ্গতি বজায় রাখতে দেশে রাজনীতিক ব্যবস্থা তার নিজস্ব কাঠামোগত বিন্যাস ও পদ্ধতি-প্রকরণে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন না করে পারে না। সচরাচর এই পরিবর্তন ক্রমান্বয়িক, ধীরগতিসম্পন্ন ও নিয়মতান্ত্রিক। কিন্তু এ কথা কখনো বলা যাবে না যে, দেশের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে যেসব নতুন প্রত্যাশা ও দাবীদাওয়া জন্ম নেয় এবং দেশের রাজনীতিতে অভিঘাত সৃষ্টি করে, রাজনীতির প্রক্রিয়ায় তার সমানুপাতিক পরিবর্তনই সূচিত হয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, রাজনীতিক পরিবর্তনের গতিবেগ বা মাত্রা সমাজে গড়ে ওঠা চাহিদা ও দাবীদাওয়ার তুলনায় শ্লথগতি ও সীমিতমাত্রিক। বস্তুত, সামাজিক প্রত্যাশার সাথে তুলনায় রাজনীতি পরিবর্তনের বাস্তব গতির যে অসামঞ্জস্য বা ঘাটতি তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকলে সমাজের পুঞ্জিভূত বিক্ষোভ ইতস্তত বিদ্রোহ-বিস্ফোরণের ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ ঘটায়; আবার কখনোবা তা সুপরিকল্পিত

বিপ্লবের রূপ নেয়। এ কারণে আধুনিক কালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, উন্নত রাজনীতিক ব্যবস্থার অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হল সমাজের গতিশীল প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে গড়ে ওঠা দ্বন্দ্ব-সংঘাত আত্তীকরণ করার ক্ষমতা, এবং এই ক্ষমতাই ঐ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের বা ধারাবাহিকতার গ্যারান্টি। একে আমরা বলতে পারি 'পরিবর্তনের মাধ্যমে ধারাবাহিকতা' (Continuity through change)।

৩০.৩.১ রাজনীতিক পরিবর্তনের উৎসগত উপাদানসমূহ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানবসমাজে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, বর্গ, সম্প্রদায় ইত্যাদির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের উৎসভূমি থেকেই রাজনীতিক প্রক্রিয়া-প্রকরণ ও তার নির্দিষ্ট বিধিব্যবস্থার জন্ম। স্বভাবতই রাজনীতিক পরিবর্তনের মূলেও রয়েছে এই দ্বন্দ্বসঙ্কুল সমাজের গতিশীল প্রক্রিয়া যা অনিবার্যভাবেই রাজনীতিক বিধিব্যবস্থার উপর নানা অভিঘাত সৃষ্টি করে ও রাজনীতির প্রক্রিয়া-প্রকরণের পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।

সমাজের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দরুনই দেশের রাজনীতিক পরিবর্তনের সূচনা হয়—সাধারণভাবে এ কথা বলা হলেও রাজনীতিক পরিবর্তনের নির্দিষ্ট কারণ হিসেবে কয়েকটি প্রধান উপাদানসূত্রের নির্দেশ করা হয়। Tom Bottomore এইরকম নির্দিষ্ট কয়েকটি উপাদানসূত্রকে গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছেন। গুরুত্বের দিক থেকে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সমাজের অর্থনৈতিক উৎপাদন ধারার রূপান্তরকে। মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, সমাজের অর্থনৈতিক বা বৈষয়িক উৎপাদনধারার রূপান্তর শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট। যে-কোনও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বৈষয়িক উৎপাদনধারাকে কেন্দ্র করে যে দু'টি মুখ্য শ্রেণী দুই পরস্পর-বিপরীত স্বার্থের সংঘাতে লিপ্ত হয়, তার পরিণতিতে সমাজে ক্ষমতা-কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে যা অবশ্যম্ভাবীভাবেই রাজনীতিক পরিবর্তনের সূচনা করে। মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী, সমাজের বৈষয়িক উৎপাদন ও বণ্টনধারা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর নির্ভর করেই রাজনীতিক উপরি-কাঠামো গড়ে ওঠে এবং এই অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন রাজনীতিক উপরি-কাঠামোর পরিবর্তন রূপান্তরকে নিয়ন্ত্রিত করে। শুধু রাজনীতিক উপরি-কাঠামোই নয়, অন্যান্য উপরি-কাঠামো, যেমন সামাজিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক উপরি-কাঠামোতেও পরিবর্তন সঞ্চারিত হয় এই অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপান্তরের দরুনই।

আবার রাজনীতিক পরিবর্তনের মূলে অর্থনৈতিক উপাদানের প্রভাবকে অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনও কোনও সমাজতাত্ত্বিক বিচার করার চেষ্টা করেছেন। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনকে এখানে কোনও শ্রেণীগত স্বার্থের মধ্যেকার সংঘাতের ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা হয় না, দেখা হয় উৎপাদন কর্মে নিযুক্ত প্রযুক্তিগত কলাকৌশলের বিপুল অগ্রগতি এবং উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় তজ্জনিত রূপান্তর হিসেবে। বিশেষত আধুনিক শিল্পসমাজের উদ্ভব ও বিকাশের পটভূমিতে এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, অত্যাধুনিক যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সমাজ-অর্থনীতিতে যে নতুন নতুন শক্তির উদ্ভব হয়, সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের যে নতুন নতুন প্রবাহ-প্রবণতা সৃষ্টি হয় এবং সর্বোপরি এসবের চাপে সামাজিক শক্তির যে নতুন গতিশীল ভারসাম্য গড়ে ওঠে তা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার নিরন্তর অভিঘাত সৃষ্টি করে।

আর একদিক থেকেও এই আধুনিক প্রযুক্তি রাজনীতিক বিধিব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। শিল্পবিপ্লব পরবর্তী বিশ্বে এই বিপুল যান্ত্রিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশ-বিস্তার শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বণ্টন-বিনিময় ধারায় বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটায়নি, বদলে দিয়েছে মানবিক সম্পর্ক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা

ইত্যাদি, যার অভিঘাতে পরিবর্তন ঘটছে রাজনীতির প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান সমূহে। যান্ত্রিক প্রযুক্তির এই অভূতপূর্ব অগ্রগতি সংযোগ-ব্যবস্থাও প্রশাসনিক দক্ষতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলে রাজনীতির গতিপ্রকৃতিকে প্রভাবিত করেছে। আধুনিক প্রযুক্তির এই অভাবনীয় অগ্রগতি (যেমন কৃত্রিম উপগ্রহ যোগাযোগ, ইন্টারনেট-কম্পিউটার যোগাযোগ, আণবিক বোমা ইত্যাদি) শুধুমাত্র জাতীয় রাজনীতিকেই নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও তার শক্তিসাম্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে।

রাজনীতিক পরিবর্তনের আর এক প্রত্যক্ষ উপাদানসূত্র হল যুদ্ধ। কোনও কোনও সমাজতত্ত্ববিদ বিশেষত কোঁত, স্পেন্সার, ওপেনহাইমার মানবসমাজের প্রত্যক্ষ রূপান্তরের মূলে এক প্রভাবশালী উপাদান হিসেবে যুদ্ধের ভূমিকাকে স্বীকার করেছেন। প্রাচীনকাল থেকে যুদ্ধের মাধ্যমে ছোট ছোট গোষ্ঠীসমাজের বিস্তার ঘটেছে; উপজাতীয় জীবন বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় জীবনের অঙ্গীভূত হয়েছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সমবায়ে গড়ে উঠেছে সুবিশাল সাম্রাজ্য। খণ্ড-ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ বিশালতা দান করে এবং তার সাংগঠনিক ভিত্তির দৃঢ়করণের মাধ্যমে যুদ্ধ মানবসমাজের রাজনীতিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানের রূপান্তর সাধন করেছে। আবার 'স্বাধীনতাযুদ্ধ'-এর মাধ্যমেই স্বতন্ত্র জাতিসত্তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এবং বৃহৎ সাম্রাজ্যের বিনাশ সাধিত হয়েছে। এককথায়, যুদ্ধ যেমন একদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীকে সমন্বিত করেছে, অন্যদিকে তেমনি সুবৃহৎ সাম্রাজ্যকে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন করে জন্ম দিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ধারার স্বশাসনের। ফলত, রাজনীতিক ও প্রশাসনিক পন্থা-পদ্ধতির নব নব রূপান্তরের মূলে যুদ্ধের প্রভাব অবিসংবাদী।

আবার, কার্ল ম্যানহাইম প্রজন্মগত বিষমতা বা ব্যবধানকে (Generation gap) রাজনীতিক পরিবর্তনের অন্যতম উপাদানসূত্র বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত, আধুনিককালে দ্রুত পরিবর্তনশীল মানবসমাজে সমাজের এক নতুন প্রজন্ম পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকে দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ, রুচি ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে এতটাই বদলে যায় যে নিজেদের প্রত্যাশা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণে নতুনতর রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার দাবী জানাতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বিগত শতকের ৬০-এর দশকে ইউরোপে ছাত্র-যুব আন্দোলন অথবা প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিপ্লব-পরবর্তী নতুন প্রজন্মের গণতন্ত্র ও মুক্ত সমাজের দাবীর কথা উল্লেখ করা যায়। এ প্রসঙ্গে গণপ্রজাতান্ত্রিক চীনে তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে সমবেত ছাত্রদের আন্দোলনের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। সাম্প্রতিক কালের নারীবাদী আন্দোলন সমাজ ও রাষ্ট্রকর্তৃত্ব এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা তথা মানবাধিকারের ধারণায় নতুন এক মাত্রা যোগ করেছে। দেশের পূর্বানুসৃত বিধিবিধান-এর ফলে বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

৩০.৪ রাজনীতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা

প্রকৃতিগত বিচারে রাজনীতিক পরিবর্তনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত বা অনিবার্য পরিবর্তনের ধারা এবং অন্যটি ঈপ্সিত, প্রস্তাবিত ও পরিকল্পিত ধারা। প্রতিনিয়ত আমাদের সমাজজীবনে যে বিচিত্র গতিশীল প্রক্রিয়া—আর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত—দেশের রাজনীতিক বিধিব্যবস্থার উপর অনিবার্যত নানা অভিঘাত সৃষ্টি করে, তার প্রভাবে রাজনীতিতে পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই কারণে এই পরিবর্তনকে স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত বা কিছু পরিমাণে মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ পরিবর্তন বলে চিহ্নিত করা যায়। এই জাতীয় পরিবর্তনের ফলে রাজনীতিক প্রক্রিয়া-প্রকরণ-প্রতিষ্ঠানাদির যে রূপান্তর সাধিত হয় তাকে কোনোক্রমেই গুণগত পরিবর্তন বলে গণ্য করা চলে না; বড় জোর তা এক মাত্রাগত পরিবর্তন।

বলা বাহুল্য, বিশ্বের প্রায় সকল রাজনীতিক ব্যবস্থাতেই অল্পবিস্তর এ জাতীয় পরিবর্তন ক্রমাগত সংঘটিত হয়ে চলেছে।

আর দ্বিতীয় প্রকৃতির পরিবর্তন হল মানুষের ইচ্ছাপ্রসূত ও পরিকল্পিত। কোনও রাজনীতিক ব্যবস্থায় উপরোক্ত এই স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার যে স্থিতিশীল ভারসাম্য বজায় থাকে তা সমাজের সকল অংশের ও স্তরের মানুষের কাছে সমানভাবে গ্রহণীয় বা সহনীয় হয় না। ফলে সেইসব মানুষ তাঁদের সচেতন প্রত্যাশায় প্রস্তাব করেন এবং পরিকল্পনা করেন কিছু বড়রকম পরিবর্তনের। বড়রকম পরিবর্তন মানেই যে তা সবসময় রাজনৈতিক ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তনের পক্ষপাতী; তা নয়। কখনও কখনও এই পরিবর্তন-পরিকল্পনা শুধুই পরিমাণগত বা মাত্রাগত, আবার কখনওবা তা রাজনীতিক ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন সূচিত করতে পারে। এই কারণে এই দ্বিতীয় প্রকৃতির পরিবর্তন—যা সচেতনভাবে মানুষের দ্বারা প্রস্তাবিত ও পরিকল্পিত—তা ভিন্ন ভিন্ন ধারায় সংঘটিত হতে পারে। তাই রাজনীতিতে এই প্রস্তাবিত বা পরিকল্পিত পরিবর্তন কখনও যেমন আমূলপন্থী বা বৈপ্লবিক তেমনি কখনও ক্রমিক ও ধীরগতিসম্পন্ন; কখনও পরিবর্তন যেমন আপোষমুখী কখনও তা আবার সংঘাতপূর্ণ; কখনও যেমন রক্তাক্ত তেমনি কখনও রক্তপাতহীন।

৩০.৪.১ প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, অভ্যুত্থান

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানবসমাজের দ্বন্দ্বসংঘাতময় পটভূমি ও তৎসংশ্লিষ্ট আধিপত্য- অধীনতার প্রশ্নগুলির সাথে রাজনীতি ও রাজনীতিক পরিবর্তনের বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট সময়কালে সামাজিক দ্বন্দ্বসংঘাত ও আধিপত্য-অধীনতার সমাধানসূত্র হিসেবে যে রাজনীতিক বিধিব্যবস্থা বা পদ্ধতিপ্রকরণ চালু থাকে তা সমাজের সকল অংশের অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধির পক্ষে স্বভাবতই সমান অনুকূল নয়। ফলে এই অসাম্য ও অসাম্যের বোধ থেকেই সঞ্চারিত হয় ক্ষোভ ও প্রতিবাদের। এই ক্ষোভ ও প্রতিবাদ কখনও কখনও বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের চেহারা নেয়। বিচ্ছিন্ন ক্ষোভ ও প্রতিবাদ কিছুটা সংগঠিত আকারে বিদ্রোহের চেহারা নিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর মধ্যে কোনও সুচিন্তিত পরিকল্পনা বা দূরায়ত লক্ষ্য স্থির থাকে না। স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ও বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদগুলিকে সুসংগঠিত করার মাধ্যমে এবং তাকে সুচিন্তিত ও দূরায়ত লক্ষ্যে পরিচালিত করেই কার্যকারীভাবে দূরপ্রসারী রাজনীতিক পরিবর্তন সাধন সম্ভব। তবে এই সুসংগঠিত ও সুপরিকল্পিত প্রয়াস দুই বিকল্প পথের অনুসারী হতে পারে; একটি অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পথ এবং অন্যটি সশস্ত্র ও বৈপ্লবিক পথ। তবে সচরাচর এই শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পথে সংঘটিত রাজনীতিক পরিবর্তনের চরিত্র হয় ধীরগতিসম্পন্ন ও নিতান্তই মাত্রাগত। এর দ্বারা রাজনৈতিক ব্যবস্থার কোনও আমল গুণগত পরিবর্তন ঘটে না। আবার এ কথা মনে করাও সঙ্গত নয় যে, চরম সংঘাতময় ও সশস্ত্র পরিবর্তনের ধারা মাত্রেই বৈপ্লবিক ও আমূল রূপান্তরের সূচক। যেমন, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র বা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সমাজ-অর্থনীতিতে কোনও গুণগত আমূল রূপান্তর সচরাচর ঘটে না। বস্তুত সমাজের গুণগত ও দূরপ্রসারী রূপান্তর সাধিত হয় একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমে। রাজনীতিক বিধিব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানাদির আমূল গুণগত রূপান্তরের ক্ষেত্রে বিপ্লবের অবদান ও ভূমিকা ব্যাপক ও চমকপ্রদ, তাই রাজনীতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিপ্লবের প্রকৃতি ও তাৎপর্য বিশেষ আলোচনা দাবী করে।

৩০.৪.২ বিপ্লব

রাজনীতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও চমকপ্রদ এক প্রক্রিয়া হলেও বিপ্লবকে ঘিরে নানা ধারণাগত বিভ্রান্তি ও তাত্ত্বিক বিতর্ক বর্তমান। বিপ্লবের রূপ ও স্বরূপ বিষয়ে যেমন নানা বিভ্রান্তিকর ধারণা প্রচলিত আছে তেমনি, এই প্রসঙ্গে, বিপ্লবের সঙ্গে হিংসার সম্পর্কটিকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক দানা বাঁধে। অনেকেই ভেবে থাকেন যে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের যে-কোনও ষড়যন্ত্রমূলক ও হিংসাত্মক প্রয়াসই হল বিপ্লব। এই অর্থে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য যে-কোনও 'প্রাসাদ ষড়যন্ত্র' বা কোনও সামরিক অভ্যুত্থানও বিপ্লব পদবাচ্য বা বিপ্লবের সমধর্মী। বলা বাহুল্য, এ ধারণা যথার্থ নয়। বিপ্লবের মধ্যে অতি অবশ্যই রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চেষ্টা থাকে, এবং প্রায়শই তার সাথে থাকে গোপন ষড়যন্ত্রমূলক প্রয়াস ও হিংসাত্মক পদ্ধতি। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বিপ্লবের প্রধানতম লক্ষণটি এর মধ্যে অনুপস্থিত। বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজে আধিপত্য-অধীনতার শ্রেণীগত বিন্যাস বদলে যায়। পূর্বেকার আধিপত্যকারী শ্রেণীর বদলে নতুন কোনও শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। অন্যদিকে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র বা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সমাজ বা রাজনীতিতে শ্রেণীগত ক্ষমতা বণ্টন বিন্যাসের কোনও হেরফের হয় না। ফলত, ঐতিহাসিক দিক থেকে বিপ্লবের মাধ্যমে সূচিত হয় সামাজিক অগ্রগতির এক গুণগত রূপান্তর। সামগ্রিকভাবে সমাজের এই গুণগত অগ্রগতির প্রভাবে ও প্রয়োজনেই রাজনীতিতেও ঘটে এক আমূল রূপান্তর, প্রতিষ্ঠিত হয় এক নতুন শ্রেণীস্বার্থের প্রাধান্য। আর এটাই হল বিপ্লবের মুখ্য চারিত্রলক্ষণ। অতএব যে-কোনও ধরনের গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি, প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র বা সামরিক অভ্যুত্থানকে বিপ্লবের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না; বরং কখনও কখনও বা প্রতি-বিপ্লব বলে চিহ্নিত হয়। অন্যভাবে বলা যায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের হিংসাত্মক প্রক্রিয়া মাত্রেই বিপ্লব নয়; বিপ্লব হল আর্থ-সামাজিক বিন্যাস-সংস্থাপনের এক গুণগত রূপান্তর প্রক্রিয়ার সূচক। আর এই প্রক্রিয়ায় ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান এবং জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এক অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে, প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র বা সামরিক অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকা নিতান্তই নিরুপায় দর্শকের।

এই প্রসঙ্গে বিপ্লবের সাথে হিংসার যথার্থ সম্পর্ক নিয়েও নানা বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। আর্থ-সামাজিক বিধিবিন্যাসের এক গুণগত রূপান্তর প্রক্রিয়ার পরিণতিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের যে প্রয়াস বিপ্লবের মাধ্যমে সংঘটিত হয় তা কি অনিবার্যভাবেই হিংসাশ্রয়ী ও রক্তপাতপূর্ণ? অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিপ্লব মূলতই ধ্বংসাত্মক ও সহিংস কর্মকাণ্ড যার মাধ্যমে পুরোনো সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (মূলত রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান)-কে ধ্বংস করে নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। আর এই চেষ্টার বিরুদ্ধে পূর্বেকার আধিপত্যকারী শ্রেণী ও প্রতিষ্ঠানগুলি সহিংস প্রতিরোধ গড়ে তোলে যার বিপ্লবী শ্রেণীগুলির পক্ষেও হিংসাশ্রয়ী পদ্ধতি অবলম্বন অবশ্যম্ভাবী ও জরুরি হয়ে ওঠে। কিন্তু বিপ্লবী শক্তির এই হিংসাশ্রয়ী প্রতিরোধের ধারা ও তার মাত্রা পরিস্থিতি ভেদে ভিন্ন হতে পারে। বিপ্লব-বিরোধী তাত্ত্বিকরা বিপ্লবকে সমাজ পরিবর্তনের এক হিংসাত্মক পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত করে এই অভিযোগ করেন যে, এই জাতীয় পরিবর্তনের দরুন সমাজে যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি, সম্পত্তির বিনাশ ও হত্যালীলা সংঘটিত হয় তার দ্বারা মানুষের কল্যাণের তুলনায় অকল্যাণই সাধিত হয় বেশি। সামাজিক ক্ষয়ক্ষতির এই উচ্চমূল্যের কারণেই বিপ্লব সমাজ পরিবর্তনের পন্থা হিসেবে অকাম্য ও পরিত্যাজ্য। অন্যদিকে, বিপ্লবের সমর্থকরা মনে করেন যে, বিপ্লবে হিংসা ও হত্যালীলার দায়ভাগ বিপ্লবীদের উপর বর্তায় না; তা বর্তায় পুরোনো ক্ষয়িষ্ণু সমাজের কায়েমিস্বার্থের প্রভুদের উপর, যারা

হিংস্রভাবে সমাজের পরিবর্তন প্রয়াসকে প্রতিহত করতে উদ্যত হয়। ফলত, কায়েমিস্বার্থের এই হিংসাত্মক প্রতিরোধের উপরই বিপ্লবী হিংসার মাত্রা ও ব্যাপকতা নির্ভরশীল।

৩০.৫ রাজনীতিক পরিবর্তন ঃ মতাদর্শের ভূমিকা

রাজনীতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিত থেকে মতাদর্শের ভূমিকা স্পষ্টতই দ্বিমুখী। একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠিত কোনও রাজনীতিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করে তার স্বপক্ষে বৈধতা সৃষ্টি করতে এবং তাকে স্থায়িত্ব দিতে সক্রিয় থাকে, কোনও কোনও মতাদর্শ তেমনি ঐ ব্যবস্থার বিরোধী। মতাদর্শের কাজ হল প্রচলিত ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ অসংগতি, সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতাকে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে ঐ ব্যবস্থার পরিবর্তন, আমূল রূপান্তর বা উচ্ছেদে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা। অর্থাৎ, একদিকে যেমন স্থিতাবস্থা রক্ষাকারী রাজনীতিক মতাদর্শ আছে, অন্যদিকে তেমনি পরিবর্তমকামী রাজনীতিক মতাদর্শের প্রভাবও বাস্তব রাজনৈতিক কর্মধারার উপর কম হল। এককথায়, রাজনীতিক স্থিতাবস্থা বা স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে যেমন রাজনীতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও তেমনি মতাদর্শের ভূমিকা সমান উল্লেখনীয়।

রাজনীতিক পরিবর্তনে মতাদর্শের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেটি উপলব্ধি করতে হলে প্রথমেই স্মরণে রাখা দরকার যে, রাজনীতিক পরিবর্তনের ধারাকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত ও অনিবার্য ধারা যা মানুষের সচেতন ইচ্ছাপ্রসূত বা পরিকল্পিত নয়। সমাজের গতিশীল জীবনধারার নানা অভিঘাতে রাজনীতিক বিধিব্যবস্থায় বাধ্যত কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। এর সাথে রাজনীতিক মতাদর্শের তেমন কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু মানুষের সচেতন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা অনুযায়ী যেসব রাজনীতিক পরিবর্তন সাধিত হয় বা সাধনের প্রয়াস চলে তা সাধারণত কোনও-না-কোনও মতাদর্শের সাথে সম্পর্কিত। রাজনীতিক মতাদর্শই কোনও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত অসংগতি অযৌক্তিকতা ও অমানবিকতা, এমনকি সমগ্র সমাজব্যবস্থাটির অনুপযোগিতা বা অপ্রাসঙ্গিকতাকে উন্মোচিত করার মাধ্যমে তার ক্রমিক সংখ্যার অথবা সামগ্রিক বিলোপ ও রূপান্তর দাবী করতে পারে। রাজনীতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিত থেকে তাই মতাদর্শকে স্পষ্টতই দু'ভাগে ভাগ করা যায়—ক্রমিক, সংস্কারধর্মী পরিবর্তনের সমর্থক মতাদর্শ এবং আমূল বৈপ্লবিক রূপান্তরের পক্ষপাতী মতাদর্শ। তবে, আপাতভাবে এ জাতীয় ভাগ সঠিক মনে হলেও গভীরতর বিশ্লেষণে মতাদর্শের এরকম বিভাজন হয়তো খুব যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, প্রচলিত সমাজ-রাজনীতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষিত থেকেই মতাদর্শের এই সংস্কারবাদী ও বৈপ্লবিক চরিত্রের পার্থক্য নির্ণয় করা উচিত। যেমন, উদারনীতিবাদ যেহেতু বিদ্যমান কোনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থক তাই উদারনীতিবাদ এই ব্যবস্থার স্থায়িত্বের পাশাপাশি এর প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন ও শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের বিরোধিতা করে না। অন্যদিকে, মার্ক্সবাদ যেহেতু শ্রেণীশোষণভিত্তিক বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিপক্ষে তাই তার রূপান্তর সাধনে বৈপ্লবিক পন্থার পক্ষপাতী হলেও প্রতিষ্ঠিত কোনও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনে বৈপ্লবিক পন্থার পক্ষপাতী নয়। তাই বলা যেতে পারে যে, কোনও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে যে মতাদর্শ তা সর্বদাই সংস্কারপন্থী, বৈপ্লবিক নয়।

৩০.৬ সারাংশ

(১) মানুষের গতিশীল জীবনধারায় সামাজিক পরিবর্তনের মতো রাজনীতিক পরিবর্তনও এক অনিবার্য ও বিরামহীন প্রক্রিয়া। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনীতিক পরিবর্তন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও এ দু'টি ভিন্ন পর্যায়ভুক্ত প্রক্রিয়া। সামগ্রিকভাবে সমাজে মানুষের জীবনধারায় যত প্রকার পরিবর্তন ঘটে তা সবই সামাজিক পরিবর্তন হিসেবে অভিহিত হতে পারে। এই অর্থে রাজনীতিক পরিবর্তনও সামাজিক পরিবর্তনের অঙ্গ। কিন্তু সমস্ত সামাজিক পরিবর্তন রাজনীতিক পরিবর্তন নয়, বলাই বাহুল্য।

(২) রাজনীতিক পরিবর্তনের কারণ নিহিত আছে সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পটভূমিতে। প্রত্যেক সমাজেই আধিপত্য-অধীনতার এক কাঠামোগত বিন্যাস প্রতিষ্ঠিত থাকে। সমাজের বহুবিচিত্র দ্বন্দ্বসংঘাতের চাপে আধিপত্য-অধীনতার এই কাঠামোগত বিন্যাস ও তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপরীতিতে যে বদল ঘটে তাকেই রাজনীতিক পরিবর্তন বলে অভিহিত করা চলে। মানুষের সামাজিক জীবনধারায় যে আর্থিক, প্রযুক্তিগত, বা শিক্ষা-সংস্কৃতিগত নানা পরিবর্তন ঘটে চলে তার প্রভাবে রাজনীতিক বিধিব্যবস্থাতেও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। তবে সমাজের জীবনধারাগত পরিবর্তনের সমানুপাতিক হারে বা গতিবেগে যে রাজনীতিক পরিবর্তন ঘটে তা বলা যায় না।

(৩) রাজনীতিক পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য সুনির্দিষ্ট উপাদানগুলির মধ্যে চারটি উপাদানসূত্রের উল্লেখ করেছেন রাজনীতিক সমাজতত্ত্বের পণ্ডিতরা। গুরুত্বের বিচারে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় অর্থনীতিতে শ্রেণী-সংঘাতগত উপাদান। এর পরেই উল্লেখ করতে হয় উৎপাদন ধারায় নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ ও প্রসারগত উপাদান যা শুধু সামাজিক উৎপাদন ও বিনিময় ধারাতেই নয়, সমাজের মানবিক সম্পর্ক, দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ ইত্যাদিকেও প্রভাবিত করে রাজনীতিক বিধিব্যবস্থার উপর নানা অভিঘাত সৃষ্টি করে। তৃতীয় উল্লেখযোগ্য উপাদান হল যুদ্ধ, যার মাধ্যমে প্রচলিত রাজনীতিক বিধিব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে পরিবর্তিত হয়। সবশেষে উল্লেখ করতে হয় প্রজন্মগত ব্যবধানের উপাদানটির কথা। এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ, রুচি ও প্রত্যাশায় যে পরিবর্তন ঘটে তার চাপেও রাজনীতিক কাঠামো ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহ বদলাতে পারে।

(৪) রাজনীতিক পরিবর্তন বিভিন্ন ধারায় সংঘটিত হয়। প্রধান দু'টি ধারার একটি হল স্বতঃস্ফূর্ত, অনিবার্য বা অপরিকল্পিত ধারা এবং অন্যটি প্রস্তাবিত বা পরিকল্পিত ধারা। আবার এই পরিকল্পিত ধারার পরিবর্তনকেও দু'টি ধারায় ভাগ করা যায়—একটি নিয়মতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ আইনানুগ ধারা এবং অন্যটি চরমপন্থী বৈপ্লবিক ধারা। প্রচলিত রাজনীতিক ব্যবস্থার বিপক্ষে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ বিক্ষিপ্ত বা অসংলগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে বটে, কিন্তু সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত পথে তাকে কাজে লাগিয়ে সংগঠিত হয় বিপ্লব।

(৫) রাজনীতিক পরিবর্তনে মতাদর্শের ভূমিকা বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মূল্যবান আলোচনা করেছেন। রাজনীতির স্বতঃস্ফূর্ত ও অনিবার্য পরিবর্তনের যে বিরামহীন ধারা তার সাথে মতাদর্শের তেমন সম্পর্ক নেই বললেই চলে। কিন্তু রাজনীতিক বিধিব্যবস্থায় মানুষের সচেতন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা অনুযায়ী যে পরিবর্তন সংগঠিত হয় তা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কোনও-না-কোনও মতাদর্শের অনুসারী। এক্ষেত্রে মতাদর্শের ভূমিকা দ্বিবিধ। মতাদর্শ একদিকে যেমন প্রচলিত কোনও রাজনীতিক ব্যবস্থাকে বৈধতা দান করে তার স্থিতিশীলতা

বজায় রাখতে সাহায্য করে তেমনি আবার অন্যদিকে বিপরীতধর্মী কোনও মতাদর্শ ঐ ব্যবস্থার অপ্রসাঙ্গিকতা ও অযথার্থতাকে উন্মোচিত করে তার পরিবর্তন বা বিলুপ্তিকে ত্বরান্বিত করতে সচেষ্ট হয়।

৩০.৭ অনুশীলনী

নিম্নোক্ত বিবৃতিগুলি ঠিক না ভুল তা (✓) দিয়ে চিহ্নিত করুন।

	ঠিক	ভুল
১। সামাজিক পরিবর্তন মাত্রেই রাজনৈতিক পরিবর্তন—	☐	☐
২। রাজনীতিক পরিবর্তন মাত্রেই সামাজিক পরিবর্তন—	☐	☐
৩। আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দরুন রাজনীতিক পরিবর্তন সাধিত হয়—	☐	☐
৪। সমাজের উৎপাদনধারা ও জীবনধারায় প্রযুক্তিগত বিকাশ-বিস্তারের দরুন রাজনীতিক পরিবর্তন সাধিত হয়—	☐	☐
৫। রাজনীতিক পরিবর্তনের ধারা সর্বদাই পরিকল্পিত—	☐	☐
৬। রাজনীতিক পরিবর্তনের এক স্বতঃস্ফূর্ত ও আকস্মিক প্রক্রিয়া হল বিপ্লব—	☐	☐
৭। রাজনীতিক মতাদর্শ ছাড়া কোনো রাজনীতিক পরিবর্তন সম্ভব নয়—	☐	☐

নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

১। রাজনীতিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝায়?

২। সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনীতিক পরিবর্তনের পার্থক্য কী?

৩। রাজনীতিক পরিবর্তনের উৎসভূমি কী?

৪। রাজনীতিক পরিবর্তনের অর্থনৈতিক উপাদান বিষয়ে আলোচনা করুন।

৫। যুদ্ধ কীভাবে রাজনীতিক পরিবর্তন সাধন করে আলোচনা করুন।

৬। বিপ্লবের সঙ্গে সামরিক অভ্যুত্থানের পার্থক্য নিরূপণ করুন।

৭। মতাদর্শের সাথে রাজনীতির স্থিতাবস্থা ও রাজনীতিক পরিবর্তনের সম্পর্ক নিরূপণ করুন।

৩০.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। G. A. Almond & G. B. Powell : Comparative Politics

২। T. Bottomore : Political Sociology

৩। Samuel Huntington : Political Order in a Changing Society

৪। Ali Ashraf & L. N. Sharma : Political Sociology

একক ৩১ □ মতাদর্শ ও রাজনীতি

গঠন

৩১.০ উদ্দেশ্য

৩১.১ প্রস্তাবনা

৩১.২ ধ্যানধারণা তত্ত্ব ও মতাদর্শ

৩১.৩ মতাদর্শ বিভিন্নতা

৩১.৩.১ মতাদর্শের আর্থ-সামাজিক উৎসভূমির ভিন্নতা

৩১.৪ মতাদর্শের উপযোগিতাগত কার্যাবলী

৩১.৪.১ মতাদর্শ ও সামাজিক ক্ষমতা বণ্টন

৩১.৪.২ মতাদর্শ ও রাজনৈতিক পরিবর্তন

৩১.৫ মতাদর্শের অবসান

৩১.৬ সারাংশ

৩১.৭ অনুশীলনী

৩১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে—

- রাজনীতিক মতাদর্শ বলতে কী বোঝায়?
- রাজনীতিক ধারণা, তত্ত্ব ইত্যাদির সাথে মতাদর্শের পার্থক্য কী?
- মতাদর্শের ভিন্নতার কারণ কী?
- মতাদর্শের কার্যকরী উপযোগিতা কী কী?
- রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও পরিবর্তনে মতাদর্শের ভূমিকা।
- মতাদর্শের অবসান বলতে কী বোঝায়?

৩১.১ প্রস্তাবনা

আধুনিক রাজনীতিশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিতব্য বিষয় হল রাজনীতিক মতাদর্শ, এবং বিবিধ রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে এর সম্পর্ক। যে-কোনও জনসমাজের রাজনীতিক ব্যবস্থা ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান

ও প্রক্রিয়াসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করার সময় একটি বিশেষ রাজনীতিক মতাদর্শের প্রেক্ষিত খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এর কারণ ইঙ্গিত করতে গিয়ে Alan R. Ball বলেছেন যে, প্রতিটি রাজনীতিক ব্যবস্থায় নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ এক মূল্যবোধ-কাঠামোর মধ্যেই সম্পাদিত হয়। (....in every type of political system, policies are formulated and decisions are made within a value-frame-work.) তুলনামূলক রাজনীতির পরিসরে তাই ভিন্ন ভিন্ন রাজনীতিক ব্যবস্থার বিচার-বিশ্লেষণে ভিন্ন ভিন্ন রাজনীতিক মতাদর্শের প্রসঙ্গ ও পটভূমি অনিবার্যত এসে পড়ে। তাই বলা চলে, কোনও রাজনীতিক ব্যবস্থা ও তার অন্তর্গত প্রক্রিয়া-প্রতিষ্ঠানসমূহের আলোচনা-বিশ্লেষণে রাজনীতিক মতাদর্শ এক অপরিহার্য সহায়ক উপাদান।

৩১.২ ধ্যানধারণা, তত্ত্ব ও মতাদর্শ

কিন্তু মূল প্রশ্নটি হল, মতাদর্শ, বা বিশেষভাবে রাজনৈতিক মতাদর্শ বলতে ঠিক কী বোঝায়? মতাদর্শ বা এর ইংরিজী প্রতিশব্দ Ideology কথাটি বর্তমানে নানা অনির্দিষ্ট অর্থে প্রচলিত হলেও এই শব্দটির প্রথম প্রয়োগ করেন ফরাসী চিন্তাবিদ Destutt de Tracy ১৭৯৭ সালে। মূলত অধিবিদ্যামূলক ভাবধারার বিরোধীরূপে তিনি 'ভাবধারার বিজ্ঞান' রূপে মতাদর্শ শব্দটি ব্যবহার করেন। অতীতের অবৈজ্ঞানিক অধিবিদ্যামূলক চিন্তাধারার বিপক্ষে ফরাসী বিপ্লবকালীন যুক্তিভিত্তিক সংহত ভাবধারাকে বোঝাতেই তিনি নতুন শব্দটির উদ্ভাবন করেন।

রাজনৈতিক ধারণাসমূহ (Political ideas), রাজনৈতিক তত্ত্ব বা মতবাদ (Political theory) ও রাজনৈতিক মতাদর্শ (Political ideology)—এগুলি আপাতভাবে সমার্থক মনে হলেও প্রকৃত বিচারে সুনির্দিষ্ট অর্থে এদের মধ্যে অবশ্যই কিছু পার্থক্য বর্তমান। রাজনৈতিক ধ্যানধারণা বলতে সাধারণত বিশেষ বিশেষ বা খণ্ড খণ্ড সামাজিক বিষয় বা প্রশ্ন সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামতকে বোঝায়। এর মধ্যে কোনও সুসংবদ্ধ সামগ্রিক তত্ত্বের হদিশ থাকে না। যেমন, সার্বভৌমত্বের ধারণা, সাম্যের ধারণা বা স্বাধীনতার ধারণা ইত্যাদি। কিন্তু খণ্ড খণ্ড ধারণাকে ঘিরে সুসংবদ্ধ চিন্তাধারা গড়ে উঠতে পারে এবং তখন আমরা তাকে তত্ত্ব বা মতবাদ নামে অভিহিত করতে পারি। যেমন, সার্বভৌমত্বকে ঘিরে একত্ববাদী বা বহুত্ববাদী তত্ত্ব; সাম্য সম্পর্কে উদারনীতিক তত্ত্ব বা সমাজবাদী তত্ত্ব; কিংবা স্বাধীনতা বিষয়ে উদারনীতিবাদী বা মার্ক্সীয় তত্ত্ব।

তবে তত্ত্ব বা মতবাদের সঙ্গে মতাদর্শের (Ideology) পার্থক্য সাধারণভাবে তেমন স্পষ্ট নয়। কিন্তু অন্তত দু'টি পার্থক্যের কথা এখানে বিশেষ উল্লেখনীয়। প্রথমত, তত্ত্ব বা মতবাদের সাথে তুলনায় মতাদর্শের দৃষ্টিভঙ্গীগত ব্যাপকতা অনেক বেশি। মতাদর্শের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অনেক বেশি সামগ্রিকতা লক্ষ্যণীয়। তুলনায় তত্ত্ব বা মতবাদের দৃষ্টিকোণ অনেক সীমিত ও খণ্ডিত। দ্বিতীয়ত, তত্ত্ব বা মতবাদের মধ্যে ততখানি কর্মসূচীর দায়বদ্ধতা থাকে না যতখানি থাকে মতাদর্শের ক্ষেত্রে। মতাদর্শ বলতে এমন এক ভাবাদর্শের ব্যবস্থাকে বোঝায় যা আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনে করণীয়ের ইঙ্গিত দেয়। C. J. Friedrich এবং J. K. Brzeziuski রাজনৈতিক মতাদর্শকে "action-related system of ideas" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এঁদের মতে, রাজনৈতিক মতাদর্শ মাত্রেই কোনও-না-কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ বা পরিবর্তনের কাজে নিয়োজিত।

প্রকৃতপক্ষে, রাজনৈতিক মতাদর্শের এই কর্মসূচী-দায়বদ্ধ চরিত্রটিই কোনও কোনও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর চোখে অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। যেমন, Preston King মনে করেন, Ideology "may or may not possess a logical or philosophical character at all; but it must possess a political character, i.e. a content without which it cannot be described an ideology—a guide to direct political action". এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ আবার রাজনৈতিক দর্শন ও রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে পার্থক্যের উপর জোর দেন এবং বলেন যে, রাজনৈতিক দর্শন চিন্তা ও উপলব্ধিকে অনুপ্রাণিত করে, অন্যদিকে রাজনৈতিক মতাদর্শের ঝোঁক, কার্য ও দায়বদ্ধতার প্রতি। ("Political philosophy evoks reflection & understanding, while ideology is more likely to imply commitment & action".)

সংক্ষেপে তাই মতাদর্শ বলতে বোঝায় এমন এক কর্মমুখী চিন্তাধারা যার সাথে বিশ্লেষণ, যুক্তি পরম্পরা, যথার্থতা, বৈধতা এবং বিশ্বাসও জড়িত। আর রাজনৈতিক মতাদর্শ বলতে বোঝায় এমন এক কর্মমুখী চিন্তাগুচ্ছ যা কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া-প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৌদ্ধিকভাবে সমর্থন করে ও গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

৩১.৩ মতাদর্শের বিভিন্নতা

প্রকৃতি বিচারে রাজনৈতিক মতাদর্শকে নানাদিক থেকে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন, কোনও কোনও মতাদর্শের আভ্যন্তরীণ বিন্যাস অপেক্ষাকৃত শিথিল ও অসংবদ্ধ, যদিও তার আবেদনে আবেগ ও উন্মাদনা প্রবল। আবার কোনও কোনও মতাদর্শের সংহতি, বৌদ্ধিক পারম্পর্য ও বিন্যাস অনেক বেশি ঘনসন্নিবদ্ধ ও সুগ্রথিত। ফ্যাসিবাদ বা নাৎসীবাদের মতো মতাদর্শে যতখানি আবেগ ও উন্মাদনার তীব্রতা ততখানি যুক্তির পারম্পর্য ও সংহতি নেই। অন্যদিকে, উদারনীতিবাদ অথবা মার্ক্সবাদে যুক্তির সংগতিপূর্ণ বিন্যাস তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

আবার দৃষ্টিভঙ্গীগত চরিত্রের বিচারে মতাদর্শকে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী—প্রধানত এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। অসাম্য ও বৈষম্যমূলক সমাজ-রাজনৈতিক কাঠামো ও ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার পক্ষে যেসব মতাদর্শ তাকে দক্ষিণপন্থী মতাদর্শ বলা যায়। অপরপক্ষে আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্যের বিপক্ষে যেসব মতাদর্শ তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে তোলে ও ঐসব অসাম্য-বৈষম্যের অপসারণে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে তাকে বামপন্থী মতাদর্শ বলে।

অনেকে আবার দৃষ্টিভঙ্গীগত বা উদ্দেশ্যগত দিক থেকে মতাদর্শকে রক্ষণশীল ও বৈপ্লবিক—এই দুই ভাগে ভাগে করার পক্ষপাতী। যেসব মতাদর্শ স্থিতাবস্থা বজায় রাখার অথবা স্থানকালের সাথে সাযুজ্য বজায় রাখতে ক্রমিক সংস্কারের মাধ্যমে ক্রমান্বয় রূপান্তরে বিশ্বাসী তাদের রক্ষণশীল বা স্থিতাবস্থাকামী মতাদর্শ হিসেবে গণ্য করা যায়। অন্যদিকে সমাজের বৈপ্লবিক ও প্রয়োজনে সহিংস বা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমূল অগ্রগামী রূপান্তরে বিশ্বাসী যেসব মতাদর্শ তাদের বৈপ্লবিক মতাদর্শ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে একটি বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্থিতাবস্থাগামী মতাদর্শের চাইতে বৈপ্লবিক মতাদর্শ আপাতভাবে অনেক বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

৩১.৩.১ মতাদর্শের আর্থ-সামাজিক উৎসভূমির ভিন্নতা

যে-কোনও মতাদর্শের উৎসভূমির সন্ধানে গিয়ে অনিবার্যভাবেই খুঁজে পাওয়া যাবে কোনও-না-কোনও আর্থ-সামাজিক পটভূমি। আর এই আর্থ-সামাজিক ভিত্তিভূমিকে বাদ দিয়ে কোনও মতাদর্শকে যথাযথভাবে বোঝা যায় না। সমাজের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে যে স্ববিরোধ বা সংঘাত মূর্ত হতে থাকে তার প্রকৃতি বিচার করে তা থেকে উত্তরণের পথ নির্ধারণ করার চেষ্টাতেই গড়ে ওঠে কোনও-না-কোনও মতাদর্শ। ফলত, সংশ্লিষ্ট আর্থ-সামাজিক পটভূমির চরিত্র এবং তার অভ্যন্তরে স্ববিরোধ-সংঘাতগুলির প্রকৃতিই নিরূপণ করে নির্দিষ্ট মতাদর্শের গতিপ্রকৃতি ও চরিত্র। মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে যে বাণিজ্যিক পুঁজির ও বণিক পুঁজিপতিদের উদ্ভব ঘটছিল এবং এসবের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারী দমনপীড়নের নাগপাশের বিরুদ্ধে আমজনতার যে বিক্ষোভ তারই পটভূমিতে উদারনীতিবাদী মতাদর্শের জন্ম হয়েছিল। অনুরূপভাবে ইতিহাসের ভিন্ন এক পর্যায়ের উত্তরণ পর্বে জন্ম নিয়েছিল মার্ক্সবাদী বা সাম্যবাদী মতাদর্শ যা বিকশিত পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক পটভূমির অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা স্ববিরোধ ও সংঘাতের প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও তার সমাধানের পথনির্দেশ করতে চেয়েছে। আবার বিপরীত দিক থেকে, নাৎসীবাদ বা ফ্যাসীবাদী মতাদর্শের চরিত্রকে যথাযথভাবে বুঝতে গেলে যে নির্দিষ্ট ইতিহাসগত আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে এদের জন্ম এবং সেই পটভূমিতে পরিব্যাপ্ত যে সংকট ও সংঘাত তার চরিত্রকে বিশ্লেষণ করাটা জরুরি।

৩১.৪ মতাদর্শের উপযোগিতাগত কার্যাবলী

কার্ল ফ্রিডরিশ, ডি. কে. ব্রেজিনস্কি, রবার্ট ডাল, অ্যালান বল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাজনীতিক মতাদর্শের প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও সংজ্ঞা নিরূপণে তার দায়বদ্ধ কর্মমুখী চরিত্রটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রাজনৈতিক কর্মধারার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত চিন্তাবিন্যাসই যে রাজনৈতিক মতাদর্শ এ কথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মহলে প্রায় সর্ববাদীসম্মত ধারণা। বস্তুত, রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রধান ভূমিকাই হল কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থার পথপ্রদর্শক ও পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা। অবশ্য এই প্রধান ও প্রাথমিক ভূমিকার পাশাপাশি মতাদর্শের আনুষঙ্গিক আরও কিছু উপযোগিতামূলক অবদান উপেক্ষণীয় নয়।

৩১.৪.১ মতাদর্শ ও সামাজিক ক্ষমতা বণ্টন

প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা বণ্টনের এক ধারা রাজনীতির কাঠামোগত বিন্যাসের মাধ্যমে রূপায়িত হয়। রাজনীতির কাঠামোগত বিন্যাসের সাথে সমাজে ক্ষমতা বণ্টনের ধারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই রাজনীতির কাঠামোগত বিন্যাসে যেমন মতাদর্শের সমর্থন থাকে তেমনি সমাজে ক্ষমতা বণ্টনের ধারাকে বৈধতা দান করাও মতাদর্শের অন্যতম কার্যকরী ভূমিকা হিসেবে গণ্য হয়। উদারনীতিবাদী মতাদর্শ গণসার্বভৌমত্বের ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সার্বজনীন ভোটাধিকার, জনমত গঠনে গণমাধ্যমগুলির স্বাধীন ভূমিকা, বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীসমূহের সক্রিয় কর্মপ্রয়াস ইত্যাদিকে বৈধতা দেয়। ব্যক্তিগত মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া ব্যবস্থায় সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শাসনতান্ত্রিক পথে অবাধ প্রতিযোগিতার স্বীকৃতি থাকে—আর্থনীতিক, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তি ও গোষ্ঠী সমূহের আইনগত সমমর্যাদা, রাজনীতিতে একাধিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি এবং নানাপ্রকার প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার স্বীকৃতি ও বৈধতা দান

উদারনীতিবাদের অবদান। অনুরূপভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব, পূর্বেকার প্রাধান্যকারী শ্রেণীসমূহের অবদমন এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সাম্যবাদী দলের একক প্রাধান্যকারী ভূমিকা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শের দ্বারা স্বীকৃত। এককথায়, রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থার সপক্ষে তাত্ত্বিক সমর্থন গড়ে তোলে এবং তার বৈধতা সৃষ্টির মাধ্যমে তার স্থায়িত্বকে নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকে।

মতাদর্শের এই সর্বপ্রধান কার্যকরী ভূমিকাটির পাশাপাশি তার অন্যান্য উপযোগিতামূলক অবদানও উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণত দেখা যায় যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজের বিভিন্ন অংশ ও গোষ্ঠীর দাবীদাওয়ার নায্যতা, ও বৈধতা প্রতিষ্ঠা করতে মতাদর্শের সাহায্য গ্রহণ করে। বস্তুত মতাদর্শের প্রেক্ষিত ব্যতীত সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দাবীদাওয়া নিজ নিজ যথার্থ ও বৈধতা প্রতিপন্ন করতে ব্যর্থ হয়। তাই বলা যায়, সমাজে নানান দাবীদাওয়া সংকলিত ও উপস্থাপিত হয় প্রতিষ্ঠিত মতাদর্শের নিরিখে।

এ ছাড়াও কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রাসঙ্গিকতা ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহের যথাযোগ্যতা ও বিচার করা হয় সংশ্লিষ্ট মতাদর্শের মাপকাঠিতে। শুধু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেই নয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা বিচার করার ক্ষেত্রেও মতাদর্শের প্রেক্ষিত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, উদারনীতিবাদী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মান্ধতাপ্রসূত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের এবং মৌলবাদী কর্মকাণ্ডের যথার্থতা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়।

উপরন্তু আর একটি ব্যাপারেও রাজনৈতিক মতাদর্শ বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। বিভিন্ন দেশে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক 'এলিট' সম্প্রদায় নির্দিষ্ট মতাদর্শের দোহাই দিয়ে তাঁদের উচ্চাশা চরিতার্থ করতে ঘোষিত লক্ষ্যের সপক্ষে ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে সমবেত করতে সক্ষম হন। নির্দিষ্ট মতাদর্শের প্রেক্ষিত থেকেই তাঁরা কখনও 'গণতন্ত্রের স্বার্থে' কখনও 'সমাজতন্ত্রের স্বার্থে' আবার কখনও 'জাতীয় গরিমার স্বার্থে' জনগণের মধ্যে আবেগময় উদ্দীপনা সঞ্চার করে তাঁদের উচ্চাভিলাষী অভিযান, এমনকি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণাও করেন, এবং সেই অভিযান বা যুদ্ধের সপক্ষে দেশের ব্যাপক জনসমষ্টিকে সমবেত করতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালে পশ্চিমী দুনিয়ায়, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজবাদী দুনিয়ার বিরুদ্ধে জনগণকে একজোট করতে 'গণতন্ত্র রক্ষা'র দোহাই দেওয়া হয়েছে। আবার সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষদের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীকে এবং তার আন্দোলনকে প্রতিহত করতে 'সমাজতন্ত্র রক্ষা'র দোহাই দেওয়া হয়েছে। পূর্ব ইউরোপে 'সলিডারিটি' আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকারি অভিযান এবং চীনের তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারের ঘটনা এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। আবার ইউরোপে বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী শক্তি 'জাতীয় গরিমা' রক্ষার দোহাই দিয়ে নিজেদের শক্তিকে সংহত করেছে এবং আগামী অভিযান পরিচালনা করেছে। এমনকি সাম্প্রতিককালেও প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় রাখছে বর্ণবিদ্বেষী কিছু দক্ষিণপন্থী উগ্রবাদীরা।

৩১.৪.২ মতাদর্শ ও রাজনৈতিক পরিবর্তন

বিদ্যমান কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বৈধতা দান করতে এবং তাকে স্থায়িত্ব দিতে যেমন সংশ্লিষ্ট মতাদর্শ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তেমনি ঐ ব্যবস্থার পটভূমিতে কোনও বিপরীত মতাদর্শের

কাজ হল বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ অসংগতি, সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে ঐ ব্যবস্থার পরিবর্তন, আমূল রূপান্তর বা উচ্ছেদে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

বস্তুত, রাজনীতিক পরিবর্তন একটি সার্বজনীন ঘটনা বা বিষয়, যদিও এই পরিবর্তনের ধারা বা পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই পরিবর্তনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয় না যেহেতু সময় ও পরিস্থিতি সর্বদা গতিশীল। কিন্তু পরিবর্তন প্রক্রিয়া কখনও যেমন বৈপ্লবিক তেমনি কখনও ক্রমিক ও ধীরগতিসম্পন্ন, কখনও পরিবর্তন যেমন আপোষধর্মী কখনওবা তা সংঘাতপূর্ণ; কখনও যেমন রক্তক্ষয়ী তেমনি কখনও রক্তপাতহীন। তবে সাধারণভাবে এ কথা বলা যায় যে, কোনও বিদ্যমান ব্যবস্থার সপক্ষে যে মতাদর্শ সে মতাদর্শ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করলেও সেই পরিবর্তনকে ক্রমিক আপোষমুখী ও শান্তিপূর্ণ হবার দাবী জানায়। অন্যদিকে, বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে স্পষ্টত অসঙ্গতিপূর্ণ ও বিরোধিতামূলক সম্পর্কে স্থিত মতাদর্শ পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে কিছুটা সংঘাতময় ও আপোষহীন ধারার অনুসারী করতে সচেষ্ট হতে হয়।

সংক্ষেপে বলা যায়, রাজনৈতিক পরিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রধানত দু'ধরনের রাজনৈতিক মতাদর্শ লক্ষ্য করা যায়। একদিকে যেমন স্থিতাবস্থা-রক্ষাকারী রাজনৈতিক মতাদর্শ আছে, ঠিক তেমনি পরিবর্তনকামী রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাবও বাস্তব রাজনৈতিক কর্মধারার উপর কম নয়। অর্থাৎ, বলা যেতে পারে যে, স্থিতাবস্থা রক্ষাকারী মতাদর্শ যেমন একদিকে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বৈধতা দান করে তার স্থায়িত্বকে নিশ্চিত করতে চায় তেমনি অন্যদিকে এতদ্দ্বারা বিরোধী শক্তিকে দুর্বল ও নিরস্ত্র করতে চেষ্টা করে। আবার পরিবর্তনকামী বা বৈপ্লবিক মতাদর্শ প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ অবদান সৃষ্টি করে তেমনি আবার পরিবর্তনের ধারাকে প্রভাবিত করে সামাজিক রূপান্তর সাধনে এক কার্যকর শক্তি হয়ে ওঠে।

৩১.৫ মতাদর্শের অবসান

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এ কথা বলা যায় যে, রাজনীতিক ব্যবস্থার সাথে নির্দিষ্ট রাজনীতিক মতাদর্শের সংযোগ-সংগতি নির্ণয় করা বিশেষ কষ্টসাধ্য কোনও ব্যাপার নয়। সচরাচর আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থাসমূহের প্রেক্ষাপট জুড়ে কোনও-না-কোনও মতাদর্শগত কাঠামো বা একাধিক মতাদর্শের সমন্বয়ে ধারার হদিশ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কিছু রাজনীতিক ধ্যান-ধারণা, আদর্শ ও মূল্যবোধের সুসংহত বিন্যাসের ভিত্তিতে সচেতনভাবে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে গড়ে তোলা ও পরিচালনা করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

অথচ এরই পাশাপাশি অতি সাম্প্রতিক কালে—অর্থাৎ, বিগত প্রায় তিন-চার দশকে 'মতাদর্শের অবসান' (End of Ideology) সংক্রান্ত ধারণাটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ্‌দের মহলে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ড্যানিয়েল বেল (The End of Ideology), জন কেনেথ গলব্রেথ (The New Industrial State) প্রমুখ চিন্তাবিদরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শিল্প-সভ্যতার দ্রুত প্রসার ও আধুনিক প্রযুক্তির বিস্তারের দাবীতে মতাদর্শগত কঠোরতার ভিত্তি বহুলাংশে শিথিল হয়ে এসেছে। এঁদের মতে, আধুনিক কালের শিল্পোন্নত বহুত্ববাদী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার (Plural Society) কোনও বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি একরোখা মনোভাব

বা একমুখী দায়বদ্ধতা অবাঞ্ছিত ও অস্বাভাবিক। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠীগুলির মনোভাবেও এই মতাদর্শগত আনুগত্যের প্রশ্নে অনেক শিথিলতা ও বিপরীত মতাদর্শ সম্পর্কে সহিষ্ণুতা পরিলক্ষিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক দলের মধ্যে মতাদর্শগত ব্যবধান প্রকৃত বিচারে অত্যন্ত স্বল্প। অনুরূপভাবে, পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে রক্ষণশীল দল ও সমাজ গণতান্ত্রিক দলগুলির মধ্যেকার পুরোনো মতাদর্শগত ব্যবধান আজ আর ততখানি দুস্তর ও অনতিক্রম্য নয়। অন্যদিকে, অধুনা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে পুরোনো সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের কঠোরতা বিপুল মাত্রায় হ্রাস পেয়েছে। ধনতান্ত্রিক বাজার-অর্থনীতির সাথে আপোষের মাধ্যমে 'বাজার সমাজতন্ত্র' (Market Socialism) নামক ধারণার জন্ম হয়েছে। অতি সাম্প্রতিক কালে বিশ্বের নানা প্রান্তে 'উদারীকরণ', 'বেসরকারিকরণ', 'বিশ্বায়ন' ইত্যাদির প্রবল অভিঘাতে বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার মতাদর্শগত ভিত্তি ক্রমশ শিথিল হচ্ছে।

বিশ শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি ফ্রেডারিখ ওয়াটকিনস্ তাঁর "The Age of Ideology" গ্রন্থে মতাদর্শ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে মতাদর্শের মধ্যে একটা রাজনৈতিক একরোখামি বর্তমান। আজ থেকে প্রায় চার দশক আগে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "মতাদর্শগত উগ্রতার প্রতি ক্রমক্ষীয়মাণ সমর্থন এবং সাংবিধানিক গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে বোঝাপড়ার মনোভাবের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ একালের প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।" একালের প্রেক্ষিতে এই অভিমতের প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমকালীন বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যদিও এই মতের সমর্থক নন তবু 'মতবাদের অবসান' ধারণাটি ক্রমশ অধিক স্বীকৃতি লাভ করছে।

মতাদর্শহীনতার কথা নতুন করে উঠেছে দীর্ঘ পাঁচ দশকের ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসানে। সমাজতন্ত্র বনাম ধনতন্ত্রের মতাদর্শগত লড়াইয়ে সমাজতন্ত্রের একতরফা পিছিয়ে আসা ও ক্রম-অবলোপের পর রাজনীতি, আন্তর্জাতিক বা জাতীয় উভয়ক্ষেত্রেই বাস্তবতাবোধে পরিচালিত করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু নিছক বাস্তবতাবোধও একরকমের মতাদর্শই। সুতরাং, মতাদর্শহীনতা কথাটি ভ্রান্তিজনক। বরং বলা যায়, একটি প্রবল মতাদর্শের অবলোপের ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় সেটি ভরাট হতে বেশকিছু সময় লাগে।

৩১.৬ সারাংশ

ব্যবহারিক রাজনীতির সাথে রাজনীতিক মতাদর্শের সম্পর্ক আধুনিক রাজনীতি শাস্ত্রের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

কিন্তু রাজনীতিক মতাদর্শ বিষয়ে সাধারণত কিছু ধারণাগত বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক ধারণা, রাজনৈতিক তত্ত্বের সাথে রাজনীতিক মতাদর্শকে অনেকে সমার্থক বিবেচনা করেন। প্রকৃত বিচারে রাজনীতিক মতাদর্শ বলতে বোঝায় এমন এক কর্মমুখী চিন্তাগুচ্ছ যার সাথে বিশ্লেষণ, যুক্তি-পারম্পর্য, যথার্থতা, বৈধতা এবং বিশ্বাস সমন্বিত।

মতাদর্শের মূল চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হল এর কর্মমুখী দায়বদ্ধতা। অর্থাৎ, কোনও একটি রাজনীতিক মতাদর্শ একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া-প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৌদ্ধিকভাবে সমর্থন করে তাকে গড়ে উঠতে ও টিকে থাকতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, প্রচলিত কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অসংগতি

ও সীমাবদ্ধতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে মতাদর্শ ঐ ব্যবস্থার পরিবর্তন অথবা বিনাশে সচেষ্ট হয়। উপরন্তু সমাজে ক্ষমতার কাঠামোগত বিন্যাসের পটভূমিতে মতাদর্শের ভূমিকা সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ।

পরিশেষে, বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রাগ্রসর শিল্প-সভ্যতার পটভূমিতে এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত কলাকৌশলের অভূতপূর্ব প্রসারের প্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞানীদের একাংশ 'মতবাদের অবসান' নামক ধারণাটি গড়ে তুলেছেন। ধারণাটি অবশ্যই বিতর্কমূলক।

৩১.৭ অনুশীলনী

১। উদাহরণসহ রাজনৈতিক মতাদর্শের সংজ্ঞা দিন।

২। রাজনৈতিক তত্ত্বের সাথে রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য কী?

৩। রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

৪। আর্থ-সামাজিক উৎসভূমির উপর রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রকৃতি কতখানি নির্ভরশীল?

৫। ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনীতিক মতাদর্শের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৬। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট রাজনীতিক মতাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করুন।

৭। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণে মতাদর্শের ভূমিকা কী?

৮। রাজনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মতাদর্শের ভূমিকা কী?

৯। 'মতাদর্শের অবসান' বলতে কী বোঝায়?

১০। 'মতাদর্শের অবসান' ধারণাটি কতদূর গ্রহণযোগ্য?

৩১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Alan R. Ball : Modern Politics & Government

২। Finer S. E. : Comparative Government

৩। Carl J. Friedrich & J. K. Brezinski : Totalitarian Dictatorship & Autocracy

৪। Preston King & B. Parekh : Politics & Experience

৫। D. Bell : The End of Ideology

৬। Johari J. C. : Comparative Politics

৭। নির্মলকান্তি ঘোষ : আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা।

একক ৩২ □ রাজনীতি ও সামরিক বাহিনী

গঠন

৩২.০ উদ্দেশ্য

৩২.১ প্রস্তাবনা

৩২.২ রাজনীতিতে সামরিক প্রভাব বৃদ্ধির অনুকূলতা

৩২.৩ সামরিক বাহিনীর বিশিষ্টতা

৩২.৪ সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকা ও তার নির্ধারক

৩১.৫ রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকার বিভিন্ন রূপ

৩২.৫.১ রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রচ্ছন্ন ও সীমিত হস্তক্ষেপ

৩২.৫.২ সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ

৩২.৫.৩ পূর্ণাঙ্গ সামরিক শাসন

৩২.৬ সারাংশ

৩২.৭ অনুশীলনী

৩২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে—

- রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ার সাথে সামরিক বাহিনীর সম্পর্ক।
- রাজনৈতিক বাহিনীর স্বাতন্ত্র্যসূচক বিশিষ্টতা।
- রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকার নির্ধারক উপাদান।
- সামরিক প্রভাব ও হস্তক্ষেপের বিভিন্ন রূপ।

৩২.১ প্রস্তাবনা

সাধারণভাবে রাজনীতি ও সামরিক বাহিনী দু'টি আপাত বিচ্ছিন্ন বিষয় বলে গণ্য হয়।

প্রতিটি সুসংগঠিত মানবসমাজে ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের একটা কাঠামোগত বিন্যাস থাকে। এই কাঠামোগত বিন্যাস ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াসমূহের অনুশীলনকেই সংক্ষেপে আমরা রাজনীতি নামে চিহ্নিত করি। রাজনীতির এই অনুশীলনে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয় না।

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

— সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

— Subhas Chandra Bose

Price : ₹ 150.00

(NSOU-র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700 064 &
Printed at : The Saraswati Printing Works, 2, Guru Prosad Chowdhury Lane, Kolkata 700 006